RIZON
সেবা
প্রকাশনা
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৫০
রকিব হাসান
কিশোর থ্রিলার

ভলিউম ৫০

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
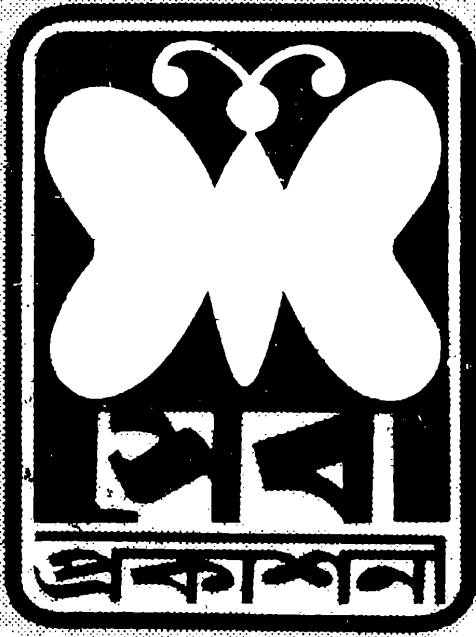
ISBN 984-16-1468-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-50
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

ছত্রিশ টাকা

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১ (তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ১/২ (ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ২/১ (প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ২/২ (জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩/১ (হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৩/২ (কাকাতুয়া-রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪/১ (ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪/২ (ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫ (ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৬ (মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭ (পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৮ (আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৯ (পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ১০ (বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১) ৪১/-
তি. গো. ভ. ১১ (অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো) ৪১/-
তি. গো. ভ. ১২ (প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৩ (ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ১৪ (পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৫ (পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ১৬ (প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ) ৪৬/
তি. গো. ভ. ১৭ (ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ) ৪২/-
তি. গো. ভ. ১৮ (খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড) ৪০/-
তি. গো. ভ. ১৯ (বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া) ৪০/-
তি. গো. ভ. ২০ (খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ) ৪২/-
তি. গো. ভ. ২১ (ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার) ৪১/-
তি. গো. ভ. ২২ (চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৩ (পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন) ৪০/-
তি. গো. ভ. ২৪ (অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ২৫ (জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী) ৪১/-
তি. গো. ভ. ২৬ (ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে) ৪১/-
তি. গো. ভ. ২৭ (ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে) ৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮ (ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ) ৪৬/-

তি. গো. ভ. ২৯ (আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩০ (নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩১ (মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২ (প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৩ (শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৪ (যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৫ (নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩৬ (টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৭ (ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮ (উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৯ (বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা) ৩২/-
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক) ৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া) ৩৩/-
তি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক) ৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬০ (শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো. ৩০/-
তি. গো. ভ. ৬২ (যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর) ৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩ (ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৪ (মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৫ (বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে ৩৩/-

---

কবরের প্রহরী

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

খাওয়ার পর আবার এসে মুসার শোবার ঘরে ঢুকল সবাই। মুসা, ফারিহা, কিশোর, রবিন আর টিটু

ঢুকেই বলল কিশোর, 'রবিন, শুরু করো এবার তোমার ভূতের গল্প।'

গ্রীনহিলস। বড়দিনের ছুটি কিন্তু বাইরে বেরোনোর উপায় নেই ওদের। প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে। তবে এ জন্যে বেরোতে পারছে না ওরা তা নয়। আসল কারণ, খুব ঠাণ্ডা লেগেছে মুসা ও ফারিহার। অসুস্থ বিছানায় পড়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে ওরা।

কি আর করে? রবিন আর কিশোরেরও বাইরে ঘোরাঘুরি বন্ধ। মুসা এবং ফারিহাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে মুসাদের বাড়িতে এসে বসে থাকে ওরাও। গল্প করে কাটায়।

এদিনও গল্পই চলছে। ভূতের গল্প। প্রথম গল্পটা বলেছে মুসা এবার রবিনের পালা।

মুসা বালিশে আধশোয়া হলো তার বিছানায়। বাড়তি আরেকটা বিছানায় টিটুকে জড়িয়ে ধরে শুলো ফারিহা। মুসার বিছানায় দেয়ালে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল কিশোর আর রবিন যেহেতু গল্প বলবে, সবাই যাতে তার মুখ দেখতে পায় সেজন্যে একটা চেয়ারে সবার মুখোমুখি বসল সে।

'পায়ের ছাপগুলো ছিল সত্যি বিশাল, বুঝলে,' শুরু করল রবিন, 'অনেক বড়!'

এই সময় ঝাড়া দিয়ে ফারিহার হাত ছাড়িয়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল টিটু। আরেক লাফে বিছানা থেকে নেমে জানালার দিকে ছুটে গেল।

ব্যাপার কি? অবাক হয়ে তাকাল সবাই।

কারণটা জানা গেল একটু পরেই। জানালায় উঁকি দিল লাল টকটকে গোল একটা মুখ কুকুরটাকে দেখে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে মুখ কুঁচকাল, 'আহ্, ঝামেলা! অ্যাই, ওটাকে থামতে বলো!'

'অ্যাই টিটু, থাম, আয় এদিকে, ডাক দিল কিশোর। 'মিস্টার ফগ? আপনি এখানে?'

'ফগর‍্যাম্পারকট।' শুধরে দিল পুলিশম্যান।

'সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট,' আগের প্রশ্নটাই করল কিশোর, 'আপনি এখানে?'

'এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। বাগানে সবগুলো সাইকেল একসঙ্গে দেখে বুঝলাম, আছো সবাই এখানেই। অনেকদিন দেখি না, তাই ভাবলাম…'

'দেখাটা করেহ যাই, তাই না?' হাসল কিশোর। 'আসলে কিজন্যে এসেছেন বলি? আমরা কোন রহস্য পেয়েছি কিনা খোঁজ নিতে।'

লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেল ফগের। 'ঝামেলা! না না, তা নয়···ইয়ে, ঝামেলা, সত্যি কোন রহস্য পেয়েছ নাকি?'

মুচকি হাসল কিশোর। 'পেয়েছি।'

গোলআলুর মত চোখগুলো আরও গোল আর বড় হয়ে গেল ফগের। জানালার দিকে আরেকটু এগিয়ে এল মুখটা। 'পেয়েছ?'

'পেয়েছি।'

গলা খাঁকারি দিল ফগ। এদিক ওদিক তাকাল। যেন দেখতে চাইল আড়াল থেকে কেউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে কিনা। তারপর স্বর নিচু করে জিজ্ঞেস করল, 'রহস্যটা কি?'

'ভূত!'

'ঝামেলা! রসিকতা কোরো না তো!' ফগ ভাবল, সে যে ভূত হয়ে গিয়েছিল সেই কথাটাই খোঁচা মেরে মনে করিয়ে দিতে চাইছে কিশোর।

'না, সত্যি বলছি, রহস্যটা ভূতেরই।'

'সত্যি? ঠাট্টা করছ না তো?'

'না, ঠাট্টা করব কেন?'

'তা রহস্যটা কি?'

'আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে চাইছি, পৃথিবীতে ভূত বলে সত্যি কিছু আছে কিনা?'

ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামতে আরম্ভ করল ফগ। রুমাল বের করে মুখ মুছল। কৌতূহল ঝিলিক দিয়ে উঠল চোখে। 'কিভাবে সিদ্ধান্তে আসবে?'

'মুসা একটা ভূতুড়ে গল্প বলেছে, ওর আর ফারিহার বাস্তব অভিজ্ঞতার গল্প। এখন বলতে যাচ্ছে রবিন। শুরু করেছিল। আপনি আসাতে থেমে গেছে। তা আপনার কি কোন কাজ আছে আমাদের কাছে?' কিশোরের ভঙ্গিটা এমন, থাকলে বলুন, নাহলে বিদেয় হোন।

উসখুস করতে লাগল ফগ। আবার এদিক ওদিক তাকাল। তারপর হে-হে করে একটা বোকার হাসি দিয়ে বলেই ফেলল, 'ঝামেলা! যদি কিছু মনে না করো তোমাদের আলোচনায় কি আমি অংশ নিতে পারি?'

এ রকম একটা প্রস্তাব দিয়ে বসবে স্বয়ং ফগ, কল্পনাও করতে পারেনি গোয়েন্দারা। এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল ওরা। টিটু কি বুঝল কে জানে, ফগের দিকে তাকিয়ে খোক খোক শুরু করল সে।

ধমক দিয়ে ওকে থামাল কিশোর। আবার তাকাল ফগের দিকে। 'আপনি আমাদের আলোচনায় অংশ নেবেন?'

'কেন, অসুবিধে কি? হাতে কোন কাজ নেই আমার। আর কি যে তুষারপাত শুরু হলো, বিচ্ছিরি! সময় একদম কাটে না। বাইরে বেরোনোও মুশকিল। একটা রহস্য পেলেও হতো, সমাধানের চেষ্টা করতে পারতাম। শোনো, যদি চাও, ভূতের গল্প আমিও শোনাতে পারি তোমাদের। কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা আমারও আছে।'

উৎসাহী হয়ে উঠল কিশোর। ফগের বাস্তব অভিজ্ঞতা! নিশ্চয় মজাদার কোন হাসির ব্যাপার হবে। সহকারীদের অবাক করে দিয়ে রাজি হয়ে গেল সে। 'বেশ, আসুন। রবিন, দরজাটা খুলে দাও, প্লীজ!'

জানালা থেকে ফগের মুখ অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ওকে ঢুকতে দিচ্ছ?' ভাল লাগছে না রবিনের। 'ভূতের গল্প শোনা না ছাই। ও আসলে আমরা কোন রহস্য পেয়েছি কিনা জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।'

'উঠুক। এখন কোন রহস্য নেই আমাদের হাতে, তদন্ত চলছে না, ও কোন বাগড়া দিতে পারবে না। তা ছাড়া ওকে সরাসরি মানা করে দেয়াটা অভদ্রতা হতো।'

দরজা খুলে দিল রবিন।

ফগ ঘরে পা রাখতে না রাখতেই ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে পড়ল টিটু। পায়ের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে গোড়ালিতে কামড়ে দিতে চাইল। চিৎকার করে উঠল ফগ, 'ঝামেলা! আহ্, ঝামেলা! অ্যাই কুত্তা, সর, সর!' কুকুরটার পেটে কষে এক লাথি হাঁকানোর ইচ্ছেটা দমন করল, লাথি মারলে যদি আর থাকতে না দেয় ছেলেমেয়েগুলো, এই ভয়ে।

টিটুকে প্রচণ্ড ধমক লাগাল কিশোর। কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনল। 'এক চড় লাগাব ধরে! কখন কোন্ শয়তানিটা করতে হবে তাও বোঝে না। সব সময় এক। জলদি গিয়ে ফারিহার কাছে চুপ করে বোস!'

আর কোন গণ্ডগোল করল না টিটু। লেজ গুটিয়ে চুপচাপ গিয়ে ফারিহার বিছানায় উঠল।

একটা চেয়ার টেনে বসল ফগ। মুখের ঘাম মুছল।

দরজা লাগিয়ে আগের জায়গায় ফিরে এল রবিন।

'ঝামেলা!' রবিনের দিকে তাকাল ফগ। 'নাও, এবার শুরু করতে পারো। আগে একটা প্রশ্নের জবাব দাও। যে গল্পটা বলবে, সেটা কি বানানো, না সত্যি?'

'বলাই তো হলো বাস্তব অভিজ্ঞতার গল্প। বানানো হবে কেন?'

'ঠিক আছে। আর কোন প্রশ্ন নেই আমার।'

গল্প শুরু করল রবিন।

দুই

অনেক বড় পায়ের ছাপ। কোন বিশাল জানোয়ারের। চেপে বসেছে। কারণ মাটি নরম। আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল।

হান্টার রিজে যাচ্ছিলাম। ছাপগুলো চোখে পড়তে থমকে দাঁড়ালাম। চোখ বোলালাম চারপাশে।

পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছি আমি। কোথাও কোন শব্দ নেই। নিচে হারলে ক্রীকের নীল জল। মাথার ওপরে হান্টার রিজের ঘন গাছপালায় ছাওয়া বন।

আবার তাকালাম মাটির দিকে। কিসের পায়ের ছাপ ওগুলো? কোন জন্তুর? একপাশের ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে বেরিয়েছে বোঝা যায়। পায়ের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে ঘাস। ঝোপের ডাল ভাঙা। ওপরের বন থেকে নেমেছিল ওটা। কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে আবার ফিরে গেছে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে নিচে আমাদের বাড়িটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। ধূসর পাথরে তৈরি পুরানো একটা বড় বাড়ি। বহুকাল আগে ইনডিয়ানদের বানানো।

আবার তাকালাম ছাপগুলোর দিকে। আমি জানি বনের মধ্যে হরিণ আছে। কিন্তু হরিণের পায়ের ছাপ নয় ওগুলো অন্য কিছু কুকুর জাতীয় কোন প্রাণীর। এখানে নেকড়ে আছে নাকি? না কায়োট?

ভালমত দেখতে গিয়ে আরেকটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল, কুকুরটার পায়ের ছাপের পাশে কোথাও কোথাও একধরনের ঘষার দাগ। খুবই অস্পষ্ট।

পেছনে শব্দ হলো। চমকে উঠলাম ফিরে তাকিয়ে দেখি বনমোরগের একটা পরিবার হেলেদুলে নেমে আসছে খোলা জায়গাটার দিকে আমাকে দেখে থমকে গেল। প্রায় মিনিটখানেক অপেক্ষা করল আমি কিছু করছি না দেখে পাশ কেটে চলে যেতে শুরু করল নিচে ক্রীকের দিকে, বোধহয় পানি খেতে

এত কাছে থেকে বনমোরগ আর কখনও দেখিনি বেশ বড় আকারের লাল আর ধূসরে মেশানো পালক। লাল লাল চোখ দেখে মনে হয় রেগে আছে। পায়ের দিকে তাকালাম। একেবারেই খুদে। যে ছাপ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, ওগুলো বনমোরগের হতেই পারে না।

ঠক করে মাটিতে এসে পড়ল কি যেন আমার সামনে মাত্র দুই হাত দূরে। তাকিয়ে দেখি ছোট্ট একটা পাথর। ঢালে ঠোকর খেতে খেতে লাফিয়ে নেমে গেল কিছুদূর।

চমকে গেল পাখিগুলো। কঁক কঁক করে ওড়াল দিল

পেছনের বন থেকে হুড়মুড় করে দৌড়ে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে। উত্তেজিত জিজ্ঞেস করল, 'লেগেছে?'

ভাবলাম, আমার গায়ে লেগেছে কিনা জিজ্ঞেস করছে বুঝি। মাথা নেড়ে বললাম, 'না লাগেনি অল্পের জন্যে বেঁচেছি

'তোমার কথা কে বলছে, গাধা কোথাকার। পাখিগুলোর দিকে নজর মেয়েটার। কোনটা গিয়ে ঝাঁপ দিল ঝোপের মধ্যে, কোনটা বসল গাছের ডালে। বেশি ভীতুগুলো আরও দূরে উড়ে গেল গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে। আমার দিকে ফিরল আবার মেয়েটা। হতাশ কণ্ঠে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'একটার গায়েও লাগেনি?'

'লাগলে তো তড়পাত দেখতেই পেতে।'

এগিয়ে এসে আমার সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। পরনে শর্টস, গায়ে টি শার্ট, মাথায় লাল-সাদা একটা লস অ্যাঞ্জেলেস ডজারস বেজবল ক্যাপ, চোখে লাল কাঁচের সানগ্লাস আবার জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি লাগেনি কোনটার গায়ে?'

'লাগলে মরে পড়ে থাকত।'

'অনেক সময় জখম হলেও উড়ে যায় বনমোরগ অন্যখানে গিয়ে মরে।'

'তাহলে খোঁজোগে ঝোপের মধ্যে,' হাত তুলে দেখিয়ে দিলাম। 'পাথর ছুঁড়তে হলে একটু সাবধানে ছুঁড়ো। আশেপাশে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে। আমার মাথাটাই ফাটিয়ে দিয়েছিলে আরেকটু হলে।'

লাল কাঁচের ভেতর দিয়ে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল মেয়েটা। বড়দের মত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'বোকার মত ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে যে কারও গায়ে লাগতে পারে।'

রাগ লাগল মেয়েটার পাকামো দেখে। বললাম, 'আমি বোকাও নই, যে কারোও নই, আমার একটা নাম আছে—রবিন মিলফোর্ড।'

হেসে ফেলল মেয়েটা. 'তুমি রেগে যাচ্ছ।'

'রাগিয়ে দেয়ার মত করেই তো কথা বলছ।'

হাত তুলল ও, 'আচ্ছা ঠিক আছে, আর বলব না, সরি। তোমরা নতুন এসেছ এখানে, না?'

'হ্যাঁ। বেড়াতে।'

'ঢালের নিচের ওই বড় বাড়িটাতে উঠেছ?'

'হ্যাঁ,' হাত বাড়িয়ে দিলাম। 'ওটা আমাদেরই। আমার মায়ের।'

সেও তার হাত বাড়াল। 'আমি নিনা হাওয়ার্ডস কিন্তু সবাই ডাকে গগলস। সারাক্ষণ সানগ্লাস পরে থাকি তো, তাই।'

হাত মেলালাম আমরা। ওর কনুইয়ের দিকে চোখ পড়ল। গোটা দুই গভীর আঁচড়ের দাগ। ঘষা লেগে কেটেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ফুটবল খেল নাকি? গোলকীপার?'

হাসল ও। বলল, 'আমাকে নিনা ডাকলেই খুশি হব। গগলস শুনতে ভাল্লাগে না। ফুটবল খেলি না, শুধু বেজবল। এই দাগগুলো দেখে বলছ তো? এগুলো খেলার সময় পড়ে গিয়ে নয়, পাথরে ঘষা লেগে কেটেছে।' ওপরের শৈলশিরাটা দেখিয়ে বলল, 'বেশির ভাগ সময় ওখানে কাটাই আমি। রাতে যখন অন্ধকারে আর কিছু দেখা যায় না তখন নামি।' একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে লাগল সে।

'রাতেও ঘোরাঘুরি করো এই বনের মধ্যে?'

'করি, তাতে কি? অন্ধকারকে ভয় পাও নাকি তুমি?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে ছাপগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'নিনা, এগুলো কিসের ছাপ, বলো তো?'

মাটির দিকে তাকায়নি এতক্ষণ ও। ছাপগুলো দেখে মুহূর্তে বদলে গেল চেহারা। দাঁত থেকে খসে পড়ল ঘাসের ডগা। সাদা হয়ে গেল মুখ। সানগ্লাস খুলে নিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল আরও ভাল করে দেখার জন্যে। যখন সোজা হলো আবার, চোখ বড় বড় করে ফেলেছে। বাদামী মণি দুটোতে আতঙ্ক।

'এখানে কেন এসেছিল ওটা?' ফিসফিস করে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল নিনা।

ঢোক গিললাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসে কি করছিল?'

'প্রহরী,' বলল সে, 'কবরের প্রহরী!' ছাপগুলোর কাছ থেকে এমন ভঙ্গিতে সরে

গেল মনে হলো ভয় পাচ্ছে।

'কবরের প্রহরী?'

আবার ছাপগুলোর দিকে তাকাল ও। 'এত নিচে আর নামেনি কখনও,' গলা কাঁপছে ওর। মুঠো করে ফেলেছে হাত।

'নিনা?'

জবাব না পেয়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকালাম, 'নিনা, কে ওই কবরের প্রহরী?'

আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল ও। 'একটা কুকুর,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল। 'বিশাল। কালো। এত বড় কুকুর কোথাও দেখতে পাবে না আর। তবে ওটা কুকুর নয়।'

দ্বিধায় পড়ে গেলাম। বলছে কুকুর, আবার বলে কুকুর নয়, সেটা আবার কি? বললাম, 'কি যা তা বলছ। হয় কুকুর, নয়তো অন্য কিছু; একসঙ্গে দুটো প্রাণী হতে পারে না।'

'পারে,' নিচুস্বরে জবাব দিল নিনা। 'ভূত-প্রেতেরা পারে। বিশাল কালো কুকুরের রূপ ধরে থাকে ওটা। দানব!'

ওর হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কাঁপছে। বিশ্বাস করতে পারলাম না, 'যত্তসব ফালতু কথা!'

'তোমার কাছে ফালতু মনে হতে পারে, কিন্তু এ এলাকার সবাই জানে ওটার কথা। পাহাড়ের ওপরে ওই চূড়ার কাছে ইনডিয়ানদের একটা গোরস্থান আছে। বহুকাল আগে নিচের উপত্যকায় বাস করত সেনিকা ইনডিয়ানরা। কবর দিত ওপরে। ওখানে যাদের কবর দেয়া হয়েছে, তাদের পাহারা দেয় ওই ভূতুড়ে কুকুরটা।'

তাকিয়ে রইলাম নিনার দিকে। ভূত! প্রেত! দানব! কবরখানা পাহারা দেয় ভূতুড়ে কুকুর। এ সব কি বলছে?

আবার তাকালাম ছাপগুলোর দিকে। কুকুরের পায়ের এতবড় ছাপ আর দেখিনি আমি। দানবই ওটা।

সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার নামল পাহাড়ে। গাছের মাথায় কাঁপন তুলে বয়ে গেল একঝলক বাতাস। মর্মর শব্দে মাটিতে গড়াল শুকনো ঝরা পাতা।

আমারও ভয় লাগতে আরম্ভ করেছে। ওকে বললাম, 'ভূতেরা মাটিতে পায়ের ছাপ ফেলে না।'

'সে কথা আমিও শুনেছি। কিন্তু এই ভূতটা ফেলে। কুকুরের মত গলা ছেড়ে ডাকে। পাহাড়ের ওপর ঘুরে বেড়ায়। এমনকি খুনও করে।' আমার দিকে তাকাল ও। 'রবিন, কখনও পাহাড়ের ওপরে যেয়ো না।'

'কোনখানে?'

শৈলশিরাটা দেখাল নিনা। 'ওদিকে। বিরাট এক ওক গাছ আছে, তার কাছে মৃত্যুপুরী। গেলে মেরে ফেলবে তোমাকে। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো আমার কথা।'

বিরাট ওক। মৃত্যুপুরী। রূপকথার মায়াপুরীর রাক্ষস-খোক্কসের কেচ্ছা শোনাচ্ছে যেন আমাকে নিনা। তাকালাম ওর দিকে। ওর চোখের আতঙ্ক আমাকেও

যেন গ্রাস করতে আরম্ভ করল। অদ্ভুত এক অনুভূতি হতে লাগল শরীরে। হাতের তালু ঠাণ্ডা হয়ে এল, মুখের ভেতরটা গেল শুকিয়ে। জোরাল হলো বাতাস। নড়িয়ে দিল ডালপালা। ঝরে পড়তে লাগল আরও অনেক শুকনো পাতা।

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শোনা গেল আচমকা। কুকুরের ডাকের মত।

ভীষণ চমকে গিয়ে লাফ দিয়ে আমার কাছে চলে এল নিনা। আমিও লাফিয়ে উঠতাম, কিন্তু পা দুটো মনে হলো বরফের মত জমে গেছে।

'কিসের ডাক?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ওটাই তো!' ফিসফিস করে বলল নিনা। 'প্রহরী! সূর্য অস্ত গেলেই ডাকে।'

'কোনখান থেকে?' আমিও ওর মত ফিসফিস শুরু করেছি।

'ওই যে বললাম, পাহাড়ের ওপরে, চূড়ার কাছে। ওই যে আবার ডাকছে,' ভয়ে ভয়ে বলল নিনা। ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! এক মিনিট,' অস্বস্তি লাগছে আমার, 'ওই ডাক শুনেছ নাকি আরও?'

মাথা ঝাঁকাল নিনা।

'দেখেছ ওটাকে?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে আবার মাথা ঝাঁকাল সে।

'কোথায়?'

'পাহাড়ের ওপর।'

অস্বস্তিটা বাড়ল আমার। 'তুমি বলছ সব সময় পাহাড়ের ওপর থাকে ওটা। কাল রাতে তাহলে এখানে নেমেছিল কেন? পায়ের ছাপই বলছে, নেমেছিল!'

চোখ আরও বড় বড় হয়ে গেল ওর, মুখ সাদা। শুকনো গলায় জবাব দিল, 'জানি না! এতদিন তো পাহাড়ের ওপরেই থেকেছে ওটা।'

'কিন্তু কাল রাতে এখানে নেমেছিল। এ জন্যেই ভয় পাচ্ছ তুমি, তাই না?'

আমার চোখের দিকে তাকাল নিনা, 'এর আগে আর কোনদিন নিচে নামেনি ওটা।' ছাপগুলোর দিকে তাকাল ও, নিচের উপত্যকার দিকে, তারপর আবার আমার দিকে। 'কাল রাতে এখানে নেমে তোমাদের বাড়িটার দিকে তাকিয়েছিল ওটা। কার দিকে, কেন তাকিয়েছে, জানি না। আমি শুধু জানি, এর আগে আর কোনদিন নিচে নামেনি প্রহরী।'

আরও জোরে চিৎকার করে উঠল ওটা। চমকে উঠলাম দুজনে।

'ওই জানালাটার দিকে তাকিয়েছিল ওটা,' হাত তুলে দেখাল নিনা, একমাত্র জানালা যেটা পাহাড়ের এই ঢাল থেকে দেখা যায়। 'জানালাটা কার ঘরের?'

গরম নেই। তাও ঘামতে শুরু করলাম। জবাব দিলাম, 'আমার!'

তিন

দৌড় দিতে গেল নিনা। হাত চেপে ধরলাম ওর।

'যেতে দাও,' ও বলল, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'এক মিনিট,' আমি বললাম। কিন্তু শুনল না ও। ঝাড়া মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার দৌড় দিতে যাবে এই সময় মাটিতে পড়ে থাকা চকচকে একটা জিনিস চোখে পড়ল আমার। নিচু হয়ে তুলে নিয়ে বললাম, 'তোমার সানগ্লাস।'

'দাও।'

হাতটা পেছনে সরিয়ে নিলাম, 'আগে বলো, ভূতটাকে তুমি দেখার পর কি ঘটল?

দ্বিধা করতে লাগল ও। 'আগে আমার চশমা দাও।'

দিয়ে দিলাম ওটা। চোখে পরে নিল সে। ছাপগুলোর দিকে আরেকবার তাকিয়ে আমার দিকে মুখ তুলল। 'রাতের বেলাও পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে আমার, বলেছি না?'

মাথা ঝাঁকালাম।

'হপ্তা দুই আগে ওরকমই এক রাতে বেরিয়েছিলাম। এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম। একটা রাস্তা চলে গেছে পাহাড়ের ওপরের ঢাল বেয়ে। ওপরের মাথা গেছে কবরখানার দিকে, নিচটা উপত্যকায়। ওই পথের দিকেই যাচ্ছি, বেড়ানো শেষ হয়েছে আমার, বাড়ি ফিরছি আসলে তখন। হঠাৎ করেই চোখে পড়ল ওটাকে ওপরে, পথের একেবারে শেষ মাথায়, কয়েকটা গাছের কাছে।'

'দেখতে কেমন?'

'কতবার বলব? কুকুরের মতন। অনেক বড় কুকুর। রীতিমত একটা দৈত্য

'কি করলে তখন?'

আমার দিকে তাকিয়ে রইল নিনা। 'কি আবার করব? পাগল নাকি তুমি? ভূতের বিরুদ্ধে কিছু করা যায়? কিছুই করিনি। পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। পা নড়াতে পারছিলাম না। তারপর ওটা গায়েব হয়ে গেল।'

'গায়েব হয়ে গেল মানে?'

'গায়েব হয়ে গেল মানে—গায়েব। একেবারে হাওয়া।

সন্দেহ হলো আমার, জিজ্ঞেস করলাম, 'সত্যি দেখেছিলে তো?'

বুকের ওপর হাত দুটো আড়াআড়ি রেখে দাঁড়াল নিনা। 'তোমার অবগতির জন্যে একটা কথা জানাই মিস্টার রবিন মিলফোর্ড, যেখানে যে জিনিস থাকে না সেটা আমি দেখি না। চিৎকারটার ব্যাপারে কি বলবে? এই ইকটু আগে যে দুজনে শুনলাম? নাকি সেটাও শুনিনি?'

তা শুনেছি। অস্বীকার করতে পারলাম না। কান পাতলাম। থেমে গেছে চিৎকার।

'নিনা, তোমাকে মিথ্যুক বলছি না। আসলে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি না আমি।'

'এখানে এতদিন আসোনি বলে করোনি।'

'হয়তো। তবে এখানকার ইনডিয়ানদের কথা আমি অনেক কিছুই জানি। আমার মায়ের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন মোহক ইনডিয়ান।' শার্টের গলার কাছের বোতাম খুলে কলারটা ফাঁক করে ধরলাম, 'এই দেখো।'

'কি ওটা?'

'দেখতে পাচ্ছ না একটা মালা? ওয়ামপাম গুটির। তাও আবার কালো গুটি। অনেক বড় মোহক যোদ্ধারাই কেবল এই মালা পরত। মালাটা কয়েক পুরুষ ধরে হাত বদল হতে হতে মা'র হাতে পড়েছিল। আমার গত জন্মদিনে আমাকে উপহার দিয়েছে মা।'

'ছুঁয়ে দেখতে পারি?'

মালাটা ধরতে দিলাম নিনাকে।

'বহুকাল আগে এই উপত্যকায় বাস করত মোহকরা,' নিনা বলল। 'হয়তো তোমার মায়ের পূর্বপুরুষ সেই ইনডিয়ান যোদ্ধাও এই এলাকায়ই ছিলেন।'

'ছিলেনই তো,' আমি বললাম। 'ওই বাড়িটা তো তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। মালাটার মতই হাত বদল হতে হতে ওটাও মা'র দখলে এসেছে।'

'তারমানে তোমার পূর্বপুরুষ সেই ইনডিয়ান যোদ্ধাকেও মৃত্যুপুরীতেই কবর দেয়া হয়েছে?'

'হতে পারে। ওই মৃত্যুপুরীটা কি, বলো তো?'

'অনেক বড় একটা গুহা। পাহাড়ের ভেতরে সুড়ঙ্গের মত ঢুকে গেছে। মৃত্যুর সময় হলে ইনডিয়ান যোদ্ধারা গিয়ে ঢুকত ওর মধ্যে। কেবল বীরেরাই ঢুকত, সাধারণ ইনডিয়ানদের জন্যে বারণ। কড়াকড়ি ভাবে এই নিয়ম মেনে চলত ওরা। একবার ঢুকলে কেউ আর জীবিত বেরোতে পারে না ওখান থেকে। সেজন্যেই নাম হয়েছে মৃত্যুপুরী।'

'তুমি ঢুকেছ কখনও?'

রাগ করে মালাটা ছেড়ে দিল নিনা। 'বললাম না কেউ জীবিত বেরোতে পারে না ওখান থেকে। কেউ না!'

'তাই?'

'তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না নাকি? দেখো, রবিন, বোকামি করে কিছু করে বোসো না। ওই চূড়ার কাছে যেয়ো না। গোরস্থানটা থেকে দূরে থাকবে। কোনমতেই মৃত্যুপুরীর ধারেকাছে যাবে না। যদি যাও, কোনদিন আর ফিরবে না, বলে দিলাম। কবরের প্রহরী ছাড়বে না তোমাকে।'

'গুড-বাই' জানিয়ে বাড়ি রওনা হলাম দুজনে।

বাড়ি ফিরতে পনেরো মিনিটের বেশি লাগল না আমার। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। ভয়ও পাচ্ছি। চারদিকে নানা রকম শব্দ, আলো থাকতে যেগুলো ছিল না। বার বার মুখ ফিরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালাম, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না।

রাতে ডিনার খেতে বসে মা আর বাবাকে বললাম গোরস্থানটার কথা। ভূতের কথাটা চেপে গেলাম। বললে যদি হাসাহাসি করে? ওই এলাকার অনেক ইতিহাসই জানে মা। বলল ইনডিয়ানদের ছয় ছয়টা উপজাতি বাস করেছে ওখানে। গোরস্থানটার কথাও জানে। কথিত আছে—ওটাকে কেউ অবহেলা করলে, ওটার ওপর দিয়ে তাচ্ছিল্য করে হেঁটে গেলে তার ওপর নাকি অভিশাপ নেমে আসে।

খাওয়ার পর পরই শুতে চলে গেল মা আর বাবা। সারাদিন এখানে ওখানে

ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত। কিন্তু আমার ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি করতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম কালো কুকুরটার কথা। ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই, অনেকের কাছেই শুনি। তাহলে নিনা কি দেখল? হতে পারে বড় নেকড়ে অথবা কায়োট। বুনো কুকুরও হতে পরে। মালিককে হারিয়ে বুনো হয়ে গেছে কোন পোষা কুকুর।

কিন্তু হঠাৎ করে ওটা নিচে নামল কেন? আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়েই বা থাকবে কেন?

মনে হচ্ছিল ঘুম আর আসবে না। তবে ঘুমিয়েছি। কতক্ষণ পরে জানি না, জেগে গেলাম। আপনাআপনি খুলে গেল চোখের পাতা। কেন জাগলাম? কিসের শব্দে? মনে হলো বাইরে কিছু একটা নড়াচড়া করছে।

চুপচাপ বিছানায় পড়ে থেকে কান পেতে রইলাম। প্রথমে রাতের স্বাভাবিক সব শব্দ কানে আসতে থাকল, এই যেমন আমার মাথার কাছে রাখা ঘড়িটা। টিকটিক টিকটিক করেই চলেছে। বাইরে গাছের ডালে বাতাসের কানাকানি। হারলে ক্রীক থেকে ভেসে আসছে রাতচরা হাঁসের ডাক। শুকনো পাতা গড়াচ্ছে মাটিতে। তারপর আরেক ধরনের শব্দ করে উঠল পাতা। পা পড়লে যেমন হয়। শুকনো পাতা মাড়িয়ে হাঁটছে কেউ।

পুরো সজাগ হয়ে গেছি তখন। বাইরে কেউ আছে তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না। মোলায়েম পা ফেলে আস্তে আস্তে হাঁটছে সে, কিন্তু শুকনো পাতা তার অস্তিত্ব জাহির করে দিচ্ছে। আমার জানালার কাছে এগিয়ে আসছে পদশব্দ। নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এত ভারী আর জোরাল, কুকুর কখনও ওরকম নিঃশ্বাস ফেলে না। অনেকটা পরিশ্রমে হাঁপিয়ে পড়া মানুষের মত। কি ওটা?

ধীরে ধীরে কমে এল নিঃশ্বাসের শব্দ। আবার পাতায় পা পড়ার মর্মর ধ্বনি। আমার জানালার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল ওটা।

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে দৌড়ে নামলাম নিচতলায়। লিভিং রুম পার হয়ে ছুটলাম। মা আর বাবা যাতে শুনতে না পায় সেজন্যে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম সামনের ছড়ানো রেলিঙ দেয়া বারান্দায়।

এ সময় কানে এল চিৎকারটা।

ভয়াবহ আর্তচিৎকার। তাতে যন্ত্রণা তো আছেই, সেই সঙ্গে মিশে আছে আরও কিছু—আতঙ্ক।

তারপর আবার সব চুপচাপ। এতটাই নীরব হয়ে গেল, সন্দেহ হলো, সত্যি চিৎকারটা শুনেছি তো? নাকি সব আমার ভীত, ক্লান্ত মনের কল্পনা? ওপরে বাবা-মা'র ঘরের দিকে তাকালাম, জানালায় আলো জ্বলে কিনা।

আগের মতই অন্ধকার। ওরা কিছু শোনেনি।

আমি কি একাই কি শুনলাম? সন্দেহটা বাড়ল—কল্পনাই করেছি।

চারদিক বড় বেশি নীরব। এতটা কেন? খেয়াল করলাম, হাঁসগুলো ডাকাডাকি বন্ধ করে দিয়েছে। সেটাও অস্বাভাবিক। এ ভাবে চুপ করে যাওয়ার একটাই কারণ, চিৎকারটা কানে গেছে ওদের। তারমানে ভুল শুনিনি আমি। কল্পনা নয়।

কিন্তু এল কোনখান থেকে?

সিঁড়ির দিকে এগোলাম। বারান্দার একধারে রয়েছে বাড়িটার সেলার। আগের দিন মা আমাকে মাটির নিচের ওই ঘরটা দেখিয়ে বলেছে যে কদিন থাকব ওটাকে আমাদের সবজি রাখার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হবে। অদ্ভুত জায়গায় তৈরি করা হয়েছে সেলারটা। পাহাড়ের গোড়ায়। কতগুলো সাদা পাথরের পর ঢালটা উঠে গেছে চূড়ার সেই শৈলশিরার কাছে, যেটাতে রয়েছে ইনডিয়ানদের কবর।

অনুমান করলাম, চিৎকারটা এসেছে ওই মাটির নিচের ঘর থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেলারের দিকে এগোলাম। ঢালের দিকে চোখ। কেউ আছে কিনা দেখছি। বড় বড় ঘাস জন্মে আছে। ঘাসের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে নজর চলে গেল চূড়ার দিকে। তারপর আরও ওপরে, আকাশের দিকে। আধখানা চাঁদ আর অসংখ্য বড় বড় তারা প্রচুর আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে উপত্যকায়। দেখার জন্যে যথেষ্ট। ঢালের ওপর কিছু দেখলাম না। দুই পাশে তাকালাম। নেই। যেটা এসেছিল, চলে গেছে। মনে হলো, তখনকার মত আমি নিরাপদ।

সেলারের কাছে পৌঁছলাম। অনেক বড় একটা গর্তকে যাতে পানি না পড়ে সেভাবে ঢেকেঢুকে নিয়ে জিনিসপত্র রাখার ঘর বানানো হয়েছে। মুখের কাছে ঝুঁকে বসে ভেতরে উঁকি দিলাম। ভেতরে গাঢ় অন্ধকার। টর্চ আনার দরকার ছিল। আরও ঝুঁকে, দুই হাতের তালুতে ভর দিয়ে মাথাটা ঝুলিয়ে দিলাম ভেতরে। তাও কিছু চোখে পড়ল না। সকালে আলোতে ছাড়া দেখতে পারব না চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে পিছিয়ে এলাম।

খুট করে পেছনে একটা শব্দ হলো। পাথরের মূর্তি হয়ে গেলাম যেন।

খেয়াল করলাম, ঝলমলে চাঁদের আলো নেই আর এখন। ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্না। ঢালের ঘাস, আশপাশের জমি, পাথর, গাছপালা সব অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। আমার পেছনে কালো একটা ছায়া বড় হয়ে উঠছে আমার ছায়াও পড়েছে মাটিতে। চাঁদ পেছনে থাকায় ছায়াটা লম্বা হয়ে গেছে অনেক। পেছন থেকে আরও বড় একটা ছায়া ঢেকে দিচ্ছে আমারটাকে। আমি যে ভঙ্গিতে আছি, সেরকমই চার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো।

ঠিক আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওটা!

চার

ফিরে তাকানোর সাহস তো হলোই না, চোখ বন্ধ করে ফেললাম। ঘাড়ে এসে পড়তে লাগল যেন ভারী নিঃশ্বাস। এত বেশি হাঁটু কাঁপতে লাগল মনে হলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাব মাটিতে। ঠাণ্ডা রাত। তার মধ্যেও ঘামতে শুরু করলাম। নিজের অজান্তে হাত উঠে গেল কালো গুটির মালাটার দিকে। চেপে ধরলাম। অপেক্ষা করছি ভয়ঙ্কর কিছু ঘটার। গালে গরম নিঃশ্বাস, তারপর ঘাড়ে দাঁত ফোটানোর তীক্ষ্ণ ব্যথা বা ওরকম কিছুর।

ওটাও যেন অপেক্ষা করে আছে, আমার পেছনে। আমার আঙুল, আমার হাত,

শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেন কাঁপতে শুরু করল থরথর করে। চিৎকার করতে চাইলাম। স্বর বেরোল না ভয়েই অকেজো হয়ে গেছে যেন স্বরযন্ত্র সামান্যতম শব্দও করতে পারলাম না। এমনকি দম নিতেও যেন কষ্ট।

প্রচণ্ড গর্জনের পর একটা ভারী শরীর আমার ওপর লাফিয়ে পড়ার অপেক্ষা করছি। কিছুই ঘটল না। চোখ মেলছি না। ভাবছি, যে কোন মুহূর্তে এখন অনুভব করব ব্যথাটা, যে কোন সময়।

জানি না কতক্ষণ ওভাবে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে কুকুরের মত হয়েছিলাম। কতক্ষণ অপেক্ষা করেছি তাও বলতে পারব না। অবশেষে মনে হলো একটা কিছু করা দরকার আমার। চোখ বন্ধ রেখেই খুব ধীরে ধীরে এক দুই তিন করে গুনতে আরম্ভ করলাম। দশ গোণা শেষ হলেই ফিরে তাকাব। ঘুরতে আমি চাই না। ভয়ঙ্কর ওই চেহারাটা দেখার সাহস বা ইচ্ছা কোনটাই আমার নেই। চুপ করে আছি বলে হয়তো কিছু করছে না। নড়াচড়া দেখলেই এসে ঘাড় কামড়ে ধরবে—সেই ভয়ও আছে। কিন্তু তবু দেখতে হবে। আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না।

দশ গুনে, চোখ মেলেই ঝটকা দিয়ে ঘাড় ঘোরালাম।

ডানে বাঁয়ে দুদিকেই তাকালাম। চাঁদের আলো খেলে যাচ্ছে ঘাসের ওপর। সেলারের ওপরের পাথরগুলো আগের মতই সাদা। কোথাও কোন ছায়া নেই, আমার পেছনেও নেই।

কিন্তু ছায়া তো ছিল একটা! নাকি চোখের ভুল আমার? বুঝতে পারলাম না।

শৈলশিরার কাছে বনটার দিকে তাকালাম। কোন নড়াচড়া নেই। সব স্বাভাবিক। আকাশে চাঁদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে এক টুকরো মেঘ। মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়েছিল বলেই কি ছায়া নেমেছিল উপত্যকায়? তাই হবে। কিন্তু অন্য ছায়াটা? যেটা আমার ছায়াকে ঢেকে দিয়েছিল? নিঃশ্বাসের শব্দ? এ সবের কি ব্যাখ্যা? হতে পারে কুকুরটা এসে দাঁড়িয়েছিল আমার পেছনে। তাই যদি হবে, তাহলে ভূতুড়ে কুকুর নয় ওটা। যতদূর জানি, ভূতের ছায়া পড়ে না। নিনার কথামত অবশ্য ওই কুকুরটা ভূত হলেও অদ্ভুত। পায়ের ছাপ বসে যায় মাটিতে। ছায়া পড়তেই বা দোষ কি? খুট করে শব্দ যে হয়েছিল একটা আমার পেছনে, সেটাও স্পষ্ট শুনেছি। মন কিংবা কানের ভুল নয়। সময়মত ফিরে তাকাইনি বলে নিজেকে গাধা বলে গাল দিতে লাগলাম। তাকালে একটা বড় রহস্যের সমাধান হয়তো তখনই হয়ে যেত। তাকালে হয়তো ঘাড় মটকে মেরে ফেলত, এই বলে সান্ত্বনাও দিলাম মনকে।

অন্ধকার সেলারটার দিকে তাকালাম আবার। ঠিক করলাম, কাল সকালেই জেনে নেব কি ঢুকেছিল ওখানে। দিনের আলো ফুটলে সেলারে নামব। কিসে চিৎকার করল জানতেই হবে।

ঘরে ফিরে এলাম। বিছানায় শুয়েও ঘুম এল না কখন ভোর হবে, কখন সূর্য উঠবে, কখন নামব সেলারে, দেখতে পাব কিসে করেছে চিৎকার, এই চিন্তায় সময় আর কাটছে না।

তবে ঘুমিয়ে পড়লাম এক সময়। আবার যখন চোখ মেললাম দেখি রোদ উঠেছে। সব কিছুই আলোয় উজ্জ্বল। হাসিখুশি দিন। রাতে যে অমন একটা কাণ্ড

ঘটে গেছে বিশ্বাসই হতে চায় না।

বিছানা থেকে নেমেই রওনা হলাম সেলারের দিকে। আগে দেখতে হবে কিসে চিৎকার করেছিল। জানতে হবে স্বপ্ন দেখেছি, না সত্যি।

না, স্বপ্ন নয়। সেলারের কাছাকাছি গিয়ে মাটির দিকে তাকিয়েই থমকে গেলাম। আবার সেই পদচিহ্ন! বড় বড় পায়ের ছাপ। সন্দেহ হলো। বাড়ির চারপাশে খুঁজে দেখলাম, সবখানেই আছে। বাগান, আঙিনা সব ঘুরে তারপর এগিয়েছে সেলারের দিকে। পাহাড়ের ঢালে যেমন দেখেছিলাম, অদ্ভুত সেই ঘষার দাগ এখানেও আছে কোথাও কোথাও, কুকুরটার পায়ের ছাপের পাশে। আরও নানা রকম ছাপ দেখতে পেলাম। ছোট ছোট জানোয়ারের বেশির ভাগই চিনি না।

সেলারের প্রবেশ মুখের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে ভেতরে উঁকি দিলাম। বাইরে এত আলো থাকলেও ভেতরটা তখনও অন্ধকার।

হঠাৎ মনে হলো আরও বেশি অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। চমকে উঠলাম। আবার! হাঁটু কাঁপতে আরম্ভ করল। ফিরে তাকালাম। চেয়ে দেখি সূর্যের মুখ ঢেকে দিচ্ছে এক টুকরো মেঘ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে ধমক দিলাম—রবিন, অকারণ ভয়ে মনকে আচ্ছন্ন কোরো না! তাতে সত্য আবিষ্কারে ব্যাঘাত ঘটবে।

মেঘ সরে যাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। সরে গিয়ে আবার রোদ উঠল। ফিরে তাকালাম সেলারের দিকে। ভেতরে গলা বাড়িয়ে দিলাম। চোখে অন্ধকার সয়ে আসার অপেক্ষা করছি।

দেখতে পেলাম ওটাকে। একটা র‍্যাকুন। গলায় মস্ত একটা ক্ষত। একগাদা রক্তের মধ্যে পড়ে আছে। চিৎকার করার জন্যে হাঁ করেছিল যে, সেই ভঙ্গিতেই রয়েছে মুখটা। চোখ দুটো খোলা। নিষ্প্রাণ। কিন্তু আতঙ্কের ছাপ মুছে যায়নি তা থেকে।

সেলারের মুখের কাছে হুমড়ি খেয়ে আছি। ড্রামের মত বাজতে আরম্ভ করেছে হৃৎপিণ্ডটা। তাকিয়ে আছি র‍্যাকুনের কালো, ছোট ছোট চোখ দুটোর দিকে।

সবাই জানে র‍্যাকুন খুব লড়াকু প্রাণী। বেকায়দায় পড়লে ভালুককেও ছাড়ে না, যুঝতে থাকে। কিন্তু এই হতভাগ্য র‍্যাকুনটা বাধা দেয়ার কোন সুযোগই পায়নি। শেয়ালে মারেনি ওটাকে, তাহলে ধস্তাধস্তি হতো, পড়ে থাকার ভঙ্গিটা হতো অন্য রকম। কায়োটেও নয়। তার চেয়েও বড় প্রচণ্ড শক্তিশালী কোন জানোয়ারের কাজ। নেকড়ে বা ভালুকের পক্ষে এ ভাবে খুন করা সম্ভব। কিন্তু সেটা মেনে নিতে পারলাম না। ওসব জানোয়ার হলে সেলারের কাছে পায়ের ছাপ থাকত

তাহলে কিসে? কুকুরটা? সেলারে নেমে দেখলে জানা যাবে, যদি পায়ের ছাপ থাকে। তবে সেলারের মাটি এত শক্ত, পায়ের ছাপ পড়বে বলে মনে হয় না।

'মিআঁউ!'

এতটাই চমকে উঠলাম, লাফিয়ে সোজা হতে গিয়ে মাথা ঠুকে গেল ওপরের বেরিয়ে থাকা একটা পাথরে মাথাটা ডলতে ডলতে ফিরে তাকিয়ে দেখি রোমার। আমাদের পড়শী মিসেস মারলোর ছোট কালো বেড়ালটা।

র‍্যাকুনের গন্ধ পেয়ে সেলারে ঢোকার চেষ্টা করল। ধরে ফেললাম।

‘এই যে, এখানে এসে বসে আছে,’ পেছন থেকে বলে উঠল একটা মহিলা কণ্ঠ। মিসেস মারলো। একটা বেড়াল আর একটা কুকুর পোষেন। কুকুরটার নাম ববি। রোমারকে আমার হাতে ছটফট করতে দেখে বললেন, ‘যেই একটু ছাড়া পেয়েছে অমনি চলে এসেছে। সারাটা রাত অস্থির হয়ে ছিল। খালি ডাকাডাকি করেছে।’

‘কেন ডেকেছে বলতে পারি, মিসেস মারলো,’ বললাম আমি। ‘কারণটা ওই যে ওখানে,’ হাত তুলে সেলারের দিকে দেখালাম। মিউ মিউ করে ছুটে গিয়ে সেলারে ঢুকতে চাইল আবার রোমার। ছাড়লাম না।

সেলারের ভেতরে উঁকি দিয়েই যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে পিছিয়ে গেলেন মিসেস মারলো। মুখ সাদা।

তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কোন্ জানোয়ারে এ কাজ করেছে জানেন আপনি?’

‘না, রবিন, জানি না,’ ঢোক গিলে কোনমতে জবাব দিলেন তিনি, ‘শেয়াল-টেয়ালে হবে।’ ভঙ্গি দেখে মনে হলো হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

‘আমার কিন্তু মনে হচ্ছে শেয়ালের চেয়ে বড় কোন জানোয়ারের কাজ,’ বললাম তাঁকে। ‘ভালুক কিংবা নেকড়ে।’

আমার চোখের দিকে তাকাতে পারছেন না তিনি। মুখ তুলে তাকালেন হান্টার রিজের দিকে। ‘ওসব জানোয়ার লোকালয়ে আসতে চায় না,’ গলা কাঁপছে তাঁর।

‘আপনি ঠিক জানেন?’

‘জানব না কেন? হারলে ক্রীকেই তো জন্মেছি।’

কিছুতেই আমার চোখের দিকে তাকালেন না মিসেস মারলো। রোমারকে আমার হাত থেকে নিতে নিতে বললেন, ‘আয়, রোমার, বাড়ি যাই। আর এ ভাবে যখন তখন ঘর থেকে বেরোবি না, বুঝলি?’ যাওয়ার জন্যে এত তাড়াহুড়া শুরু করলেন তিনি, ঘুরতে গিয়ে জ্যাকেট আটকে গেল একটা ঝোপের বেরিয়ে থাকা ভাঙা ডালের মাথায়। টান দিয়ে সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে প্রায় ছুটে চললেন।

‘মিসেস মারলো,’ পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললাম, ‘কবরের প্রহরীর কাজ নয়তো?’

যেন দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। ফিরে তাকালেন, ‘রবিন, তোমার ভালর জন্যেই বলছি, হান্টার রিজের ওপরে পাহাড়ের মাথায় যেয়ো না কখনও। তোমার মা আর বাবাকে বোলো, তাঁরাও যেন না যান। বলবে, আমি বলেছি।’

‘কেন যাব না, মিসেস মারলো?’ জিজ্ঞেস করলাম।

‘এত কথা জানার দরকার নেই। যা বলছি, করবে।’

পাঁচ

কি করব বুঝতে পারলাম না। সবাই খালি পাহাড়ের মাথায় যেতে মানা করে।

নাস্তার পর খানিকক্ষণ হারলে ক্রীক থেকে ঘুরে এলাম। বড়শি দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করলাম।

দুপুরবেলা বাড়িতে খেতে এলাম। মাকে তখনও বলিনি মরা র‍্যাকুনটার কথা। বললেই সরিয়ে ফেলবে। ওটাকে ওই অবস্থায় নিনাকে দেখানোর ইচ্ছে আমার। আমি জানতাম, ও আমাদের বাড়িতে আসবেই।

ঠিকই এল। দুপুরের পর। এত দেরি করল কেন, জানতে চাইলাম? বলল, স্কুলে গিয়েছিল।

রাতের ঘটনার কথা জানালাম ওকে। র‍্যাকুনটার কথা বললাম। দেখতে চাইল সে। নিয়ে গেলাম সেলারে।

নিচে নামলাম দুজনে। শক্ত মাটিতে পায়ের ছাপ পড়েনি। অতএব কুকুরটাই খুন করেছে কিনা, নিশ্চিত হওয়া গেল না।

গম্ভীর হয়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে মরা র‍্যাকুনটাকে দেখল নিনা।

পরামর্শ চাইলাম, 'কি করা যায় এটাকে, বলো তো?'

ও বলল, 'এক কাজ করি, কবর দিয়ে দিই।'

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো আমার। আমাদের বাড়ির পেছনে একটা কবর খুঁড়লাম দুজনে মিলে। তারপর মরা র‍্যাকুনটাকে তুলে এনে কবর দিলাম। রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে গায়ে। অনেকক্ষণ আগে মরেছে, শক্ত হয়ে গেছে লাশ। কেমন ঘিনঘিন করতে লাগল। ভালমত মাটি চাপা দিয়ে হাত ধুয়ে এলাম। ফিরে এসে দেখি, ডাল দিয়ে একটা ক্রুশ বানিয়ে কবরে পুঁতে দিয়েছে নিনা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কেন? র‍্যাকুনটা কি খ্রীষ্টান ছিল নাকি?'

'না সেজন্যে নয়, দিলাম অন্য কারণে। অনেক সময় ভূতে মারা প্রাণীও ভূত হয়ে যায়। কবর থেকে উঠে এটাও যাতে ভূত হতে না পারে সেজন্যে ক্রুশ গেঁথে দিলাম। এই বাধা ডিঙিয়ে যত চেষ্টাই করুক, আর ওঠার সাধ্য হবে না।'

কোন মন্তব্য করলাম না। বিকেল প্রায় শেষ। আলো কমে আসছে। শৈলশিরার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রহরী কি ওপরেই থাকে সব সময়? কখনও নিচে নামে না?'

'এতদিন তো তাই জানতাম।'

'তাহলে কিসে মারল র‍্যাকুনটাকে?'

'বুঝতে পারছি না,' মাথা নাড়তে নাড়তে জবাব দিল নিনা, 'সত্যিই আমি কিছু বুঝতে পারছি না, রবিন! সব সময় মৃত্যুপুরীর কাছাকাছি থাকে ওটা। দূরে যায় না। লোকালয়ে মানুষের ঘরের কাছে যেতে কেউ কখনও দেখেনি ওটাকে।' আমাদের বাড়িটার দিকে ফিরে তাকাল সে। সেলারের দিকে তাকাল। 'আমার প্রশ্ন, এখন কেন নামল? আর তোমাদের বাড়িতেই বা কেন?' সানগ্লাস খুলে নিয়ে ওটার একটা ডাঁটি কামড়াতে লাগল। গভীরভাবে চিন্তা করছে বোঝা যায়।

'জানার একটাই উপায়, নিনা।'

'কি?'

'পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখতে হবে।'

আরেকটু হলে হাত থেকে চশমাটা ফেলে দিয়েছিল নিনা। 'মাথা খারাপ!

মৃত্যুপুরীতে যাবে!'

'না গেলে জানব কি করে?'

'জানার দরকারটা কি?'

'এত কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারছি না। তা ছাড়া এর একটা বিহিত করা দরকার। এতদিন লোকালয়ে আসত না। এখন আসতে আরম্ভ করেছে। কাল র‍্যাকুন মেরেছে, আজ কিংবা দুদিন পর যে মানুষ মারবে না তার নিশ্চয়তা কি?'

'মারলে কি করার আছে?'

'ঠেকাতে হবে ওটাকে।'

'পারলে তুমি ঠেকাওগে। আমি এর মধ্যে নেই।'

'ঘটনাটা কি, নিনা? এত ভীতু তো মনে হয় না তোমাকে?'

আমি জানি খোঁচাটা লাগবে ওর। মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'আমি ভীতু, না?'

'নইলে কি?'

'আমি ভীতু?'

'যেতে যখন চাও না, ভীতুই তো। তবে তুমি যাই বলো আর না বলো, আমি ওপরে যাবই। ওই মৃত্যুপুরী না দেখে আমার শান্তি নেই।'

নিনার চোখ দুটো দ্বিগুণ হয়ে গেল। 'কারও ঢোকার সাধ্য নেই ওখানে। সব সময় পাহারা দেয় কুকুরটা। যদি ঢোকো, কোনদিন আর বেরোতে পারবে না।'

'আমি যাব,' গোঁয়ারের মত বললাম। 'মরার সময় হলেই কেবল ওখানে ঢুকত ইনডিয়ানরা, সেজন্যে আর বেরোত না। সুস্থ অবস্থায় কেউ নিশ্চয় ঢুকে দেখেনি বেরোতে পারে কিনা?'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও বলল না নিনা।

'আমি আজই যাব,' জেদ চেপে গেছে আমার তখন, 'অন্ধকার হওয়ার আগেই। তুমি যাবে?'

'না' বলার জন্যে মাথা নাড়তে গিয়েও থেমে গেল সে। সানগ্লাসটা তাড়াতাড়ি পরে ফেলে বলল, 'যাব।'

'তোমার সাহস আছে!' হাসলাম ওর দিকে তাকিয়ে।

'সাহস না, যা করছি আমরা, এটা স্রেফ পাগলামি! কপালে খারাপি আছে আজ আমাদের!'

'সে দেখা যাবে।'

শৈলশিরায় উঠে এলাম আমরা। আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল নিনা। এখানকার প্রতিটি রাস্তা, গলি-ঘুপচি ওর চেনা। পায়ে চলা সরু পথগুলো ঢেকে আছে ঝরা পাতায়। দুপাশে কোথাও গাছপালা, ঝোপঝাড়, কোথাও একেবারে খালি। শুধু বড় বড় ঘাস। নিনা সঙ্গে এসেছে বলে মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। ও না এলে পথ খুঁজে বের করাই মুশকিল হয়ে যেত।

তবে ভয় যে পাচ্ছে ও, স্পষ্ট বুঝতে পারছি। সে একা নয়, আমিও পাচ্ছি। বিকেল শেষ হয়ে এলেও পাহাড়ের ওপরে তখনও রোদ আছে, বেশ আলো। কিন্তু দিগন্তে যে মেঘ জমেছে সেটা লক্ষ করিনি। যখন করলাম, দেরি হয়ে গেছে তখন।

ছড়িয়ে পড়ে ঢেকে দিল সূর্যকে। ধূসর করে দিল আকাশের রঙ। বার বার আকাশের দিকে তাকাতে লাগলাম। বোধহয় সেজন্যেই রাস্তার দিকে ভাল করে নজর দিতে পারিনি। একটা মোড় নিয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে গেল নিনা। এখান থেকে সোজা পাহাড়ের মাথায় উঠে গেছে রাস্তাটা। মুহূর্তে অনুমান করে নিলাম এই পথের মাথায়ই কুকুরটাকে দেখেছিল ও।

'যেতে চাও, এখনও বলো?' জিজ্ঞেস করল নিনা।

দ্বিধায় পড়ে গেলাম। এত তাড়াতাড়ি যে মেঘে ঢেকে অন্ধকার হয়ে যাবে ভাবিনি।

'কি বলো, ফিরে যাব?' আবার প্রশ্ন করল নিনা।

'না,' মনে সাহস এনে বললাম, 'এতদূর এসে ফিরে যাব না। এতক্ষণেও তো কিছু ঘটল না

বোকার মত কথা বলে ফেলেছি সেটা আমিও বুঝলাম, নিনাও বুঝল, কিন্তু কিছু বলল না। মৃতের গুহার কাছেই যাইনি তখনও, ঘটবে কি? তবু কথাটা বললাম নিজের মনে সাহস রাখার জন্যে।

পথ বেয়ে উঠতে থাকলাম আমরা। শেষ মাথায় পৌঁছে থামলাম। আরেকটা পথ পাওয়া গেল। সেটা ধরে আরও ওপরে উঠতে লাগলাম। কিছুদূর ওঠার পর বড় বড় কতগুলো পাথরের পাশ কেটে কখনও মোচড় দিয়ে কখনও বা মোড় নিয়ে এগিয়েছে পথটা। পাহাড়ের মাথার কাছে পৌঁছে গেছি আমরা ফিরে তাকিয়ে দেখি অনেক নিচে হারলে ক্রীকের নীল জল। বাকি সব কিছু গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

আরও ওপরে উঠতে থাকলাম। পথ ক্রমে সরু হয়ে আসছে। বড় বড় কতগুলো গাছের ভেতর দিয়ে গিয়ে শেষ হলো এই পথটাও। সামনে বেশ বড় একটা আয়তাকার জায়গায় ঘাস জন্মে আছে। তিনপাশ ঘিরে আছে ঘন ঝোপঝাড়, গাছপালা; আর বাকি একপাশে পাহাড়ের দেয়াল, খাড়া হয়ে উঠে গেছে ওই পথটা ছাড়া আর কোনদিক দিয়ে জায়গাটাতে ঢোকার উপায় নেই। ঠিক মাঝখানে জন্মে আছে বিশাল এক ওক। গাছটা এতই বড়, পুরো জায়গাটাতে তার ছায়া পড়ে।

নিনা বলল, আয়তাকার জায়গাটাই ইনডিয়ানদের কবরস্থান গাছের পেছনে একটা গুহামুখ দেখা গেল। সেটা মৃত্যুপুরীতে ঢোকার পথ। পাহাড়টা দেখেই অনুমান করা যায়, সুড়ঙ্গটা অনেক গভীর হবে।

ছয়

কবরস্থানে ঢোকার জন্যে পা বাড়াল নিনা। বাধা দিলাম আমি।

বাঁকা হেসে বলল সে, 'এবার বোঝো, ভীতুটা কে?'

'ভয় আমি পাইনি,' বললাম বটে, কিন্তু আমি জানি কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললাম, 'মা বলেছে, এই কবরস্থানে

ঢোকার সময় কোনমতেই যেন অশ্রদ্ধা করা না হয়।'

'বেশ, তুমিই তাহলে আগে যাও। কি করে শ্রদ্ধা করতে হয় আমি জানি না,' সরে জায়গা করে দিল আমাকে নিনা।

সরাসরি না ঢুকে গাছপালার কিনার ধরে ঘুরে রওনা হলাম আমরা। গুহামুখের কাছাকাছি গিয়ে ফিরে তাকালাম বিশাল ওকগাছটার দিকে। গোড়া থেকে কিছুটা ওপরে একটা ফোকর। হাত তুলে দেখালাম নিনাকে।

'এই এলাকার সবচেয়ে বড় গাছগুলোর একটা ওটা,' নিনা বলল। 'ভেতরটা ফোঁপরা। ইচ্ছে করলে ঢুকে বসে থাকতে পারো। আমি শুনেছি, পুরো একটা ফুটবল টীম ঢুকে থাকতে পারে ওর মধ্যে।'

'তাহলেই বোঝো, মানুষ কি রকম বানিয়ে কথা বলে,' বললাম। 'ঢুকতে পারবে বড়জোর দুতিনজন, লোকে বলে এগারোজন। দেখবে, মৃত্যুপুরীর ব্যাপারটাও ওরকম। অনেক বাড়িয়ে বলা হয়েছে।'

পাথরের দেয়ালে অনেক বড় একটা কালো গহবরের মত হয়ে আছে গুহামুখটা। ভেতরে উঁকি দিলাম।

'বেশি অন্ধকার,' নিনা বলল। 'কিছু দেখতে পাচ্ছি না। চলো, বাড়ি চলে যাই।'

'টর্চ নিয়ে এসেছি, অসুবিধে নেই,' বললাম ওকে। কিন্তু তাতেও খুশি হতে পারল না ও।

গুহার ভেতরে কয়েক কদম এগিয়েই থেমে গেলাম। পেছনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি কালো অন্ধকারে ঢেকে গেছে। অথচ গোধূলিও শেষ হয়নি তখনও। মেঘের কারণে অবেলায় সন্ধ্যা। যাই হোক, এই অন্ধকারের মানে আমাদের জানা। কুকুরটার বেরোনোর সময় হয়েছে। দেখার সময় বেশি পাব না।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশে আলো ফেললাম। ভেতরের বাতাস ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা। পাথরের গায়ে শ্যাওলা জন্মে আছে।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' এমন করে কানের কাছে কথাটা বলল নিনা চমকে গেলাম।

'না,' ফিসফিস করেই জবাব দিলাম। 'চলো, এগোই

মাটি তেমন শক্ত না হলেও পাথরের ছড়াছড়ি। যতই ভেতরে এগোলাম, মাথার ওপর উঁচু হতে থাকল ছাত। গুহা না বলে ওটাকে মস্ত এক সুড়ঙ্গ বলাই উচিত। কারণ লম্বা হয়ে আছে। কিছুটা এগোনোর পরই বাঁক নিল দেয়াল। পেছনে আড়ালে চলে গেল গুহামুখ। অদৃশ্য হয়ে গেল বাইরের পৃথিবী। আকাশ চোখে পড়ে না আর। আলো বলতে এখন শুধু টর্চের ওপর ভরসা। আপনাআপনি আঙুলগুলো শক্ত হয়ে চেপে বসল তাতে। আলো না থাকলে এখানে কি যে ঘটবে কল্পনা করারও সাহস হলো না।

কিন্তু টর্চের আলো সাহস জোগাতে পারল না বেশিক্ষণ। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল আমার। মনে হলো কেউ যেন আড়ালে থেকে আমাদের ওপর নজর রাখছে।

চারপাশে তাকালাম। সবখানে আলো ফেলে দেখলাম। একপাশে বড় বড়

পাথরের চাঙড়। ভাবলাম, ওগুলোর ওপাশে লুকিয়ে নেই তো? কিন্তু বেরোল না কোন জানোয়ার বা আর কিছু। নজর রাখা হচ্ছে—এই অনুভূতিটাও গেল না আমার। বরং মনে হলো যা-ই হোক, সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে ওটা।

আচমকা আমার হাত খামচে ধরল নিনা।

'কি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'শুনছ না?' ফিসফিস করে বলল ও।

কান পাতলাম। প্রথমে কিছু শুনলাম না তারপর মনে হলো, হ্যাঁ, শুনছি। বললাম, 'মৃদু গুঞ্জনের মত না?'

মাথা ঝাঁকাল নিনা।

আরেকটু এগোলাম।

গুঞ্জনটা হয়েই চলেছে। বাড়ছে আস্তে আস্তে। যতই এগোলাম, আরও স্পষ্ট হয়ে এল।

দাঁড়িয়ে গেলাম। নিনাও দাঁড়াল আমার সঙ্গে।

এখন আর গুঞ্জন নয়। মনে হলো একটা কণ্ঠ, সুর করে 'রঅবিন! রঅবিন!' বলে নাম ধরে ডাকছে আমাকে।

পরস্পরের দিকে তাকালাম আমরা।

'তোমাকে চেনে ওটা,' নিনা বলল। ওর বাদামী চোখ দুটোতে ভয়, বড় বড় হয়ে গেছে। 'ও জানে তুমি এখানে এসেছ!'

'রঅবিন, এসো! রঅবিন, এসো!' বলছে একটা জড়ানো কণ্ঠ, কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না। তবে মানুষের গলা যে নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'চলো, পালাই!' নিনা বলল। আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছে আমার হাত। 'ওটা তোমাকে চেনে। তোমার কাছে কিছু চায়। ভয় লাগছে আমার রবিন, চলো চলে যাই!'

গুহামুখের কাছে টেনে নিয়ে চলল আমাকে ও। অনেক পেছনে ফেলে এসেছি ওটা।

ভয় আমিও পেয়েছি। বার বার আমার নাম ধরে ডেকেই চলল কণ্ঠটা, 'রঅবিন, এসো!'

চোখ বুজে ফেললাম। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত বুঝতে পারলাম না কি করব? কল্পনায় ভেসে উঠল মিসেস মারলোর সকাল বেলাকার ভীত মুখ। কানে বাজতে লাগল নিনার কথা—মৃত্যুপুরী থেকে কেউ কোনদিন জীবিত বেরোতে পারেনি। নিজের অজান্তেই হাত চলে গেল গলার কাছে, কালো গুটির মালাটা চেপে ধরলাম। আমার জায়গায় যদি কোন মোহক বীর হতো, কি করত এই পরিস্থিতিতে পড়লে? মন থেকে পেয়ে গেলাম জবাবটা।

'আমি ফিরে যাব না,' নিনাকে বললাম। 'দেখতেই হবে সামনে কি আছে। কেন আমার নাম ধরে ডাকে, কি চায়, জানতে হবে।'

'কি আর চাইবে? তোমাকে খুন করতে চায়,' নিনা বলল। 'দুজনকেই খুন করবে। সময় থাকতে চলো পালাই।'

'যেতে ইচ্ছে করলে তুমি চলে যাও আমি এগোব।'

'তাহলে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

আবার এগিয়ে চললাম আমরা। সুড়ঙ্গের গভীর থেকে গভীরে। মাথার ওপরে ভেজা চুনাপাথরের ছাত। মৃত্যুর সময় হলে যারা এখানে চলে আসত সেই সব ইনডিয়ান যোদ্ধাদের কথা ভাবলাম। জোর আনলাম মনে—ওরা আসত সময়মত; আর আমাদের সময়ই হয়নি এখনও, আমার এবং নিনার। সুতরাং বেরোতে পারব না কেন?

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল গুহার দেয়ালে। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকালাম। নিনা চিৎকার করেছে। আবার চেঁচিয়ে উঠল সে। আবার। হাত তুলল। থরথর করে কাঁপছে। আমার পেছনে দেখাল।

তাকালাম সেদিকে। মাটিতে রেখেছিলাম টর্চের আলো, ওপর দিকে তুলতে লাগলাম। দুটো প্রবেশ পথ দেখতে পেলাম, সুড়ঙ্গমুখ—একটা আমাদের ডানে, আরেকটা বাঁয়ে। দুটো পথের মাঝখানে দেয়ালের গা থেকে বেরোনো চ্যাপ্টা পাথরে বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে নিষ্প্রাণ কুৎসিত হাসি হাসছে যেন একটা মানুষের খুলি।

সাত

চিৎকার করেই চলেছে নিনা। তাতে আরও ঘাবড়ে গেলাম আমি। হাত গেল কেঁপে। টর্চটা মাটিতে পড়ে নিভে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে চিৎকার বাড়ল ওর। হাতড়ে হাতড়ে ওটা তুলে নিয়ে ঝাঁকি দিতে জ্বলে উঠল আবার।

চেঁচানো বন্ধ হলো ওর। প্রলাপ বকার মত বলতে লাগল, 'তখনই বলেছিলাম আসা উচিত না, উচিত না, তাও এলে!'

'ও তো একটা খুলি,' যেন কিছুই না এ রকম একটা ভঙ্গি করে আমিও যে ভয় পেয়েছি সেটা চাপা দিয়ে রাখতে চাইলাম।

'কি বলছ!'

'তো আর কি? বহুদিন আগে মারা গিয়েছিল লোকটা।'

'কি করে বুঝলে?'

'তুমিই তো বলেছ মৃত্যুর সময় হলে এখানে এসে ঢুকত ইনডিয়ান যোদ্ধারা। সে তো অনেক কাল আগের কথাই।'

খুলিটার ওপর আবার আলো ফেললাম আমি। স্কুলের বায়োলজি ক্লাসে কঙ্কাল দেখেছি, খুলিও। জানি ওগুলো দেখতে কেমন হয়। কিন্তু গুহার মধ্যের খুলিটাকে অন্য রকম লাগল। চোখের জায়গার গর্ত দুটো যেন আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। দাঁত বের করে হাসছে বিকট হাসি।

খুলিটার নিচে দুই পাশের দুটো সুড়ঙ্গমুখে আলো ফেলে দেখতে লাগলাম।

'রবিন,' নিনা বলল, 'আমার ধারণা খুলিটা ওখানে রাখা হয়েছে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে। আমাদের সাবধান করার জন্যে। যাতে ভেতরে না ঢুকি।'

‘এতদূর এসে ফিরে যাব, সাধারণ একটা খুলির ভয়ে?’ আমি বললাম।

‘মৃত্যুপুরীতে একটা খুলিও ভয় পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট,’ নিনা বলল। ‘তা ছাড়া কোন পথটা দিয়ে ঢুকতে হবে আমরা, কি করে বুঝব?’

সুড়ঙ্গমুখ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছি। দেয়ালের গায়ে কালো দুটো ফোকর। আবার তাকালাম খুলিটার দিকে। চ্যাপ্টা যে পাথরটাতে বসানো তার নিচে আরেকটা গোল পাথর আছে দেখতে অনেকটা চাকার মত। এ রকম আকৃতির পাথর আর কখনও দেখিনি।

ডানের ফোকরটা দিয়ে বললাম, ‘চলো, ওটাতে ঢুকি।’

‘কেন?’

‘দুজনে দুটোতে ঢুকতে চাও নাকি? আমি ডানেরটায়, তুমি বাঁয়েরটায়?’

‘মাথা খারাপ! একা আমি কিছুতেই যাব না। আর আমার কাছে টর্চও নেই।’

আমিও জানি সেটা। অন্ধকারে সুড়ঙ্গে ঢোকা অসম্ভব।

ডানেরটাতেই ঢুকলাম দুজনে। মুখটা এত ছোট, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হলো। তবে কয়েক হাত এগোনোর পর আস্তে আস্তে চওড়া হয়ে গেল। ছাতও উঠে গেল উঁচুতে। সোজা হয়ে হাঁটা যায়। সুড়ঙ্গে অনেক মোড় আর বাঁক। ঘোরপ্যাঁচও প্রচুর। কয়েক মিনিট হাঁটার পর নিনা জিজ্ঞেস করল, ‘রবিন, একটা জিনিস লক্ষ করেছ?’

এদিক ওদিক তাকালাম, ‘কি?’

‘শব্দটা কমে গেছে।’

‘কোন শব্দ?’

‘তোমাকে যে ডাকছিল?

কান পাতলাম। তাই তো। ঠিকই বলেছে নিনা। খুলিটা দেখার পর শব্দের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। অনেক কমে গেছে শব্দটা। যদিও একনাগাড়ে ডেকে যাচ্ছে তখনও, ‘রঅবিন! রঅবিন! রঅবিন!’

সুড়ঙ্গের ভেতরে যতই এগোলাম আরও কমে এল শব্দ।

মনে হলো ভয় অনেকটা কমেছে নিনার। আমারও সাহস ফিরে এসেছে কিছুটা। শব্দ কমছে, তার মানে শব্দের উৎস থেকে দূরে সরে যাচ্ছি আমরা। কয়েক মিনিটের মধ্যে একেবারেই শোনা গেল না আর ডাকটা। পুরোপুরি নীরব।

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালাম। পেছনে হাঁটছে নিনা। আমার দিকে তাকাল ও। আবার ভয় দেখা দিয়েছে চোখের তারায়। ডাকটা শোনার পর চমকে গিয়েছিলাম। আস্তে আস্তে সয়ে এসেছিল ওটা। একেবারে যখন থেমে গেল, অখণ্ড নীরবতা আবার অস্বস্তি বাড়িয়ে দিল আমাদের। মনে হতে লাগল, শব্দটা থাকলেই যেন ভাল হতো। আমার গা ঘেঁষে এল নিনা।

সামনে একটা বড় গুহায় বেরিয়ে এলাম আমরা। মেঝেতে টর্চের আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেলাম। রাশি রাশি কঙ্কাল। তাকিয়ে রইলাম হাঁ করে। বুঝতে পারলাম, মৃত্যুর সময় হলে ওখানেই গিয়ে বসে থাকত ইনডিয়ানরা।

‘এত আওয়াজ কোরো না,’ ফিসফিস করে বললাম ওকে।

‘আওয়াজ কে করছে?’

'জুতো ঘষছ না…?'

কথা শেষ করতে পারলাম না। আমার গায়ের ওপর এসে পড়ল নিনা। 'কিসে করছে…' বলতে গেল। কিন্তু ওকেও কথা শেষ করতে দিলাম না আমি। চুপ করে থাকতে বললাম।

হালকা পায়ে হাঁটার শব্দ কানে আসছে।

আমার কানে কানে বলল নিনা, 'আমাদের সামনে থেকে আসছে!'

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার উল্টো দিকে গুহার দেয়ালে আরেকটা ফোকর। সুড়ঙ্গমুখ। তার ভেতরে হচ্ছে শব্দটা।

কান পাতলাম। এগিয়ে আসছে। পায়ের শব্দ, সন্দেহ নেই, কিন্তু শব্দটা যেন কেমন?

বুঝে ফেললাম। ওই শব্দ আমার পরিচিত। মানুষের পায়ের নয়। রাতের বেলা সেদিন আমাদের ঘরের কাছে শুনেছি।

'নিনা!' ফিসফিসিয়ে বলার কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠলাম। 'আমি জানি ওটা কিসের শব্দ! গত রাতে শুনেছি! ওটা…'

'ভূত!' নিনাও চিৎকার করে উঠল।

কে যে আগে দৌড় দিল, মনে নেই। শুধু মনে আছে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ঝেড়ে দৌড় দিয়েছি আমরা পেছন ফিরে।

দৌড়াচ্ছি, দৌড়াচ্ছি, দৌড়াচ্ছি। ভূতটাও আসছে আমাদের পিছু পিছু।

আরও জোরে দৌড়াতে লাগলাম। আগে আগে ছুটছে নিনা। দৌড়ের রেকর্ড ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেন ও। কিন্তু তাতেও কুকুরটার সঙ্গে কুলাতে পারছে না। আমাদের তাড়া করে আসছে। নিশ্চয় আমাদের গন্ধ পেয়ে বুঝেছে আমরা সুড়ঙ্গে ঢুকেছি। ধরতে আসছে তাই।

'জলদি, রবিন, আরও জোরে!' চিৎকার করে তাগাদা দিল নিনা। 'ওই যে সুড়ঙ্গমুখ!'

এত জোরে হাঁপাতে লাগলাম মনে হলো বুকটা ফেটে যাবে। আর কত জোরে ছুটব? সামনে বেশি দূরে নেই আর সুড়ঙ্গমুখ। মাথায় ঠোকর খেলাম। নিচু হয়ে গেছে ছাত। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে কুকুরের মত ছুটলাম।

খোলা মুখটা দিয়ে বেরিয়ে গেল নিনা। লাফিয়ে সোজা হয়ে উঠে দৌড় দিল গুহামুখের দিকে। ওখানে পৌঁছতে পারলেও লাভ হবে না। বাইরে নিশ্চয় এখন রাত। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও বেরোবে। যদি না থেমে বাইরেও আমাদের তাড়া করে? পারব না ওটার সঙ্গে। সহজেই ধরে ফেলবে। ওটাকে ঠেকাতে চাইলে আটকাতে হবে। আর সেটা গুহার বাইরে গিয়ে হবে না। যা করার ভেতরে থাকতেই করতে হবে। কিন্তু কি করব?

গোল পাথরটার দিকে তাকিয়ে একটা বুদ্ধি এল আমার মাথায়। ডাক দিলাম, 'নিনা!'

থামার একবিন্দু ইচ্ছে নেই ওর, তবু ফিরে তাকাল। ওকে কাছে আসতে বলে একধার থেকে ঠেলতে আরম্ভ করলাম পাথরটা।

'কি করছ?' চিৎকার করে বলল নিনা। 'জলদি এসো! ওটা আমাদের ধরে

ফেলবে!'

'পাথর দিয়ে সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করে দেব। বেরোতে না পারলে আর ধরবে কি করে?'

কুকুরটার নিঃশ্বাসের শব্দও কানে আসছে তখন। নিনাকে বললাম, 'চলে এসেছে ওটা। এসো, হাত লাগাও, আমাকে সাহায্য করো।'

সেও এসে ঠেলতে শুরু করল। নড়ে উঠল পাথরটা। আরেকটু···আর একটু···তাহলেই বন্ধ হয়ে যাবে সুড়ঙ্গমুখ। ঠেলতে থাকলাম প্রাণপণে।

'চলে এসেছে তো!' ককিয়ে উঠে পাথর ছেড়ে দিয়ে আবার দৌড় মারল নিনা।

জোরে এক ঠেলা মেরে গড়িয়ে দিলাম পাথরটা। সুড়ঙ্গমুখে বসে গিয়ে আটকে দিল ফোকরটা।

'আরে এসো না!' কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আবার চিৎকার করে ডাকল নিনা।

কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। সামান্য একটু ফাঁক রয়ে গেছে সুড়ঙ্গমুখে। সেটা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম। দুর্গন্ধ মেশানো গরম নিঃশ্বাস এসে যেন ধাক্কা মারল নাকেমুখে। জ্বলজ্বলে দুটো চোখ সোজা তাকিয়ে আছে আমার চোখের দিকে। হাঁ করা মুখে বড় বড় ধারাল দাঁত। পাথরের জন্যে আটকা পড়েছে দেখে এত জোরে হাঁক ছাড়ল, মনে হলো কানের পর্দা ফেটে যাবে আমার। অন্যপাশের সুড়ঙ্গে প্রতিধ্বনি তুলল সেই চিৎকার।

আর দেখার সাহস পেলাম না। দৌড় দিলাম নিনার পেছনে।

দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবছি, পাথর গলে কি চলে আসতে পারবে ওটা? স্বাভাবিক জানোয়ার হলে হয়তো পারবে না। কিংবা পারতেও পারে। যে বিরাট শরীর, প্রচণ্ড শক্তিতে পাথরটা ঠেলে ফেলেও দিতে পারে। কিন্তু যদি ভূত হয়, তাহলে পাথর কেন, পাহাড়ও ঠেকাতে পারবে না ওটাকে। ঠিক পার হয়ে চলে আসবে।

পাথরের অন্যপাশে থেকে গর্জন করছে ওটা। ফিরে তাকালাম পাথরটা তখনও দাঁড়িয়েই আছে। তারপর কানে এল আরেকটা চাপা ভারী শব্দ। আমাদের দুইপাশের দেয়াল, ছাত কাঁপতে শুরু করল। মনে হলো যেন ভূমিকম্প। পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। ছাত থেকে ছোট ছোট পাথর খসে পড়তে লাগল।

গুহামুখের কাছে পৌঁছে গেছে নিনা। আমি তখন অনেক পেছনে। ও যখন ছুটে বেরিয়ে গেল মুখটা দিয়ে, তখনও আমি ভেতরে।

প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করেই চলেছে কুকুরটা। থরথর করে কাঁপছে মৃত্যুপুরী। ছাত থেকে, চতুর্দিকের দেয়াল থেকে বৃষ্টির মত খসে পড়ছে পাথর। যেন ভূমিধস শুরু হয়েছে। ঘাবড়ে গেলাম ভীষণ। পাহাড়ের দেয়াল ধসে পড়ে আমাকে চাপা দেবে নাকি?

বাইরে থেকে নিনার ডাক শোনা গেল, 'রবিন, বেরোচ্ছ না কেন এখনও?'

হঠাৎ যেন বোমা ফাটল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, সুড়ঙ্গমুখের দেয়াল থেকে বিরাট এক পাথর খসে পড়েছে। ওটার ধাক্কায় সরে গেছে গোল পাথরটা। কামানের গোলার মত ছিটকে বেরিয়ে এল বিশাল একটা কালো শরীর। ভয়ানক রাগে গর্জন

করতে করতে তেড়ে এল আবার।

ততক্ষণে গুহামুখের কাছে পৌঁছে গেছি আমি। দুই লাফে বেরিয়ে গেলাম। আকাশে তখন তারা ফুটেছে। চিৎকার করে ডাকলাম, 'নিনা, আই নিনা, কোথায় তুমি?'

'এই যে এখানে!' জবাব এল। 'গাছের ভেতরে!'

একটা মুহূর্তও দেরি করলাম না। দৌড় দিলাম কবরস্থানের মাঝখানে ওকগাছটার দিকে। পেছনে ঘেউ ঘেউ করছে কুকুরটা।

'রবিন, ধরে ফেলল তো! জলদি করো না!' গুঙিয়ে উঠল নিনা।

গাছের ফোকরটা দেখতে পাচ্ছি। মাটি থেকে বেশ কয়েক হাত ওপরে। প্রাণের তাগিদে মানুষ যে কত অসাধ্য সাধন করে, তার প্রমাণ পেলাম সেদিন। তড়াক করে এক লাফ দিয়ে ধরে ফেললাম ফোকরটার ঠিক নিচের একটা ডাল। দোল দিয়ে শরীরটাকে তুলে নিলাম ওপরে। পা ঢুকিয়ে দিলাম ভেতরে। আমাকে টেনে নিল নিনা।

গাছের গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুরটা। আমাদের মত হাত নেই, তাই ডাল ধরতে পারল না। বার কয়েক লাফ দিয়ে চেষ্টা করল, কিন্তু ফোকরটার কাছে পৌঁছতে পারল না।

কি করছে ওটা দেখার কৌতূহল চাপা দিতে পারলাম না। নিনার বাধা অগ্রাহ্য করে আস্তে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিলাম।

অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ। সোজা তাকিয়ে আছে ফোকরটার দিকে। আমি তাকাতেই চোখে চোখ পড়ল। ভয়ঙ্কর গর্জন করে লাফ দিল আবার।

ঝট করে মাথা নিচু করে ফেললাম।

আট

মৃত্যুপুরীর কাছে এক প্রাচীন কবরখানায় গাছের ফোকরে বসে রইলাম দুজনে। শুনতে লাগলাম কুকুরটার তর্জন-গর্জন। যখনই ওটার আস্ফালন বেড়ে যায়, গলার কালো গুটির মালাটা চেপে ধরি। এত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, জানি না। ঘুম ভাঙলে দেখি ভোর হয়ে গেছে। চলে গেছে কবরের প্রহরী। যাবেই। নিনা বলেছে, সূর্য ডোবার পরে বেরোয় ওটা, আবার সূর্য উঠলে চলে যায়।

বাড়ি ফিরে সত্যি কথাটা বলতে পারলাম না মাকে, ভয়ে। শুনলে রেগে যাবে। জানালাম, রাত কাটিয়েছি নিনাদের বাড়িতে। মাকে না বলে গিয়ে অন্যখানে থাকার জন্যে বকা খেতে হলো। চুপ করে রইলাম।

দুপুরের পর স্কুল শেষ করে নিনা এল। মা দেখার আগেই তাকে ডেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বললাম, রাতে কবরস্থানে থাকার কথা যেন বলে না দেয়।

ও বলল, বলবে না। তার মাকেও সে মিথ্যে বলেছে—রাতে আমাদের বাড়িতে থেকেছে।

আমাকে হার্ব গ্যাটলিঙ নামে একজনের বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছে সে। ওদের পড়শী। নাম শুনেই বুঝলাম, লোকটা ইনডিয়ান।

নিনা জানাল, 'ও একজন শামান। সেনিকা ইনডিয়ান। শামান মানে জানো তো? ওঝা, কবিরাজ। খুব জ্ঞানী লোক। আমার মনে হয় ও আমাদের সাহায্য করতে পারবে।'

গেলাম নিনার সঙ্গে। ওদের বাড়ির পাশে বনের মধ্যে একটা কাঠের বাড়িতে থাকে শামান। সেটার কাছে গিয়ে বন্ধ দরজায় টোকা দিল নিনা। বেরিয়ে এল হালকা-পাতলা একজন মানুষ। লম্বা কালো চুল। গালের চামড়া কুঁচকানো, অংখ্য ভাঁজ। অনেক বয়েস লোকটার। নিনাকে দেখেই হাসল। ভেতরে যেতে বলল আমাদের।

ওর বাড়িটা ভারি পছন্দ হলো আমার। আমাদেরটার মত অত বড় নয়, মোটে একটা ঘর, বেশ বড়, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ফায়ারপ্লেসের কাছে গাদা করে রাখা হয়েছে অনেকগুলো কম্বল। তার ওপর বসতে দিল আমাদের। ফায়ারপ্লেসের ওপরে কাঠের দেয়ালে ঝোলানো একটা লাল ওয়ামপাম গুটির মালা আর উজ্জ্বল রঙের পালকে তৈরি ঝলমলে একটা হেডড্রেস, অনেকটা মুকুটের মত জিনিস, ইনডিয়ানরা যা মাথায় দেয়।

শামানের পরনে নীল জিনসের প্যান্ট, গায়ে ফ্লানেলের শার্ট। কিছুটা নিরাশই হলাম পোশাক-আশাক দেখে। আমি ভেবেছিলাম জবরজং কিম্ভুত পোশাক থাকবে। কিন্তু এ তো সাধারণ পোশাক। এই লোক কি সত্যি ভূত তাড়াতে পারবে? তবে শার্টের গলার কাছের বোতাম খুলে ভেতরের জিনিসটা দেখিয়ে দেয়ার পর কেটে গেল নিরাশা। তার গলায়ও একটা ওয়ামপাম গুটির মালা। আমারটার মত শুধু কালো গুটি নয়, নানা রঙের গুটি। মালাটাও অনেক বড়।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আমার মালাটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। চোখ দুটো তার কুচকুচে কালো, একেবারে মালার গুটির মত। জিজ্ঞেস করল 'কোথায় পেলে ওটা?'

জানালাম, কে দিয়েছে।

ও বলল, 'কালো গুটি খুব ক্ষমতাশালী।'

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'শামানরা কি ওঝা, না কবিরাজ? অনেক যাদু জানে?'

ধীরে ধীরে হাসি ফুটল তার মুখে। কুঁচকানো মুখের ভাঁজগুলো গভীর হলো আরও। মেঝেতে বিছানো একটা কম্বলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল। বলল, 'যাদু আমি জানি, তবে অনেক নয়, অল্প। ইচ্ছে করলে ওরকম যাদু তুমিও দেখাতে পারো, রবিন মিলফোর্ড। হয়তো আমার চেয়ে বেশিই পারো। কারণ তোমার গলার মালাটার ক্ষমতা অনেক।'

'সত্যি বলছেন?'

'সত্যি।'

'তাহলে আপনি কালো গুটির মালা পরেন না কেন?'

'নিয়ম অনুযায়ী আমি তো পরতে পারব না কালো গুটি পরে একমাত্র বীর

যোদ্ধারা।'

আমি তো বীর নই। আমার পরাটা ঠিক হলো কিনা বুঝলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এই মালা দিয়ে কি ভূত ঠেকানো সম্ভব? কবরের প্রহরীকে বাধা দেয়া যাবে?'

'কবরের প্রহরীকে বাধা দেয়ার দরকারটা কি তোমার? কোথায় দেখলে ওকে?'

'মৃত্যুপুরীতে। কাল ওই সুড়ঙ্গে ঢুকেছিলাম আমরা।'

মুহূর্তে বদলে গেল শামানের মুখের ভঙ্গি। 'মৃত্যুপুরীতে ঢুকেছিলে!' একবার আমার দিকে একবার নিনার দিকে তাকাতে লাগল সে। তারপর আমার ওপর দৃষ্টি স্থির হলো তার। 'মৃত্যুপুরী থেকে কেউ বেঁচে ফিরতে পারে না!'

'কিন্তু আমরা ফিরেছি,' শান্তকণ্ঠে বললাম।

আমার দিকে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টিটা কেমন অদ্ভুতভাবে বদলে গেল তার। নজর নামাল আমার গলার মালাটার দিকে। বলল, 'বেঁচে ফিরেছ, তার কারণ ওই মালা। ওটাই তোমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে। ওটা ছিল এক মহান বীর যোদ্ধার যাকে কবরের প্রহরীও নিশ্চয় সম্মান করে। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তোমার পূর্বপুরুষ ওই মহান বীরকে স্মরণ করো মনে মনে, তাঁকে ধন্যবাদ দাও। মালাটা গলায় না থাকলে এখন আর এখানে বসে কথা বলতে পারতে না।'

আমি তাকালাম নিনার দিকে। ও আমার দিকে।

শামান জিজ্ঞেস করল, 'মালাটা কি কখনও ছুঁয়ে দেখেছ?'

অবাক হলাম। 'ছুঁয়ে দেখেছি মানে? এই যে গলায় পরে আছি এটা কি ছোঁয়া নয়?'

'যখন বিপদে পড়েছ, ভয় পেয়েছ, তখন হাত দিয়ে ছুঁয়েছ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'কাল রাতে কুকুরটা যখন তাড়া করল, তখন ছুঁয়েছি। গাছের ফোকরে যখন বসেছিলাম, আর চারপাশে চক্কর দিচ্ছিল ওটা, তখনও ছুঁয়েছি। বার বার । ভয় পেয়েছিলাম তো খুব, তাই আপনাআপনি হাত উঠে যাচ্ছিল গলার কাছে। এমনকি আগের রাতে আমাদের বাড়ির কাছে যখন গিয়েছিল কুকুরটা, তখনও ছুঁয়েছিলাম। কেন যেন ভয় পেলেই হাত উঠে যায় মালাটার কাছে।'

আবার বদলে গেল শামানের চেহারা। বিস্ময় ফুটল কালো চোখে। 'তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল প্রহরী?'

'গিয়েছিল। হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখতে গেলাম। সেলারে উঁকি দিয়ে দেখতে চাইছিলাম কিসে চিৎকার করেছে। ওই সময় মনে হলো আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওটা। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছি গলা কামড়ে ধরবে। কিন্তু ধরেনি। খানিক পর পেছন ফিরে দেখি কিছু নেই।'

আবার কালো মালাটার দিকে নজর গেল শামানের। চুপ করে রইল। তার কালো চোখে উদ্বেগের ছায়া।

'প্রহরী এ রকম কেন করল, মিস্টার গ্যাটলিঙ?' জানতে চাইল নিনা। 'হান্টার রিজ থেকে নিচেই নামেনি আর কখনও। রবিনদের বাড়িতে কেন গেল?'

'কারণ রবিনের ওপর চোখ পড়েছে ওর।'

তাকিয়ে রইলাম শামানের দিকে, 'আমার ওপর? কেন?'

আঙুল তুলে মালাটা দেখাল শামান, 'ওটার জন্যে।'

নিজের অজান্তেই হাত উঠে গেল আমার। মালাটা ছুঁয়ে দেখলাম। গায়ের সঙ্গে লেগে থাকায় গরম হয়ে আছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে শামান বলল, 'ওই মালা তোমাকে রক্ষা করছে, রবিন মিলফোর্ড। আবার কবরের প্রহরীকেও আকৃষ্ট করছে। ও জেনে গেছে ওটা আছে তোমার কাছে। কখনও তোমার পিছু ছাড়বে না আর।'

ঘাবড়ে গেলাম। তাহলে তো মহামুস্কিল! শীত করতে লাগল। মনে হলো একটা সোয়েটার পরে গেলে ভাল হতো। মগজে যেন কেটে বসে গেল শামানের কথা—কখনও তোমার পিছু ছাড়বে না আর! মালাটা চেপে ধরলাম গলার সঙ্গে। মনে হলো শান্তি পেলাম। ওরকম অনুভূতি আর কখনও হয়নি আমার। মুখ শুকিয়ে গেছে। কথা বলতে কষ্ট হলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন? আমার কাছে কি চায় ওটা?'

মাথা নাড়ল শামান। 'কি চায় জানি না। শুধু জানি,' একটা হাত তুলল সে, 'যেহেতু কালো মালাটা গলায় পরেই ফেলেছ, ইনডিয়ানদের নিয়ম অনুযায়ী তোমাকে এখন বীর যোদ্ধা বলে প্রমাণ করতে হবে নিজেকে। তা নাহলে ওই প্রহরী ধ্বংস করে ছাড়বে তোমাকে।'

আরও শুকিয়ে গেল গলার ভেতরটা। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করলে বীর যোদ্ধা হব? এখন তো আর লড়াই হয় না যে গিয়ে যুদ্ধ করে আসব।'

'যুদ্ধ না করেও বীর হওয়া যায়। এমন একটা কাজ করতে হবে তোমাকে, যাতে মৃত যোদ্ধাদের আত্মা শান্তি পায়।'

'কাজটা কি?'

'তা তো বলতে পারব না।'

'কাজটা কি, তাই যদি না জানি, কি করে করব?'

দীর্ঘক্ষণ কোন কথা বলল না শামান আমার গলার মালাটার দিকে তাকিয়ে থেকে চুপ করে ভাবতে লাগল তারপর বলল, 'এমন কিছু করো, যাতে বর্তমান ইনডিয়ানদের উপকার হয়। ওদের জিনিস ফেরত পায়। তাহলেই ওদের পূর্বপুরুষের আত্মা শান্তি পাবে। প্রহরীকে সরিয়ে নেবে তোমার পেছন থেকে।'

নয়

'আকাশের অবস্থা ভাল না,' রাতে খাবার টেবিলে বসে মা বলল। 'ঝড় আসবে আজ রাতে।'

আকাশে মেঘ। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল সেটা। ঢেকে দিল পুরো আকাশ। বিদ্যুৎ চমকাতে আরম্ভ করল। কিন্তু সেসব দিকে আমার তেমন নজর নেই। আমি ভাবছি, কি এমন জিনিস খোয়া গেছে ইনডিয়ানদের, যেটা ফেরত এনে দিতে না পারলে কুকুরটা আমার পিছু ছাড়বে না?

'খাচ্ছিস না কেন, রবিন?' মা জিজ্ঞেস করল, 'চিন্তা করছিস নাকি কিছু?'

'কই, না তো,' মাকে দেখানোর জন্যে তাড়াতাড়ি বেশি বেশি করে খাওয়া শুরু করলাম।

কিন্তু কয়েক চামচ গিলেই আবার বন্ধ। গলায় আটকে যেতে লাগল। কুকুরটার কথা ভেবে খাবার নামতে চাইছে না গলা দিয়ে। গুহার ভেতরে ওটার ভয়ঙ্কর চেহারা, গরম দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস, বড় বড় দাঁত, লাল দুটো জ্বলন্ত চোখ, ওক গাছটাকে ঘিরে ভয়াবহ গর্জন, কিছুতেই দূর করতে পারছি না মন থেকে।

কি করব? কি করে ওটাকে আমার পেছন থেকে খসাব? ভেবে কোন কূলকিনারা করতে পারলাম না। কানে বাজছে শামানের কথা—'এমন কিছু করো, যাতে বর্তমান ইনডিয়ানদের উপকার হয়। ওদের জিনিস ফেরত পায়। তাহলেই ওদের পূর্বপুরুষের আত্মা শান্তি পাবে। প্রহরীকে সরিয়ে নেবে তোমার পেছন থেকে।'

কি উপকার করব? যদি দেখে কিছু করছি না তো কি করবে কুকুরটা?

কারও উপকার করতে হলে তার কিসের অভাব কিংবা কোন কোন অসুবিধে সেটা আগে জানা দরকার। হাতের চামচটা নামিয়ে রেখে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মা, এখান থেকে সেনিকা ইনডিয়ানরা চলে গিয়েছিল কেন, জানো কিছু?'

খেতে খেতে মুখ তুলল মা। অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। 'হঠাৎ সেনিকাদের ব্যাপারে এই আগ্রহ কেন?'

'দরকার আছে, মা, বলো না?' অনুরোধ করলাম।

বাবার দিকে তাকাল মা। আবার আমার দিকে। 'গেছে কি আর সাধে? ওদের তাড়ানো হয়েছে।'

'কারা তাড়িয়েছে?'

জবাবটা দিল বাবা, 'আর কারা? শ্বেতাঙ্গরা। স্পেন, ইংল্যান্ড, ফ্র্যান্স এ সব দেশের লোক। বিদেশী হয়েও এলাকার আসল অধিবাসীদের বের করে দিয়েছে। ইনডিয়ানদের বাপ-দাদার সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে। জোর করে ওদের জমি দখল করে ওদের কুকুরের মত তাড়িয়েছে। যারা যেতে চায়নি, তাদের নিষ্ঠুরের মত খুন করেছে। এ সব ইতিহাস তো তোমার জানার কথা, রবিন।'

'কিছু কিছু জানি। সব নয়। আচ্ছা, পাহাড়ের মাথার ওই কবরখানাটার মালিক কে?' জিজ্ঞেস করলাম, 'ইনডিয়ানরা নয়?'

'ছিল।'

'এখন?'

'ওরাই, তবে কবর আর দিতে আসতে পারে না,' এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে মুখে পুরল বাবা। চিবাতে চিবাতে বলল, 'এলেই লাঠি নিয়ে তাড়া করে শ্বেতাঙ্গরা।'

'ওরা আদালতে যায় না কেন? যদ্দূর জানি ইনডিয়ানদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে আমেরিকান সরকারের। জমির দলিল করে নিলেই তো ভোগদখল করতে পারে।'

'তাও করেছিল। কিন্তু দলিল করে আনার পর পরই কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে এখানকার সেনিকা সর্দার ব্ল্যাকফায়ার চার্লি টাসক্যানি। দলিলগুলো সব ছিল তার কাছে। কোথায় যে সে গেছে কেউ জানে না। দলিলগুলোও নিখোঁজ

হয়েছে তার সঙ্গে। গুজব আছে, চাঁদনি রাতে হান্টার রিজের মাথায় নাকি ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় লম্বা-চওড়া এক জোয়ান পুরুষকে, সঙ্গে বিশাল এক কালো কুকুর। লোকের ধারণা, ভূত।'

'তারমানে মরে গেছে?'

'হয়তো গেছে। নইলে আসে না কেন?'

'তার ছেলেমেয়ে কেউ নেই?'

'এক ছেলে ছিল। বাবা নিখোঁজ হওয়ার কয়েকদিন পর সেও বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। লোকে বলে, তাকে যেতে বাধ্য করেছিল এখানকার কয়েকজন প্রভাবশালী লোক। তারপর একে একে সবাইকে জায়গা ছাড়তে হলো একজন ইনডিয়ানকেও আর টিকতে দেয়া হলো না।'

'শামান হার্ট গ্যাটলিং বাদে?'

'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি তোমার?'

'হয়েছে। এতক্ষণে বুঝলাম এত জায়গা থাকতে বনে বাস করে কেন সে। তারমানে খোলা জায়গায় আসতেই দেয়া হয় না।'

'না,' মাথা নাড়ল বাবা। 'বড় নিষ্ঠুরতা। অমানবিক। যাদের জায়গা, তাদেরই ঠাঁই নেই, ভোগ করছে অন্য লোক। উড়ে এসে জুড়ে বসা একেই বলে।'

চুপচাপ ভাবলাম এক মিনিট। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, বাবা, দলিলগুলো যদি পাওয়া যায়, আবার কি তাদের জায়গায় ফিরে আসতে পারবে ইনডিয়ানরা?'

'তা পারবে। তখন অন্য কেউ বাধা দিলে পুলিশের সাহায্যও নিতে পারবে। তবে দলিল ছাড়া কিছুই করতে পারবে না।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। এক সর্দার নাহয় গেছে, বাকি ইনডিয়ানরা আদালতে গিয়ে দলিলের নকল বের করে আনে না কেন?'

'ইনডিয়ানরা সাদাসিধা মানুষ। শ্বেতাঙ্গদের আইন-কানুনের জটিলতা, ঘোরপ্যাঁচ কমই বোঝে। ওরা এখনও অপেক্ষা করে আছে বোধহয়, ওদের সর্দার ফিরে আসবে, তৈরি করে দেবে ওদের বহু আশার স্বপ্নভূমি।'

'কতদিন হলো সর্দার নিখোঁজ হয়েছে?'

'এই বছর পাঁচেক।' আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল বাবা, 'এত প্রশ্ন কেন? সর্দার আর দলিলগুলোর খোঁজ করছ নাকি?'

'এখনও করিনি। তবে করব ভাবছি।'

আর কিছু না বলে দ্রুত খাওয়া শেষ করে উঠে গেলাম ওখান থেকে। নিজের ঘরে গিয়ে একটা বই বের করলাম। কিন্তু মন বসাতে পারলাম না। তা ছাড়া আগের রাতে ঘুমাতে পারিনি। বইয়ের পাতার দিকে তাকিয়ে দুচোখ ভেঙে আসতে লাগল। শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কিন্তু এত ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুমাতে ভয় পেলাম। মন বলছে কুকুরটা আসবে সেরাতেও।

ঠিক করলাম, যত যাই ঘটুক, ঘর থেকে বেরোব না। না বেরোলে কোন ক্ষতি করতে পারবে না কুকুরটা।

বেশিক্ষণ খোলা রাখতে পারলাম না চোখ। ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভেঙে গেল বজ্রপাতের শব্দে।

এত জোরে বাজ পড়তে আর শুনিনি। চোখ মেললাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তীব্র নীল আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরও এসে পড়ল বিদ্যুতের আলো। দিনের মত আলোকিত হয়ে গেল।

আবার বজ্রপাত। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। জানালায় এত জোরে এসে আঘাত হানতে লাগল, ভয় হলো কাঁচ না ভেঙে যায়। কিন্তু ওটা তো খোলা ছিল? নিশ্চয় আমি ঘুমিয়ে পড়লে মা দেখতে এসেছিল। জানালা খোলা দেখে ঝড়ের কথা ভেবে বন্ধ করে রেখে গেছে। ভাল করেছে। নইলে ঘরের মধ্যে বন্যা বয়ে যেত। আমার পায়ের কাছের জানালাটার ছিটকানি বোধহয় ঠিকমত লাগেনি, বাতাসের ঝাপটায় সামান্য ফাঁক হয়ে গেছে পাল্লা। সেখান দিয়ে ফিসফিস করে কে যেন ডাকল, 'রবিন!'

বুকের মধ্যে ধক করে উঠল আমার। পুরুষের কণ্ঠ। কিন্তু বাবার নয়। কার তাহলে?

আবার ডাকল, 'রবিন?'

গায়ের চাদরের ধার খামচে ধরলাম। একটানে নিয়ে এসে ফেললাম বুক থেকে গলার কাছে।

কে ডাকে? ভুল শুনছি না তো?

আবার শোনা গেল ডাক, 'রবিন! শোনো!'

গুহার মধ্যেও আমার নাম ধরে ডাকতে শুনেছি। তবে এ ডাক সেই ডাক নয়। স্বাভাবিক মানুষের কণ্ঠের মত। জানালার ফাঁকটা দিয়ে আসছে।

কোনমতেই বাইরে বেরোব না। ওই মায়াডাককে অগ্রাহ্য করতে না পারলে মারা পড়ব—নিজেকে বোঝালাম। যতই ডাকুক, ঘর থেকে আর বেরোচ্ছি না আমি।

'রবিন! কথা শোনো?'

ঘর থেকে নাহয় না-ই বেরোলাম, কে ডাকে দেখতে তো অসুবিধে নেই? আস্তে করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ল না।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। বাজ পড়ল বিকট শব্দে।

উঠে বসলাম। বিছানা থেকে না নেমে বাঁকা হয়ে এগিয়ে গেলাম জানালাটার দিকে। হাত দিয়ে দেখলাম, পায়ের কাছটায় বিছানা ভিজে গেছে। জানালা বন্ধ না করলে আরও ভিজবে।

আবার বাজ পড়ল। ভয়াবহ শব্দ। থরথর করে কেঁপে উঠল সবকিছু। বিকট শব্দে কি যেন ভেঙে পড়ল বাইরে। বিদ্যুতের আলোয় এমন একটা দৃশ্য দেখলাম, ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে গেল আমার।

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম লম্বা এক লোককে। জানালার কাছ থেকে মাত্র চার ফুট দূরে। লম্বা চুল ঘাড়ের ওপর নেমে এসেছে। মাথায় পাখির পালকের মুকুট। গায়ে হরিণের চামড়ার হাতে বানানো জ্যাকেট, পরনে একই চামড়ার প্যান্ট। বহুকাল আগের ইনডিয়ান যোদ্ধারা যে রকম পরত। পাশে দাঁড়ানো একটা কালো কুকুর। মৃত্যুপুরীতে যেটাকে দেখেছি।

সোজা আমার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

জানালা বন্ধ করব কি, হাঁটু কাঁপতে শুরু করল আমার। জানালার শার্সিটা ধরে না রাখলে উপুড় হয়ে পড়েই যেতাম।

আবার বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় রইলাম।

চমকাল। আলোকিত করে দিল আমাদের পেছনের আঙিনা। আবার দেখলাম লোকটাকে। দাঁড়িয়ে আছে একই ভঙ্গিতে। কুকুরটারও নড়াচড়া নেই। আমার দিকে তাকিয়ে আছে দুর্জনেই।

হাত তুলল লোকটা। মনে হলো আমাকে বাইরে যাওয়ার জন্যে ইশারা করল। তারপর আবার অন্ধকার।

আর দেখার অপেক্ষা করলাম না। আমি যেতে না চাইলে কি করবে লোকটা কে জানে! তাড়াতাড়ি জানালার ছিটকানি লাগিয়ে দিয়ে বালিশে মাথা রাখলাম। চাদর টেনে দিলাম মুখের ওপর।

ঘুম নেই আর চোখে। কান পেতে শুনছি বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব।

দশ

সকালবেলা বাড়ির চারপাশে ঘুরে দেখলাম। মানুষের পায়ের ছাপ দেখলাম না। কুকুরটারও না। এমনকি আমার জানালার নিচে যেখানে লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি সেখানেও কোন ছাপ নেই। সবখানে কাদা। পানি জমে আছে। একটা ম্যাপল গাছের মাথা জ্বলে গেছে। কাণ্ডটা মাঝখান থেকে চিরে দুই টুকরো। একটা অংশ ভেঙে পড়েছে মাটিতে। বাজ পড়েছিল গাছটার মাথায়।

নিনার আসার অপেক্ষায় রইলাম।

কিন্তু দুপুরের পর এল না ও। গেলাম ওর বাড়িতে। ওর মা বললেন, স্কুল থেকে ফেরেনি। গেলাম স্কুলে। দেখি বেজবল খেলছে। মাথায় সেই লাল বেজবল ক্যাপ। আমাকে দেখে হাত নাড়ল। আমিও নাড়লাম। দুই ক্লাসের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বুঝলাম খেলা শেষ না করে আসতে পারবে না ও। শেষ হতে সময় লাগবে।

ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। খেলা দেখতে ভাল লাগল না। মন জুড়ে আছে ভূত। চলে এলাম ওখান থেকে।

কিন্তু বাড়ি যেতেও ইচ্ছে করল না। কি করব? পা দুটো যেন ঠেলে নিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে ওই গুহার ভেতর।

ঝলমলে রোদ। আকাশে মেঘের চিহ্নও নেই কোনখানে। হান্টার রিজের পথ বেয়ে ওপরে উঠে চললাম আমি। এই রাস্তা, এই পাহাড়, সব নিনার মুখস্থ। আমার অতটা চেনা হয়নি, তাই দ্রুত এগোতে পারলাম না।

সঙ্গে নিনা নেই। একা যেতে কেমন যেন লাগছে। মনকে বোঝালাম—ও না আসাতে ভাল হয়েছে। ওর ভাল। কালো গুটির মালা আমি পরেছি, ও নয়।

কুকুরটার নজর আমার দিকে। অতএব যা করার আমাকেই করতে হবে। ওকে এ সবে টেনে আনব কেন? মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে?

হারলে ক্রীকের ওপরে চলে গেছে সূর্য। ডুবতে তখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকি। সূর্যাস্তের আগে কখনও বেরোয় না কুকুরটা। ওটার মালিক ইনডিয়ান লোকটার ভূতও নিশ্চয় রাতের আগে বেরোবে না। অতএব ওই মুহূর্তে মৃত্যুপুরীতে যাওয়া আমার জন্যে নিরাপদ। আশা করলাম সুড়ঙ্গে ঢুকে তল্লাশি চালিয়ে ভূত বেরোনোর আগেই বাড়ি ফিরে যেতে পারব।

কিন্তু জোর পেলাম না মনে। কেবলই চিন্তা হতে থাকল, আচ্ছা, সত্যি কি সূর্যাস্তের আগে বেরোয় না ভূতগুলো? ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলা অবশ্য বেরোত না। কিন্তু ওটা তো কল্পিত ভূত। বিশাল কুকুরটার লকলকে লাল জিব, ধারাল দাঁত, হিংস্র চেহারা আর রক্ত পানি করা বিকট চিৎকারের কথা ভেবে দমে গেলাম। আবার ওটার মুখোমুখি হতে হবে ভাবতেই কলজের পানি শুকিয়ে গেল। মনকে সাহস জোগালাম এই ভেবে, দুই দুইবার দেখা হয়েছে ওটার সঙ্গে আমার। ইচ্ছে করলেই ক্ষতি করতে পারত। করেনি। কিংবা করতে পারেনি। এর একটাই কারণ হতে পারে, আমার গলার কালো মালাটা। দুবার যদি রক্ষা করে থাকতে পারে আমাকে ওটা, আরও একবার পারবে।

কবরস্থানে উঠে গেছে যে রাস্তাটা, সেটার গোড়ায় এসে দাঁড়ালাম। দ্বিধা করলাম একবার। তারপর যা থাকে কপালে ভেবে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলাম।

পৌঁছে গেলাম ঘাসে ঢাকা সেই আয়তাকার জায়গাটায়। কবরস্থানে। মাঝখানে বিশাল ওকের অন্যপাশে মৃত্যুপুরীর কালো মুখটা যেন হাঁ করে আছে। অপরিচিত নয় আর এখন ওটা। তবু দিনের আলোতেও সেদিকে তাকিয়ে গা ছমছম করে উঠল।

আগেরবারের মতই সম্মান দেখানোর জন্যে কবরস্থান মাড়িয়ে না গিয়ে ওটার ধার ধরে এগোলাম। সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা হতে লাগল আবার—কে যেন আড়াল থেকে আমার ওপর নজর রাখছে। আমার প্রতিটি নড়াচড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে অদৃশ্য চোখের অধিকারী। চারপাশে তাকালাম। কেউ নেই। কবরস্থানটা একটা ঘাসে ঢাকা মাঠ। তাতে এমন কোন ঝোপ বা গাছ নেই যার আড়ালে লুকিয়ে আমার ওপর চোখ রাখবে কেউ। তাহলে কোনখান থেকে রাখছে? সব কি আমার মনের ভুল? কল্পনা? বনের দিকে তাকালাম। আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল যেন নীরব বনটা। মনে হলো আমার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসছে। ঘাড়ের পেছনটা শিরশির করতে লাগল।

মৃত্যুপুরীর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মনের পর্দায় ভেসে উঠল আহত ইনডিয়ান যোদ্ধাদের চেহারা। মৃত্যুর সময় হলে এখানে চলে আসত ওরা। ওই গুহার ভেতরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে কতজন! মনে মনে ঈশ্বরের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করলাম ওদের জন্যে। ওদের উদ্দেশ্যে জোরে জোরে বললাম, 'হে অশরীরী বীরেরা, আমি তোমাদের বিরক্ত করতে আসিনি। এসেছি তোমাদের বংশধরদের সাহায্য করতে। তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে। আমার গায়েও তোমাদের রক্ত আছে। তাই এই গুহাতে অধিকার আছে আমারও। আমাকে সাহায্য করো তোমরা।'

শার্টের নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে স্পর্শ করলাম একবার কালো মালাটা। ঢুকে পড়লাম গুহায়।

বাইরের চেয়ে ভেতরে অনেক ঠাণ্ডা। কয়েক পা এগোলাম। কি যেন পড়ল কাঁধে। চমকে গিয়ে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। আবার পড়ল। ওপর দিকে টর্চের আলো ফেলে দেখি পানির ফোঁটা। কোনও ফাটলে জমা হয়ে আছে বৃষ্টির পানি। ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে সেখান থেকে। নিজেকে বোঝালাম, সব কিছু সহজ ভাবে নাও, রবিন। অল্পতেই যদি এ ভাবে চমকে যাও, কাজ করবে কিভাবে?

মেঝেতে আলো ফেললাম। স্তূপ হয়ে আছে ধসে পড়া পাথর।

গুহার বাঁকটার অন্যপাশে চলে গেলাম। পেছনে আড়ালে পড়ে গেল গুহামুখ। বিকেলের রোদেলা আকাশও অদৃশ্য। চারপাশে শুধুই অন্ধকার। পাথর আর দেয়াল, দেয়াল আর পাথর ছাড়া অন্য কিছুই চোখে পড়ল না। ভয় তাড়ানোর জন্যে অন্যমনস্ক হতে চাইলাম। নিনার কথা ভাবলাম। কি করছে এখন ও? নিশ্চয় প্রতিপক্ষের ওপর প্রবল আক্রমণ চালিয়েছে। মাথায় লাল ক্যাপ। চোখের সানগ্লাসটা খুলে রেখেছে। খেলার সময় পরা যায় না।

আলো ফেললাম গুহার দেয়ালে। সুড়ঙ্গমুখ দুটোর ওপর। চ্যাপ্টা পাথরে বসে তেমনি বিকৃত হাসি হাসছে খুলিটা। যেন ব্যঙ্গ করছে আমাকে। ধস নেমে এত পাথর পড়ল, ওটার কিছু হয়নি। অবাক হলাম না। জানতাম, থাকবে ওটা। ফোকর দুটোর দিকে তাকালাম। একটার কাছে চিত হয়ে পড়ে আছে গোল পাথরটা, যেটা দিয়ে মুখ বন্ধ করেছিলাম। হয় আপনাআপনি পড়ে গেছে ওটা, কিংবা ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে কুকুরটা। পাহাড় কেঁপে ওঠায়, ধস নামায় হয়তো ফেলতে সুবিধে হয়েছে ওটার। ভাবলাম, ভূতই যদি হবে, তাহলে পাথর ফেলতে প্রকৃতির সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে কেন? নিজের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা নেই? মাথা চুলকালাম। কি জানি! কত রকম ভূত থাকে। একেক ভূতের একেক ধরনের ক্ষমতা।

আবার তাকালাম খুলিটার দিকে। কালো কোটর দুটোর দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিতে ভরে গেল মন। নিনার ধারণাই ঠিক মনে হতে লাগল। ওটাকে ওখানে ইচ্ছে করেই রেখেছিল সেনিকারা, যাতে অনুপ্রবেশকারীরা দেখলে ভয় পায়, সুড়ঙ্গে ঢুকতে সাহস না করে।

আড়াল থেকে কেউ যে লক্ষ করছে আমাকে সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা কিন্তু আছেই। মনে হচ্ছে আমাকে অনুসরণও করছে ওটা। অশরীরী কিছু? নাকি আমার মতই শরীর আছে ওটার। দেখার জন্যে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে আলো ফেললাম। নাহ্, কেউ নেই। অন্ধকার গুহা। কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না। কোন শব্দ নেই।

আবার ফিরলাম সুড়ঙ্গমুখ দুটোর দিকে। প্রথমে ডানে, তারপর বাঁয়ে। দুটোই খোলা। ভেতরে অন্ধকার। আগের বার নিনার সঙ্গে ঢুকেছিলাম ডানেরটাতে। ওটা দেখা হয়ে গেছে। বাঁয়েরটাতে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এগারো

ঢুকে যেতে শুরু করলাম সুড়ঙ্গের গভীর থেকে গভীরে। মাটি ভেজা ভেজা। নরম। বাইরের পানি পড়ে ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। সেজন্যেই এই অবস্থা। আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি মোড় আর গলি-ঘুপচি এটাতে। দুদিকের দেয়ালে আরও অনেক ফোকর দেখা গেল। কোনটা শুধুই গর্ত, কোনটা সুড়ঙ্গের মুখ। এখানে পথ হারালে কিংবা ভুল করে যদি ওগুলোর কোনটাতে ঢুকে পড়ে কেউ, বেরোনো মুশকিল। কোনটা দিয়ে কোনটাতে চলে যাবে, চিহ্ন দিয়ে না রাখতে পারলে শেষে বোঝাই যাবে না।

টর্চের আলো ফেলে খুব সাবধানে এগোতে লাগলাম। ভূতের ভয় তো আছেই, পথ হারানোর ভয়ও আছে। কোথাও কোথাও নিচু হয়ে যাচ্ছে ছাত। সেসব জায়গায় মাথা নুইয়ে ফেলতে হচ্ছে। অসাবধান হলে ঠোকর লাগছে মাথায়। দুপাশ থেকে চেপে এসে কোথাও সরু হয়ে যাচ্ছে পথ। হাঁটার সময় বেরিয়ে থাকা পাথরে ঘষা লাগে।

কিছুদূর এগোনোর পর থমকে দাঁড়ালাম। ফিসফিসে একটা কণ্ঠ কানে আসছে সেই প্রথম থেকেই। আগের দিনও শুনেছি বলে সেদিন আর গুরুত্ব দিইনি। আমার নাম ধরে ডাকাডাকি।

শব্দটা কোনদিক থেকে আসছে বোঝার চেষ্টা করলাম। কান পাতলে মনে হয়, চতুর্দিকেই হচ্ছে। যেদিকে তাকাই, সেদিক থেকেই আসে। বদ্ধ জায়গায় কিংবা সুড়ঙ্গের মধ্যে বোধহয় কোন রকম কারসাজি করে শব্দ, সেজন্যেই ওরকম লাগে।

কিন্তু এ ভাবে ডাকে কে? দেখা দরকার। কিছুটা সামনে এগিয়ে, কিছুটা পিছিয়ে, এদিক ওদিক আরও দুচারটা উপসুড়ঙ্গে ঢুকে বোঝার চেষ্টা করলাম। হদিস পেলাম না। বেশি ঘোরাঘুরি করতেও সাহস পেলাম না। অগত্যা 'ডাকে ডাকুক' এ রকম একটা মনোভাব নিয়ে আবার ফিরে এলাম মূল সুড়ঙ্গে। এগিয়ে চললাম সামনের দিকে।

সুড়ঙ্গের আরেকটা বড় মোড় ঘুরে অন্যপাশে বেরোতেই দেখি সামনে দেয়াল রুদ্ধ। আর যাওয়ার পথ নেই। ছোট একটা গুহায় ঢুকে শেষ হয়েছে পথ। প্রথমে দেয়ালগুলোতে আলো ফেললাম, তারপর মেঝেতে।

কি যেন একটা পড়ে আছে।

এগিয়ে গেলাম। একটা পুরানো ব্রিফকেস। ভেতরে কি আছে দেখার কৌতূহল হলো। কিন্তু তালা লাগানো। খুলতে পারলাম না। এখানে ব্রিফকেস ফেলে গেল কে? প্রথমেই মনে এল চোর-ডাকাতের কথা। হয়তো এর মধ্যে দামী অলঙ্কার কিংবা টাকাপয়সা আছে।

নিচু হয়ে হাতল ধরে তুলে নিলাম ওটা। হালকা। টাকা কিংবা অলঙ্কার বোঝাই হলে অনেক ভারী হতো। ঝাঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম কি আছে। মৃদু

খড়মড় শব্দ হলো। বোঝা গেল না কি আছে। একেবারে খালি নয়, এটুকু বোঝা গেল শুধু।

খোলার চেষ্টা করলাম। তালা লাগানো। চাবি নেই সঙ্গে। ভেঙে খুলতে হবে। বাইরে নিয়ে গিয়ে খুলে দেখব ভেবে রেখে দিলাম হাতে। বাঁ হাতে ব্রিফকেস ঝোলানো, ডান হাতে টর্চ। আর কি আছে গুহায় দেখতে লাগলাম। আমার একপাশে কয়েক হাত দূরে এক দেয়ালের গোড়ায় আলো ফেলতেই স্থির হয়ে গেল হাত। বরফের মত জমে গেলাম যেন। নড়তে পারলাম না। দম নিতে পারলাম না। এমনকি চিৎকারও করতে পারলাম না।

আগের রাতে ঝড়ের সময় যে লোকটাকে দেখেছি, সে পড়ে আছে দেয়ালের নিচে। তেমনি হরিণের চামড়ার পোশাক পরনে। মাথায় পালকের মুকুট।

ভাল করে দেখতে গিয়ে বুঝলাম, লোকটা নয়, তার কঙ্কাল। মাথার চুল সব খসে পড়েনি তখনও। শরীরের কিছু কিছু জায়গায় হাড়ের সঙ্গে চামড়া জড়িয়ে আছে।

টপ করে মাথায় পড়ল কি যেন। এতটাই চমকালাম, পানির ফোঁটা কিনা সেটা ভাবারও সময় হলো না। ঘুরে দৌড় দিতে গেলাম। দেয়ালে বাড়ি লেগে হাত থেকে ছুটে গেল টর্চ। মাটিতে পড়ে নিভে গেল। গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ শুনলাম। গাঢ় অন্ধকার যেন গিলে নিল আমাকে।

উবু হয়ে বসে হাতড়াতে শুরু করলাম।

টুপ করে ঘাড়ে পড়ল কি যেন। চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু না, পানির ফোঁটা। বেয়ে নামতে লাগল নিচের দিকে।

আবার হাতড়াতে শুরু করলাম মেঝেতে।

টর্চটা ঠেকল হাতে। তুলে নিয়ে সুইচ টিপলাম। জ্বলল না। ঝাঁকি দিলাম। তাও জ্বলল না। নানা ভাবে চেষ্টা শুরু করলাম জ্বালানোর জন্যে। জ্বলল না ওটা। হাত কাঁপছে। কিছুতেই স্থির রাখতে পারছি না। বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন।

যখন বুঝলাম, কিছুতেই জ্বালতে পারব না, আতঙ্কে অবশ হয়ে আসতে চাইল হাত-পা। এই অন্ধকারে বেরোব কি করে?

আন্দাজে পা বাড়ালাম সামনের দিকে।

কয়েক পা এগোতেই হোঁচট লাগল কিসে যেন। বিচিত্র খটমট শব্দ হলো। অকেজো টর্চটা মাটিতে রেখে নিচু হয়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম কিসে হোঁচট খেয়েছি। হাতে লাগল খসখসে, শক্ত কিছু। কঙ্কালের গায়ে হাত দিয়েছি বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাব। ঘুরে উল্টো দিকে দিলাম দৌড়।

সুড়ঙ্গমুখের কাছের দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেলাম। পাগলের মত হাত বাড়িয়ে ফাঁকা জায়গা খুঁজতে লাগলাম। ফাঁকা মানেই সুড়ঙ্গমুখ।

পেয়ে গেলাম ওটা। ছুটতে শুরু করলাম অনুমানের ওপর নির্ভর করে।

অকেজো টর্চটা আর তুলে আনিনি। কঙ্কালের কাছেই রয়ে গেছে। কিন্তু এত কিছুর মাঝেও ব্রিফকেসটা ফেলিনি হাত থেকে।

ছুটছি, ছুটছি, ছুটছি। গায়ে পাথরের ঘষা লাগতে বুঝলাম সুড়ঙ্গের সরু অংশটায় পৌঁছে গেছি। আরও কিছুদুর এগিয়ে মাথায় বাড়ি খেলাম। বুঝলাম, নিচু ছাত। আশা বাড়ল। ঠিকপথেই চলেছি।

ছোটা বন্ধ করে তখন হাঁটতে শুরু করলাম।

হাঁটছি তো হাঁটছিই, পথ আর শেষ হয় না। ঘটনাটা কি? এতক্ষণ তো লাগার কথা নয়?

আরও প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট হাঁটার পর সন্দেহ হলো, পথ হারাইনি তো?

কথাটা মনে হতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। প্রচণ্ড আতঙ্কে মরিয়া হয়ে ছুটতে শুরু করলাম আবার। দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছি। ঘষা লেগে ছড়ে যাচ্ছে কনুই। নিচু ছাতে ঠোকর খেয়ে মাথায় গোলআলুর মত ফুলে যাচ্ছে। কোন কিছুরই পরোয়া করছি না। কেবল ছুটছি আর ছুটছি।

হঠাৎ ধাক্কা খেলাম দেয়ালে। কপাল ঠুকে গেল। হাত বাড়িয়ে দেখে বুঝলাম, সামনে এগোনোর পথ নেই। সরে গেলাম একপাশে। ফোকর পাওয়া গেল একটা। এগোতে গেলাম। কিন্তু সুড়ঙ্গমুখ নয় ওটা। দেয়ালের গায়ে বড় একটা গর্ত। পিছিয়ে এলাম। হাতড়ে হাতড়ে বের করার চেষ্ট করলাম সুড়ঙ্গমুখ। অনেক চেষ্টা করেও পেলাম না। যেটা দিয়ে ঢুকেছি, সেটার মুখও বের করতে পারছি না আর।

অবশ হয়ে গেছে শরীর। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছি। নাক দিয়ে শিস কেটে বেরোচ্ছে নিঃশ্বাস। একটা দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়লাম।

হাল ছেড়ে দিয়েছি। মনে হলো, আর কোনদিন বেরোতে পারব না এই অন্ধকার গোলকধাঁধা থেকে। কেউ জানে না আমি এখানে আছি। কেউ আমাকে উদ্ধার করতে আসবে না।

মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি, বাইরে এখন বিকেলের রোদ। নীল আকাশ। সাদা সাদা মেঘ। পাখি গান গাইছে। ওসব আর কোনদিন দেখতে পাব না আমি! ভীষণ কান্না পেতে লাগল।

আরেকটা কথা মনে পড়তে আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেলাম। বাইরে এখনও দিন, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে না আর আলো। বিকেল শেষ হয়ে যাবে। সূর্য ডুববে। সন্ধ্যা নামবে। সূর্যাস্তের পর পরই বেরোয় কবরের প্রহরী! তারপর কি ঘটবে ভাবতে পারলাম না আর।

ঘাম ঝরছে দরদর করে। ঘাড়ের ঘাম মুছতে গিয়ে হাতে ঠেকল মালাটা। আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল মনে। এমন করে চেপে ধরলাম ওটা যেন ধরার ওপরই নির্ভর করছে আমার বাঁচা-মরা।

বারো

বাতাস ভেজা। মাটি ভেজা। বসে থাকতে থাকতে প্যান্টের হিপ ভিজে গেল। দেয়ালে হেলান দিয়ে থেকে শার্টের পিঠও ভিজল। শীত শীত করতে লাগল আমার।

কতক্ষণ ওভাবে বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ কানে এল, নাম ধরে ডাকছে কেউ। গুরুত্ব দিলাম না। খিঁচড়ে গেল বরং মেজাজ। আরও যন্ত্রণা দিতে চাইছে আমাকে।

বাড়তে লাগল ডাকটা। মনে হলো কাছে এগোচ্ছে।

তারপর আস্তে আস্তে আবার দূরে সরে গেল।

কয়েক মিনিট পর আবার শোনা গেল ডাকটা। আবার এগিয়ে আসছে। জোরাল হচ্ছে শব্দ।

আরও এগোতে চেনা চেনা লাগল স্বরটা। তেতো হয়ে গেল মন। আমার সঙ্গে রসিকতা করছে ভূতটা। চেনা মানুষের কণ্ঠ নকল করে আমাকে ধোঁকা দিতে চাইছে।

আরও এগিয়ে এল ডাক।

আর সহ্য করতে পারলাম না। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'যা ব্যাটা ভূতের বাচ্চা, ভূত! সর এখান থেকে! যা পারিস করগে আমার!'

আরও এগোল কণ্ঠটা। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'রবিন, কোথায় তুমি? কোত্থেকে কথা বলছ?'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ভুল শুনছি না তো? নিনার কণ্ঠ! নাকি ভূতটাই এসেছে নিনার রূপ ধরে আমাকে জ্বালাতে?

জবাব দিলাম না।

আবার শোনা গেল নিনার চিৎকার, 'রবিন, জবাব দিচ্ছ না কেন?'

চিৎকার করে জবাব দিলাম, 'নিনা, আমি এখানে! এই যে, এখানে! তুমি কোথায়?'

কয়েক সেকেন্ড পর আলো দেখতে পেলাম। এগিয়ে আসছে আলোটা।

উঠে দাঁড়ালাম। আমিও এগোলাম সেদিকে।

মুখের ওপর টর্চের আলো পড়ল আমার। নিনা জিজ্ঞেস করল, 'এই অবস্থা কেন তোমার?'

পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'তুমি এলে কি করে?'

জবাবে বলল ও, 'কেন আমি কি রাস্তা চিনি না নাকি?'

'না, সেকথা বলছি না। তুমি জানলে কি করে আমি এখানে আছি?'

'তুমি তো আর খেলা দেখলে না, চলে গেলে। আমি খেলা সেরে তোমাদের বাড়ি গেলাম। আন্টি বলল, তুমি দুপুরে খেয়ে সেই যে বেরিয়েছ, আর ফেরোনি। সন্দেহ হলো। কোথায় গেলে? মনে হলো, মৃত্যুপুরীতে চলে যাওনি তো? দৌড়ে বাড়ি গিয়ে একটা টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তোমাকে এখানে খুঁজে বের করতে অনেক কষ্ট হয়েছে আমার।'

'টর্চটা হাত থেকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। পথ হারিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে খুঁজে বের করলে কি করে?'

'মাটি নরম। পায়ের ছাপ বসে গেছে। দেখে দেখে এসেছি। হাতে ওটা কি?'

'চলো, যেতে যেতে বলছি।'

সুড়ঙ্গে চলতে চলতে সব কথা খুলে বললাম নিনাকে। আগের রাতে দেখা

জীবন্ত লোকটা গুহার ভেতর কঙ্কাল হয়ে পড়ে আছে শুনে ওর গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চাইল না। তাগাদা দিল, 'জলদি চলো, সূর্য ডোবার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে! ওই লোকটাই কুকুরের মালিক, বোঝা যাচ্ছে। মরে দুটোতেই ভূত হয়েছে!'

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ও।

পেছন থেকে সাবধান করলাম, 'সাবধান, যত যাই করো, হাত থেকে টর্চ ফেলো না! তাহলে মরেছি!'

আর কোন অঘটন ঘটল না। নিরাপদেই বেরিয়ে এলাম গুহাটায়, যেটা থেকে দুটো সুড়ঙ্গ দুদিকে চলে গেছে। ফিরে তাকালাম। পাথরের বেদিতে বসে নীরবে তেমনি বিকট হাসি হাসছে খুলিটা। ফিসফিস করে বললাম ওটাকে, 'সালাম, ভূতের রাজা, আর আসছি না এখানে! যত ইচ্ছে ভয় দেখাওগে এখন মানুষকে, আমাদের আর পাচ্ছ না।'

মৃত্যুপুরী থেকে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছাড়লাম।

পশ্চিম দিগন্তে নেমে গেছে সূর্য। আড়ালে যেতে বেশি বাকি নেই।

'জলদি হাঁটো!' তাগাদা দিল নিনা। 'সূর্য ডোবার আগেই কবর এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

খাড়া পাহাড়টার নিচে যখন নামলাম, সূর্য তখন ডুবে গেছে। তবে আর ভয় নেই ততটা। প্রহরীর এলাকা পার হয়ে এসেছি আমরা।

এতক্ষণে সহজ হয়ে এল নিনা। আমার হাতের ব্রিফকেসটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি আছে ওটাতে, বলো তো?'

'না খুললে বোঝা যাবে না। তবে অনুমান করতে পারছি।'

'কি?'

'দলিল। ইনডিয়ানদের জায়গার। আর গুহার ভেতরে মরে পড়ে থাকা লোকটা সেই ইনডিয়ান সর্দার, আমি নিশ্চিত।'

অবাক হলো নিনা। 'এ ভাবে হেঁয়ালি করে কথা বলছ কেন? কোন ইনডিয়ান সর্দার?'

ও, নিনা তাহলে জানে না ব্ল্যাকফায়ার চার্লি টাসক্যানির কথা। আগের রাতে বাবার কাছে যা যা শুনেছি সব বললাম ওকে।

মাথা দুলিয়ে নিনা বলল, 'তাহলে তো এখনই খুলে দেখতে হয় ব্রিফকেসটা।'

'এখানে না। বাড়ি গিয়ে।'

'আচ্ছা, ধরো, এটাতে দলিলই পাওয়া গেল। কি করবে?'

'নিয়ে যাব হার্ব গ্যাটলিঙের কাছে। ও-ই ভাল বলতে পারবে কি করতে হবে।'

আমার সঙ্গে একমত হলো নিনা, 'তা ঠিক। সোজা ওর বাড়িতে চলে গেলেই পারি?'

'না। রাত হয়ে গেছে। রোজ রোজ এ ভাবে বাড়ি না ফিরলে মা বকা দেবে। তা ছাড়া ব্রিফকেসে দলিলগুলো নাও থাকতে পারে। বাড়ি গিয়ে আগে দেখব। যদি দলিলই থাকে, তাহলে কাল সকালে প্রথম কাজটাই হবে আমাদের গ্যাটলিঙের বাড়িতে চলে যাওয়া।'

'কিন্তু সকালে তো আমার স্কুল।'

'তাহলে দুপুরে কিংবা বিকেলে যাব। তুমি স্কুল থেকে ফিরে এলে। তোমাকে না নিয়ে যাব না।'

'কথা দিচ্ছ?'

'দিচ্ছি। হাজার হোক, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। উফ্, তুমি না গেলে আজ কি যে হতো...'

আর কোন কথা হলো না আমাদের। দুজন দুদিকে চলে গেলাম। পাহাড়ী পথ বেয়ে নীরবে আমি নেমে চললাম আমাদের বাড়ির দিকে। বেশি দূরে নেই আর।

তেরো

গল্প শেষ করে একে একে সবার মুখের দিকে তাকাল রবিন। দম নিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি বুঝলে?'

মুসা বলল, 'এতে আর বোঝাবুঝির কি আছে? ভূত।'

ফারিহা কিছু বলল না। নীরবে হাত বোলাচ্ছে টিটুর মাথায়।

কি বলতে গিয়ে আবার বোকা বনে যেতে হয় এই ভয়ে কোন মন্তব্য করল না ফগ। বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'ঝামেলা!'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'কিছু বলছ না?'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন দুবার চিমটি কাটল কিশোর। 'কি আর বলব? ভূতুড়ে কোন কিছুই আমি দেখছি না এর মধ্যে।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল রবিন। 'দেখছ না মানে? সমস্ত ব্যাপারটাই তো ভূতুড়ে!'

'মোটেও না,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর। 'বলতে পারো, অনেকগুলো প্রশ্ন জমা হয়েছে, যেগুলোর জবাব জানা দরকার। ঠিকমত জবাব পেলেই আর ভূতুড়ে থাকবে না একটা ঘটনাও। তাই না?'

চুপ করে রইল রবিন।

ফগের দিকে তাকাল কিশোর। 'আপনি কিছু বুঝতে পারছেন না?'

'কোন্ ব্যাপারটা?' অস্বস্তিতে পড়ে গেল ফগ।

'এই যে এতগুলো ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটল। কোনটা কেন, বলতে পারবেন না?'

'ঝামেলা! আমাকে আবার এর মধ্যে টানছ কেন? আমি কি ওখানে ছিলাম নাকি?'

'এ সব বোঝার জন্যে ঘটনাস্থলে থাকা লাগে না।'

'তাহলে তুমিই বলো না,' চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল ফগ।

গ্রহণ করল কিশোর। হাত নাড়ল, 'বেশ, তাই বলছি। তবে ঘটনা ব্যাখ্যা করার আগে একটা কথা জানা জরুরী,' রবিনের দিকে তাকাল সে, 'রবিন, ব্রিফকেসটার মধ্যে দলিলই ছিল তো?'

'হ্যাঁ। ইনডিয়ানদের,' জবাব দিল রবিন।

‘নিশ্চয় হার্ব গ্যাটলিঙের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে। দেখে কি বলল ও?’

‘অনেক ধন্যবাদ দিল আমাদের। কাগজগুলো বার বার মাথায় ছোঁয়াল। বলল, ব্রিফকেসটা ওর কাছেই থাক। জায়গামত পৌঁছে দেবে দলিলগুলো।’

‘তারপর?’

‘অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল আমাদের কাছে। চলে এলাম আমরা। তার পরদিন আবার গিয়ে দেখলাম বাড়িতে নেই ও। দরজায় তালা। কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। আর কখনও ওকে দেখা যায়নি ওই অঞ্চলে।’

আবার মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ‘বুড়ো হয়েছিল তো, নিশ্চয় মারাটারা গেছে। হারলে ক্রীকে যাওয়ার আর সুযোগ পায়নি। ঠিক আছে, এখন রহস্যগুলোর জট ছাড়ানো যাক একে একে। প্রথমেই ধরা যাক, পায়ের ছাপের কথা। খোলা জায়গায় পায়ের ছাপ। শুধু কুকুরের। পাশে মাটিতে অদ্ভুত ঘষার দাগ। ঝোপের ডালপাতা ভাঙা। ওই ঘষা দাগ আর ঝোপঝাড় ভাঙা থেকেই নিশ্চিত বলে দেয়া যায়, ওগুলো ভূতের কাজ নয়। ভূত কখনও পায়ের ছাপ ফেলে না। ছায়ার মত যেখানে ইচ্ছে চলে যায়। এর একটাই ব্যাখ্যা, ঝোপঝাড় ভেঙে কুকুরটার সঙ্গে একজন মানুষও বেরিয়েছিল। আর সে ইনডিয়ান। কুকুরের পায়ের ছাপের পাশে তার নিজের পায়ের ছাপও পড়েছিল। ডাল ভেঙে পাতা দিয়ে ডলে সেগুলো মুছে দিয়েছিল। কেউ যাতে অনুসরণ করতে না পারে, সেজন্যে ওরকম করে নিজের চিহ্ন মুছে রেখে যায় ইনডিয়ান শিকারী।’

‘ও, তাই তো! ওয়েস্টার্ন গল্পে পড়েছি এ সব কথা। কিন্তু আমাদের বাড়িটার দিকে নজর দিয়েছিল কেন সে?’

‘এই প্রশ্নটার জবাবের ওপরই নির্ভর করছে পুরো রহস্যটার সমাধান। শোনো, হারলে ক্রীকে তোমরা যাওয়ার পরই নজর পড়েছিল লোকটার। কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, তোমার রক্তে সেনিকাদের রক্ত মেশানো আছে। নিজের জাতভাই ধরে নিয়েছিল তোমাকে সে। কোনভাবে গলার কালো মালাটা দেখেছিল। বুঝেছিল, দলিলগুলো যদি উদ্ধার করা কারও পক্ষে সম্ভব হয়, সে তুমি। তাই তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল। প্রথম দিনই কুকুরটা ঘটাল এক অঘটন। বনে থেকে শিকার করতে করতে নিশ্চয় ওর স্বভাব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কুনটাকে দেখে খুন করে বসল। চিৎকার শুনে তুমি বেরিয়ে পড়লে ঘর থেকে। ভয় পাচ্ছিলে। ওই সময় তোমার সঙ্গে কথা বলে সুবিধে হবে না বুঝে ফিরে গেল লোকটা।’

‘কোথায়?’

‘তার গোপন আস্তানায়।’

‘সেটা কোনখানে?’

‘হবে মৃত্যুপুরীর আশপাশে কোনখানে। বনের মধ্যে।’

‘গুহার ভেতর নয় কেন?’

‘কারণ, সে ইনডিয়ান। ওদের সমাজের নিয়ম-কানুন কড়াকড়িভাবে মেনে চলেছে। প্রথমত, কোন বীর যোদ্ধা ছাড়া মৃত্যুপুরীতে ঢোকার নিয়ম নেই। দ্বিতীয়ত, একমাত্র মৃত্যুর সময় হলেই কেবল ওখানে ঢুকতে হয়, তার আগে কোনমতেই নয়।

তাই দলিলগুলো গুহার ভেতরে আছে জানা থাকা সত্ত্বেও ওখানে ঢুকে বের করে আনতে পারেনি সে, আনার সাহস হয়নি। গুহার কাছাকাছি থেকেছে, কুকুরটাকে দিয়ে পাহারা দিয়েছে যাতে ওদের গোত্রের বাইরের কেউ ব্রিফকেসটা বের করে আনতে না পারে। সেই লোক জানত, গুহার ভেতর মরে পড়ে আছে সেনিকা সর্দার চার্লি টাসক্যানি। কোন কারণে ব্রিফকেসটা লোকটার হাতে দিয়ে যেতে পারেনি সর্দার। এমন হতে পারে, দলিলগুলো আনার পর লোকটা তার কাছাকাছি ছিল না। হঠাৎ করে সর্দার বুঝতে পারল, তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর কোন উপায় না দেখে, ব্রিফকেসটা তুলে দেয়ার মত বিশ্বস্ত কাউকে হাতের কাছে না পেয়ে ওটা নিয়েই মৃত্যুগুহায় মরতে চলে গেল সে। যেহেতু সর্দার, সেও নিশ্চয় সেনিকা বীর ছিল।

'যাই হোক, তোমাকে আর নিনাকে সুড়ঙ্গে ঢুকতে দেখল কুকুরের মালিক। কাকতালীয়ভাবে কুকুরটাও ওই সময় ঢুকে বসেছিল সুড়ঙ্গে। তাড়া করল ওটা তোমাদের। ঘেউ ঘেউ করে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ পাথর ধস নামিয়েছিল। এটা স্বাভাবিক। অনেক সুড়ঙ্গেই শব্দ ওভাবে ধস নামায়। তোমরা বেরিয়ে চলে এলে। কুকুরটা তোমাদের গাছ ঘিরে চক্কর দিতে থাকল। রাতের কোন এক সময়ে ওটাকে ডেকে নিয়ে গেল ওটার মালিক।

'পরদিন শামানের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তোমরা। আমার ধারণা, শামানের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও তোমার কথা ওকে বলার সুযোগ পায়নি তখনও কুকুরের মালিক। শামান তাই তোমার গলায় কালো মালা দেখে চমকে উঠেছিল। সেও বুঝেছিল, তোমাকে দিয়ে দলিলগুলো বের করানো সম্ভব। সরাসরি ওগুলো এনে দেয়ার কথা বলার সাহস পায়নি। কারণ তখনও বিশ্বাস করতে পারেনি তোমাকে। তুমিও শ্বেতাঙ্গ। যদি বেঈমানী করো? তাই ভূতুড়ে কুকুরের ভয়টা ভাঙেনি। বলেছিল সেনিকাদের জিনিস ওদের ফিরিয়ে না দিলে কুকুরটা পিছু ছাড়বে না তোমার। সত্যি ছাড়ত না, যতদিন তুমি বের করে না আনতে। ব্রিফকেসটা শামানকে দিয়ে আসার পর কি আর ওটা তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল?'

মাথা নাড়ল রবিন, 'না।'

'বললাম না। যাই হোক, তোমার সাহস দেখে আরও নিশ্চিত হলো কুকুরের মালিক, তুমি সত্যি বের করে আনতে পারবে ব্রিফকেসটা। তাই ঝড়ের রাতে আবার গেল তোমাদের বাড়িতে। ডাকাডাকি করল। কিন্তু ভয় পেয়ে তুমি আর বেরোলে না। ঘরে ঢুকে কথা বলার সাহস হলো না ওরও। ফিরে গেল।

'পরদিন সকালে বাড়ির আশেপাশে কোন পায়ের ছাপ দেখলে না তুমি। অত বৃষ্টি আর কাদাপানিতে ছাপ কি আর থাকে নাকি। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

'তারপর গিয়ে বের করে আনলে ব্রিফকেসটা। শামানকে দিয়ে দিলে। চলে গেল সে। ওটার জন্যে সেও কুকুরের মালিকের মত অপেক্ষা করছিল ওই বনে। পাওয়ার পর দুজনেই চলে গেল নিজের লোকেদের হাতে তুলে দিতে। এই হলো মোটামুটি গল্প। এখনও কি মনে হচ্ছে এর মধ্যে ভূতুড়ে কিছু আছে?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন। 'আচ্ছা, কুকুরের মালিকটা কে বলো তো? সর্দারের ছেলে?'

হাসল কিশোব, 'তাতে কি কোন সন্দেহ আছে? বাবা যেদিন মৃত্যুগুহায় চলে যায়, নিশ্চয় সেদিন বাড়ি ছিল না সে। সেবারের পর আর কখনও যাওনি হারলে ক্রীকে?'

'গেছি। বেশ কিছু ইনডিয়ান ফিরে এসেছে। বাড়ি করে বাস করছে। সর্দারের ছেলে কোনজন, জানতে পারিনি। কালো কুকুরটাকেও দেখিনি।'

'এমন হতে পারে, শামানের মতই আর হারলে ক্রীকে থাকতে আসেনি সর্দারের ছেলেও। ওদের একটা গোপন মিশন ছিল, দলিলগুলো উদ্ধার করা। তোমার সাহায্যে ওগুলো বের করে নিজের লোকের হাতে তুলে দিয়ে ওরা চলে গেছে অন্য কোনখানে। হতে পারে না এটা?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'পারে। আর মাত্র দুটো প্রশ্নের জবাব দরকার। এক নম্বর প্রশ্ন—কেন মনে হয়েছিল আড়ালে থেকে কেউ নজর রাখছে আমার ওপর?'

'মনে হয়েছিল, তার কারণ সত্যি রাখা হচ্ছিল। সতর্ক থাকলে মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এ সব টের পায়। সর্দারের ছেলে লুকিয়ে থেকে নজর রাখছিল তোমার ওপর। শত শত বছর ধরে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে বাস করে লুকিয়ে থাকার এক অসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করেছে ওরা। ওরা লুকালে বনের জন্তু-জানোয়ারেই দেখতে পায় না, তুমি দেখবে কি?'

আস্তে আস্তে মাথা দোলাল রবিন, 'হুঁ। আমিও শুনেছি এ সব কথা। ঠিক আছে, মেনে নিলাম। এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দাও। পাহাড়ের মধ্যে আমার নাম ধরে কে ডাকছিল?'

'ওটা, আমার বিশ্বাস, বাতাসের কারসাজি। পাহাড়টাতে অনেক ফাটল আছে, তোমার কথাতেই বোঝা গেছে। নানা জায়গায় ওপর থেকে পানি পড়তে দেখেছ। ওরকমই কোন একটা ফাটল দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় বিচিত্র শব্দ হয়, তোমার মনে হচ্ছিল তোমার নাম ধরেই ডাকছে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। কেন, প্রমাণ করতে যেতে চাও?'

'না বাবা,' দুহাত নেড়ে বলল রবিন, 'ভূত থাকুক বা না থাকুক, আমি ওই মৃত্যুপুরীর ধারেকাছে নেই আর! একবারই যথেষ্ট। যত খুশি শব্দ করুকগে গুহাটা, আমার তাতে কি?'

ফগের দিকে তাকাল কিশোর। চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে শুনছে পুলিশ কনস্টেবল। ও তাকাতেই চঞ্চল হয়ে গেল চোখের তারা। ফগকে খোঁচানোর জন্যে কিশোর বলল, 'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, যাবেন নাকি ওই পাহাড়ে? চলুন না গিয়ে দেখে আসি কিসে শব্দ করে? খানিক আগে না বললেন রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন?'

গলা খাঁকারি দিল ফগ। অহেতুক কাশল। বিড়বিড় করে বলল, 'ঝামেলা! আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন?'

মুচকি হাসল কিশোর, 'ভয় পেলেন নাকি?'

'ভূতকে ভয় পাব আমি? আর লোক পেলে না,' আবার কোন্ বেকায়দা প্রশ্নে ফেঁসে যায় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল ফগ। 'ইস্, অন্ধকার হয়ে গেল যে! ওদিকে কত কাজ পড়ে আছে।' দরজার দিকে রওনা হলো সে।

পেছন থেকে ডেকে বলল মুসা, 'চলে যাচ্ছেন যে? আপনার অভিজ্ঞতার কথা শোনাবেন না?'

ফিরল না ফগ। দরজার কাছে গিয়ে জবাব দিল, 'আহ্, ঝামেলা! আজ না, আরেকদিন।'

বেরিয়ে গেল সে।

মুখ বাঁকিয়ে ফারিহা বলল, 'ওর অভিজ্ঞতা না কচু। ও কোত্থেকে ভূত দেখবে? নিজেই তো ভূত হয়ে বসে ছিল একবার। আসলে জানতে এসেছিল, কোনও কেসের তদন্ত করছি কিনা আমরা। মাঝখান থেকে বিনে পয়সায় গল্পটা শুনে গেল।'

'খেক! খেক!' করে উঠে যেন বলতে চাইল টিটু, 'আমি তো তখনই চেয়েছিলাম পায়ে কামড়ে দিয়ে আগাম পয়সা শোধ করে নিতে, তোমরাই তো দিলে না।'

***
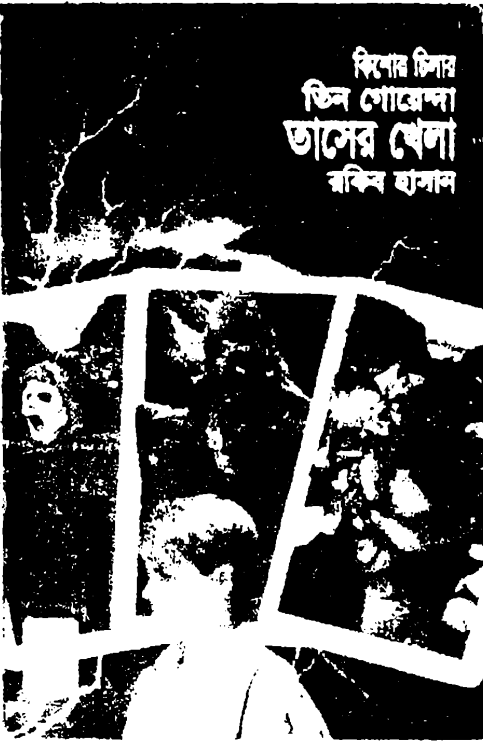
তাসের খেলা

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

মুসা আমান। দুষ্ট রাজা।

কি করে হলো?

তাসের খেলা খেলতে গিয়ে।

খেলাটা শুরু করার সময় ওরা জানত না কতটা বিপজ্জনক এই খেলা।

কিশোর জানলেও আঁচ করতে পারেনি এতটা বিপদে পড়ে যাবে। কারণ জিপসিদের কাছ থেকে সে যেটা শিখে এসেছে, সেটা নিছকই খেলা। দাবা-লুডু-কেরমের মত। যাতে শুধুই মজা। মোটেও বিপজ্জনক নয়।

গোড়া থেকেই বলা যাক।

গরমের ছুটি শেষ হতে তখনও হপ্তা দুই বাকি। বিরক্ত। রীতিমত বিরক্ত লাগছে এখন মুসা ও রবিনের।

গ্রীষ্মের দীর্ঘ সব দিন। কাটানোর কোন উপায় নেই।

ছুটিতে পড়ার জন্যে যত বই রেখেছিল, সব শেষ। কম্পিউটার গেমগুলো হাজার বার করে খেলেছে। পরিবারের সঙ্গে দূরে বেড়ানোও হয়ে গেছে। নিরাপদেই কাটিয়ে এসেছে এবার। বিপত্তি বলতে শুধু কয়েক ডজন মশার কামড়। সাঁতার কাটা, বেজবল খেলা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়া, হই-হুল্লোড়, বনের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে অলস সময় কাটানো, সব শেষ।

এখন আর কিছুই করার নেই। সময় এখন বড়ই একঘেয়ে। এ রকম থাকত না, যদি কোনমতে একটা রহস্য জোগাড় করা যেত।

কিন্তু রহস্যেরও যেন দুর্ভিক্ষ লেগেছে। পাওয়াই যায় না।

বাড়ির এক পাশের চত্বরে ভাঙা ম্যাপল গাছটার নিচে বসে আছে মুসা। রবিন উঠে বসেছে গাছে। চেরা কাণ্ডের একটা ফালির ওপর।

কিছুদিন আগে বাজ পড়েছিল গাছটার মাথায়। ঠিক মাঝখান থেকে চিরে দু'ভাগ করে দিয়েছে। দুটো দিক দু'দিকে হেলে পড়ে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে আছে। দুটো ধনুক।

গোড়া থেকে খুঁড়ে তুলে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন মুসার আম্মা মিসেস আমান। কিন্তু জিনিসটা দেখতে এতই অদ্ভুত, ফেলতে মন চায়নি মিস্টার আমানের। তাঁর কাছে জিনিসটাকে একটা চমৎকার ভাস্কর্য মনে হয়েছে। বললেন, থাক না, যতদিন ওভাবে থাকে।

শুরুতে কয়েকদিন ওগুলোতে আরাম করে পা দুলিয়ে চড়ে বসেছে মুসা।

তবে এ ধরনের আরামেরও একটা সীমা আছে। এখন আর ভাল লাগে না।
বরং মহা বিরক্ত।

গাছের গোড়ায় মাটিতে বসে আছে সে। ঘাস ছিঁড়ছে। একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে মুঠো করে তুলে ছুঁড়ে মারছে রবিনের দিকে। বাগানের ঘাস ছেঁড়াটা ঠিক হচ্ছে না। জানে। কিন্তু চুপচাপ থাকতে ভাল লাগছে না। হাত দুটোকে ব্যস্ত রাখছে।

ঘাড়ের পেছনে সুড়সুড়ি লাগল মুসার। হাত দিয়ে টিপে ধরে একটা বড় কালো পিঁপড়ে তুলে আনল।

গাছের ডালে পা দোলাতে দোলাতে হাসল রবিন।

পিঁপড়েটা কোথা থেকে এসেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না মুসার। ঘাস ছোঁড়ার প্রতিশোধ নিয়েছে রবিন। ডাল থেকে তুলে নিয়ে মুসার অগোচরে তার ঘাড়ে ফেলেছে।

'বিরক্ত কোরো না তো,' ঘাড় ডলতে ডলতে বলল মুসা।

'বরং বলো, এ সব করে বিরক্তি কাটাও তো,' রবিন বলল।

এত একঘেয়েমীতে পেয়েছে, কথাবার্তাও দুজনের বিরক্তিকর লাগছে।

'বাড়ি চলে যাই,' রবিন বলল।

ওর দিকে আরেক মুঠো ঘাস ছুঁড়ে দিয়ে মুসা বলল, 'বাড়ি গিয়ে কি করবে?'

জবাব দিতে পারল না রবিন।

'ইস্, কিশোরটাও সেই যে গেল, আসার আর নাম নেই,' আফসোস করে বলল মুসা। 'ও থাকলে এত একঘেয়ে লাগত না। কোন না কোন উপায় একটা বের করেই ফেলত।'

'হ্যাঁ.' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'ছুটি শেষ না করে বোধহয় আর আসবেই না এবার।'

'আমাদেরও ওর সঙ্গে মনটানায় চলে যাওয়া উচিত ছিল। রকি পর্বতটা দেখে আসা যেত আরেকবার।'

'ভুল যা করার করে ফেলেছি। এখন আর ভেবে লাভ নেই।'

কিছু একটা করা দরকার। উঠে দাঁড়াল মুসা। ওদের ব্লকের শেষ মাথার দিকে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল। একটা বাড়ির কোণে লোক জড় হয়েছে।

'খাইছে! পুরানো জিনিস বিক্রি করছে মনে হয়,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে রবিনের কাঁধ থেকে একটা কুটো তুলে নিয়ে ফেলে দিল মুসা।

'মিস্টার কাকু-কাকুর বাড়িতে!' অবাক হলো রবিন। 'জিনিসপত্র সব বেচে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে নাকি ও?'

'জানি না তো। এইমাত্র দেখলাম।'

প্রতিবেশী হিসেবে অতি জঘন্য কাকু-কাকু। কারও সঙ্গেই সদ্ভাব নেই। আর ছোটরা তো ওর দু'চোখের বিষ।

গত শীতে মুসা গিয়েছিল কাকু-কাকুর বাড়িতে। পুরানো বাড়ি। কি যেন এক রহস্য লুকিয়ে রাখে বাড়িটা। দেখলেই গা ছমছম করে তার। পারতপক্ষে ওদিকে ঘেঁষতে চায় না। সেবার গিয়েছিল বিশেষ একটা কাজে। ক্যান্ডি বিক্রি করতে।

লাভের টাকায় শীতে কষ্ট পাওয়া মানুষকে সাহায্য করার জন্যে।

দরজায় থাবা দিতেই কুত্তা লেলিয়ে দিল কাকু-কাকু। ভয়ঙ্কর একটা জার্মান শেফার্ড কুকুর আছে তার। বিশাল।

দৌড়ের অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করল সেদিন মুসা। নইলে কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হওয়া লাগত।

এ হেন কাকু-কাকু কি বিক্রি করছে ভেবে অবাকই লাগল তার। কৌতূহলটা দমাতে পারল না।

'চলো তো দেখে আসি,' বলেই লাফাতে লাফাতে ছুটল ড্রাইভওয়ে ধরে।

পেছন থেকে ডাকল রবিন। 'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। লোকটা ভীষণ পাজি...'

'কি বিক্রি করছে ও দেখতেই হবে আমাকে,' পেছনে তাকিয়ে বলল মুসা। 'নির্যাতনের অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করলেও অবাক হব না। এই যেমন পিটিয়ে চামড়া তোলার চাবুক, হাড় কাটার করাত, মাথায় পেঁচানোর কাঁটাতার। বিকৃত রুচির খুনী তো লোকটা। হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর লোকও হতে পারে।'

মুসার রসিকতায় হাসল না রবিন।

কাকু-কাকুর সামনের চত্বরের সুন্দর করে ছাঁটা লন মাড়িয়ে ছুটল দু'জনে। খোলা গ্যারেজের সামনে চার-পাঁচজন প্রতিবেশী। জিনিসপত্র ঘাঁটছে।

চাবুক, করাত বা ও রকম কোন কিছুই দেখল না। অতি সাধারণ জিনিসপত্র। প্রথম টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল মুসা। শিকার ও মাছ ধরার ওপর পুরানো একগাদা ম্যাগাজিন। বেশ চকচকে একজোড়া পুরানো ফ্যাশনের জুতো। একটা টোল খাওয়া দূরবীন। ঝিনুকের মত দেখতে একটা অ্যাশট্রে।

দূর, ফালতু জিনিস সব!

'দাম কত এটার?' সোনালী ফ্রেমে বাঁধাই একটা তৈলচিত্র তুলে দেখাল এক জিপসি মহিলা। রক্তিম সূর্যাস্তের সময় পালতোলা নৌকার ছবি।

মহিলা কাকু-কাকুর প্রতিবেশী। নাম লীলা রেডরোজ। এ এলাকায় এসেছে খুব বেশি দিন হয়নি। এ-ও আরেক বিচিত্র চরিত্র। কারও সঙ্গে মেশে না। কথা বলে না। একা একা ঘরে বসে থাকে। তাই পড়শীরাও ওকে এড়িয়ে চলে। সেটাও আবার ওর ভাল লাগে না। ভাবে, তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করা হচ্ছে। ছোটদের ধারণা, বাড়ি বসে থেকে নানা রকম জড়িবুটির গবেষণা করে বুড়ি। তুকতাকের বিদ্যে শেখে। প্রেতসাধনা করে।

'একশো ডলার,' হাঁকল মিস্টার কাকু-কাকু। গ্যারেজের ভেতরে আরাম করে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে সে। হলদে রঙের পাতলা দুই হাতের তালুতে মাথার পেছনটা এলিয়ে দেয়া।

মাথায় ঝাঁকড়া চুল। সব সাদা। ঠিক মাঝখানে সিঁথি। সাদা মস্ত গোঁফজোড়া দেখতে অদ্ভুত। দুই পাশ থেকে বিচিত্র ভঙ্গিতে বেরিয়ে রয়েছে কোনা দুটো। মুখটা আপেলের মত টকটকে লাল। কেমন চারকোনা।

সবচেয়ে অদ্ভুত ওর চোখ দুটো। শয়তানি ভরা। নীল। সারাক্ষণই যেন রাগে জ্বলে। আনমনে বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গে কথা বলে লোকটা। ক্রমাগত ভ্রূকুটি করে।

পরনে ঢোলা খাকি রঙের পাজামা। তাতে প্রচুর দাগ। গায়ে লাল টি-শার্ট। খাটো। ফুলে ওঠা ভুঁড়িটা পুরোপুরি ঢাকতে পারেনি।

টেবিলে কাত করে ছবিটা নামিয়ে রাখল রেডরোজ।

'ভাল করে রাখুন। ভাঙলে কিন্তু আপনাকেই নিতে হবে,' কাকু-কাকু বলল। খসখসে কণ্ঠ তার। চড়া স্বর। কক্কক্ করে হাসল। মুরগী ডাকল যেন। লাফিয়ে উঠল তার সাদা গোঁফ।

পুরানো একটা রূপকথার বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল রবিন। তাড়াতাড়ি বইটা নামিয়ে রেখে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল মুসাকে। ফিসফিস করে বলল, 'চলো, কেটে পড়ি। যেমন কাকু-কাকু, তেমনি রেডরোজ। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার।'

গ্যারেজের ভেতরে একটা টেবিল চোখে পড়ল মুসার। এমন করে রাখা, প্রায় দেখাই যায় না। তাতে ডজনখানেক ছোট ছোট পুতুল। রবিনের কথা অগ্রাহ্য করে গ্যারেজে ঢুকে পড়ল সে। পুরানো র‍্যাকে রাখা ততোধিক পুরানো কতগুলো কোটের পাশ দিয়ে ঘুরে এগোল টেবিলটার দিকে।

কাছে যাওয়ার পর বুঝল, ওগুলো পুতুল নয়। বাতিদান। কালো কাঠ কুঁদে তৈরি করা হয়েছে রূপকথার ড্রাগন, এলভ্‌স্ জাতীয় নানা রকম দৈত্য-দানবের প্রতিকৃতি।

একটা বাতিদান হাতে তুলে নিল সে। কল্পিত জীবটার অর্ধেক শরীর মানুষের, অর্ধেক ঘোড়ার।

পাশে এসে দাঁড়াল রবিন। 'বিচ্ছিরি।' ইঁদুরের লেজের মত লম্বা লেজওয়ালা হোঁৎকা একটা মূর্তির দিকে হাত বাড়াল। 'এটা কোন জীব?'

মুসা কিছু বলার আগেই ধমকে উঠল কাকু-কাকু। 'অ্যাই, ছেলেরা। কি চুরি করা হচ্ছে?'

উঠে দাঁড়াল সে। জ্বলন্ত নীল চোখের দৃষ্টি দুজনের ওপর স্থির। দুই হাত কোমরে রেখে রাগত ভ্রূকুটি করতে থাকল।

হাত থেকে বাতিদানটা ছেড়ে দিল রবিন। তোতলাতে শুরু করল, 'না না, আ-আমরা কিছু চুরি করছি না।'

'আমরা শুধু দেখছিলাম,' মুসা বলল।

'ওগুলো ছোটদের জিনিস নয়,' ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিল কাকু-কাকু। 'যাও, বাড়ি যাও। অন্যের বাড়িতে ছোঁকছোঁক কোরো না এসে।'

রাগ লাগল মুসার। কান গরম হয়ে যাচ্ছে। 'কিন্তু বিক্রির জন্যেই তো রেখেছেন এ সব।'

'বিক্রির জন্যে রেখেছি, চুরির জন্যে নয়...'

'দেখুন, আমরা চোর নই...'

'যাবে? নাকি ডাক দেব কুত্তাটাকে?' কাকু-কাকুর চোখের ঠাণ্ডা নীল দৃষ্টি যেন বিদ্ধ করতে লাগল ওদের।

'চলো,' মুসার হাত ধরে টান দিল রবিন, 'লোকটা...পাগল!'

দুটো টেবিলের মাঝখান দিয়ে বেরোনোর পথ। রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে রেডরোজ। মুসা তার পাশ কাটানোর সময় ধাক্কা লাগল। মুসার মনে হলো,

ধাক্কাটা রেডরোজই দিল। সবতে গিয়ে পা পিছলাল মহিলা। পতন ঠেকানোর জন্যে মুসার শার্ট খামচে ধরল। ধমকে উঠল, 'এই, দেখে চলতে পারো না!'

'কিন্তু আপনিই তো ধাক্কা দিলেন...'

'চুপ! বেয়াদব ছেলে কোথাকার!'

নাহ্, এদের সঙ্গে পারা যাবে না। সবগুলো উদ্ভট। নিজেই দোষ করে নিজেই ধমকাচ্ছে। কি কাণ্ড! হাল ছেড়ে দিল মুসা।

আর কোন অঘটন যাতে না ঘটে, সে-ব্যাপারে সতর্ক থাকল। সাবধানে বাইরে বেরিয়ে এল।

সোজা হাঁটা দিল বাড়ির দিকে। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে এসে। পেছন ফিরে তাকাল না আর।

বাড়ি পৌঁছে দেখল রান্নাঘরের দরজা বন্ধই রয়েছে। তারমানে বাবা-মা এখনও ফেরেননি বাইরে থেকে। পকেটে হাত দিল চাবির জন্যে।

হাতে লাগল জিনিসটা।

বিস্ময় ফুটল চেহারায়।

ধীরে ধীরে বের করে আনল হাতটা।

অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

'কি জিনিস?' জানতে চাইল রবিন।

রবিনের দেখার জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিল মুসা।

চারকোনা, আয়তাকার একটা বাক্স।

রবিন বলল, 'তাসের বাক্স মনে হচ্ছে না?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল মুসা। দরজা খোলার জন্যে চাবি বের করল পকেট থেকে।

'কিন্তু এটা তোমার পকেটে এল কি করে?' চোখের পাতা সরু করে মুসার দিকে তাকাল রবিন। 'চুরি করলে নাকি?'

দুই

তাসের বাক্সর ওপরের লেখাটা জোরে জোরে পড়ল মুসা, 'ভয়াল তাস!'

অবাক হয়ে মুসার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'কি বললে?' খাওয়ার টেবিলের সামনে সাজানো চেয়ারে বসেছে দুজনে।

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল মুসা। 'ভয়াল তাস। বাক্সের গায়ে লেখা রয়েছে। এই দেখো।'

'ও এমনি লিখেছে। একটা নাম দেয়া দরকার তো।' বিড়বিড় করল রবিন। 'কিন্তু চুরি করলে কেন?'

'চুরি করিনি।'

'কাকু-কাকুর বাড়ি থেকে আনোনি?'

'আগে যখন ছিল না পকেটে, মনে তো হচ্ছে ওখান থেকেই এনেছি,' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মুসা।

'চুরি করোনি! অথচ বলছ, ওখান থেকেই এনেছ...' আচমকা চোখ বড় বড় হয়ে যেতে লাগল তার। তুড়ি বাজাল। 'ঠিক! বুঝে ফেলেছি!'

ভুরু কুঁচকাল মুসা। 'কি বুঝলে?'

'লীলা রেডরোজ! ইচ্ছে করে পড়েছিল তোমার গায়ের ওপর। কেন?'

ধীরে ধীরে হাঁ হয়ে যেতে লাগল মুসার মুখ। 'তারমানে...তারমানে...'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'চুরিটা সে-ই করেছে। আর পাচার করার বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছে তোমাকে।'

'তাতে ওর লাভটা কি?'

'বুঝতে পারছি না।'

একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল মুসা। তারপর বাক্সটা খুলল। কাত করে টেবিলের ওপর ঢালল তাসগুলো। ঘাঁটতে শুরু করল।

সাধারণত বাক্সের সব তাসের পিঠে এক রকম ছবি আঁকা থাকে। এ তাসগুলোর সে-রকম নয়। একেকটার পিঠে একেক ছবি। সেগুলো বিচিত্রও বটে। কোনটাতে মুখোশ পরা নাইট, কোনটাতে শয়তান-চেহারার কল্পিত বামন-মানব, কোনটা ড্রাগন, কোনটা বা শুয়োরমুখো মানুষ। আরও নানা রকম অদ্ভুত সব ছবি আঁকা রয়েছে তাসগুলোয়। কোনটা কোন জীব, কি নাম, ওপরে লেখা রয়েছে।

'ভয়ঙ্কর সব ছবি,' দেখতে দেখতে বলল মুসা।

ভালমত দেখার জন্যে কাত হয়ে এল রবিন। 'মুসা, তাসগুলো দেখে মনে হচ্ছে অতি প্রাচীন। নিশ্চয় অ্যান্টিক ভ্যালু আছে। কাকু-কাকু দাম নিশ্চয় অনেক বেশি চাইত। সে-জন্যে চুরি করেছে জিপসি বুড়ি। তোমাকে দিয়ে পাচার করিয়েছে। তোমার কাছ থেকে নিতে আসবে, আমি শিওর। চোরাই মাল রাখা উচিত না। চলো, কাকু-কাকুকে ফেরত দিয়ে আসি।'

'হুঁ। যাই। আর চোর ভেবে ক্যাঁক করে কলার চেপে ধরুক আমাদের। পুলিশে খবর দিক। গলা কেটে ফেললেও বিশ্বাস করবে না আমরা চুরি করিনি। লীলা রেডরোজও স্বীকার করবে না তখন। সব দোষ হবে আমাদের। কে যায় ঝামেলায়...'

আচমকা গমগমে ভারী একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল পেছন থেকে, 'মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও!'

অস্ফুট চিৎকার করে উঠল রবিন। চমকে গেল মুসা। হাত থেকে তাসগুলো ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

অট্টহাসি ফেটে পড়ল কানের কাছে। 'কি, মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত?'

'আরি, তুমি!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'কখন এলে?'

'এই তো, ঘণ্টাখানেক হলো। তোমাদের বাড়িতে ফোন করে জানলাম তুমি এখানে। মুসাকে আর ফোন না করে চলেই এলাম।...তা কেমন চমকে দিলাম?' মুখ থেকে একটা বড় সামুদ্রিক ঝিনুকের খোসা সরাল কিশোর। 'মিনি লাউডস্পীকার। স্যুভনির। জিপসিদের কাছ থেকে কিনেছি।'

স্বস্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুসার মুখে। 'এক্কেবারে সময়মত এসেছ। মনে মনে তোমাকেই চাইছিলাম আমি।'

'রহস্য নাকি?'

'রহস্য ঠিক বলা যাবে না। ঘটনাটা বেশ মজার। তবে ভেজালেও পড়তে পারি, বলা যায় না।'

'কি হয়েছে?' ভুরু জোড়া কাছাকাছি হলো কিশোরের। তাসগুলোর ওপর চোখ পড়তে জিজ্ঞেস করল, 'তাস নিয়ে বসেছ কেন?'

'এগুলোর কথাই তো বলছি,' মুসা বলল।

'চুরি করে এনেছে ও,' মিটিমিটি হাসছে রবিন।

ভুরু জোড়া আরও কুঁচকে গেল কিশোরের। 'চুরি করেছে? তাস চুরি করতে গেল কেন?'

'ও নিজে করেনি। করানো হয়েছে।'

এতক্ষণে আগ্রহ দেখা গেল কিশোরের চোখে। 'কি ভাবে করাল?'

হাত তুলল মুসা। 'বসো। সব বলছি।'

একটা তাস টেনে নিল কিশোর। বিস্ময় ফুটল চোখে। 'এ জিনিস পেলে কোথায়?'

'চেনো মনে হচ্ছে?' কিশোরের অবাক হওয়া দেখে মুসাও অবাক।

বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, এবারই তো দেখে এলাম জিপসিদের কাছে। ওদের ছেলেমেয়েরা সংগ্রহ করে। সাধারণ তাসের মত খেলাও যায় না এ দিয়ে। খেলাটা ভিন্ন রকম। তবে মজার।'

আগ্রহ বাড়ছে রবিনের। 'জানো নাকি কি ভাবে খেলতে হয়?'

মাথা কাত করল কিশোর। 'শিখে এসেছি। আমাদের বয়েসী একটা জিপসি ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার কাছ থেকে এক প্যাকেট তাস নিয়েও আসতে চেয়েছিলাম। আসার সময় আর মনে ছিল না।'

চোখ চকচক করছে মুসার। কিছুক্ষণ আগের বিরক্তির ছিটেফোঁটাও নেই আর এখন চেহারায়।

'দুষ্ট রাজা, পিশাচ নাইট, মানুষখেকো ড্রাগন এ সব নিয়ে খেলতে হয় খেলাটা,' কিশোর বলল আবার। 'প্রচুর যুদ্ধটুদ্ধ করা লাগে। জাদু আছে। ব্ল্যাক ম্যাজিক আছে। কম্পিউটার গেমের চেয়ে কোন অংশে উত্তেজনা কম না। বরং কয়েকজনে মিলে খেলা যায় বলে মজা অনেক বেশি।'

হাত বাড়াল কিশোর। 'দেখি?'

মুসার হাত থেকে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল সে।

'কি ভাবে খেলতে হয় বলো তো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'বলে নয়, খেলেই দেখাব। কিন্তু আগে বলো, কোথায় পেলে এ জিনিস?'

তিন

মুসা আর রবিনের খিদে পেয়েছে। কিশোরও বাড়ি থেকে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে চলে এসেছে। খিদে রয়েছে তার পেটেও।

খেতে খেতে কথা হলো তিনজনের। তাসগুলো কি ভাবে পেয়েছে মুসা, সব জানানো হলো কিশোরকে।

উঠে গিয়ে রেফ্রিজারেটরের ডালা খুলল কিশোর। একটা কোকের ক্যান বের করে নিয়ে এসে বসল আবার আগের জায়গায়। রবিন আর মুসাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা?'

'তুমি খেতে থাকো,' মুসা বলল। 'দরকার হলে আমরা বের করে নেব।'

ক্যানের মুখটা খুলে খাওয়া শুরু করল কিশোর। পুরোটা শেষ করার আগে থামল না। খালি ক্যানটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। মুসা আর রবিনের খাওয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রইল।

ওদেরও খাওয়া শেষ হলো।

'এবার শুরু করা যাক।' তাসগুলো টেনে নিয়ে সব এলোমেলো করে দিতে লাগল কিশোর।

মুসার মুখোমুখি জানালার দিকে পেছন করে বসেছে রবিন। জানালা দিয়ে শেষ বিকেলের রোদ আসছে ঘরে। কমলা আভা এসে পড়েছে দুজনের গায়ে। জ্বলছে যেন ওরা।

'মুসা, লুডুর পাশা নিয়ে এসোগে তো কয়েকটা,' কিশোর বলল। 'আছে? অন্তত চারটে পাশা দরকার।'

'থাকার তো কথা,' উঠে দাঁড়াল মুসা। 'দেখি খুঁজে। পাই নাকি।'

সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে ওপরতলায় উঠে গেল সে। ড্রয়ার, বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করে খুঁজে চারটে পাশা বের করে নিয়ে নিচে নেমে এল।

তাসগুলোকে চারটে সমান ভাগে ভাগ করল কিশোর। উপুড় করে রাখল সবগুলো।

পাশাগুলো কিশোরের সামনে টেবিলে ফেলে দিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল মুসা।

'এই দেখো, চারটে ভাগে ভাগ করলাম তাসগুলোকে।' আঙুলের টোকা দিয়ে প্রতিটি ভাগকে দেখিয়ে কোনটার কি নাম বলতে লাগল কিশোর, 'চরিত্রতাস, শক্তিতাস, কর্মতাস এবং ভাগ্যতাস। কোন চরিত্রে খেলবে, চরিত্রতাস থেকে প্রথমে সেটা ঠিক করতে হবে তোমাকে।'

টেবিলের ওপর দিয়ে তাসগুলো মুসার দিকে ঠেলে দিল সে। 'নাও, একটা তাস টেনে নাও। যেটা ইচ্ছে।'

মাঝখান থেকে একটা তাস টেনে নিল মুসা। উল্টে দেখল। 'রাজা! দারুণ

তো! আমি রাজা!'

'আমি আগে টানলে আমিই রাজা হতাম,' রবিন বলল।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'উঁহু। তুমি ওটা না-ও টানতে পারতে। দেখা যেত, রাজা না টেনে গোলাম টেনেছ।'

হাসল রবিন। 'এমনি বললাম। রাজা হবার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।'

'রাজা হলেই যে খুব সাংঘাতিক কিছু হয়ে যাবে, তা-ও না,' কিশোর বলল। 'একেবারে দুর্বল রাজাও বনে যেতে পারে মুসা। শক্তিতাসের ওপর নির্ভর করে অনেক কিছু।' মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে শক্তি-সামর্থ্য সব হারিয়ে আমাদের গোলামে পরিণত হয়েছ।'

'নামটা কি হবে সে-রাজার?' ভুরু নাচিয়ে হাসল রবিন। 'গোলাম-রাজা। বাহ্, সুন্দর একটা নাম আবিষ্কার করলাম তো। গোলাম-রাজা।'

'সেই স্বপ্নেই বিভোর থাকো,' মুসা বলল। 'মনে রেখো, প্রথম সুযোগটা পাওয়া মাত্রই তোমাদের দুজনের মুণ্ডু কেটে ফেলার আদেশ দেব আমি।'

ভ্রূকুটি করল রবিন। সামনে ঝুঁকে এল। 'তারমানে তুমি দুষ্ট রাজা?'

'খেলা খেলাই,' জানিয়ে দিল মুসা। 'এখানে একজন আরেকজনকে হারানোটাই মূল কথা।'

'তাই বলে মুণ্ডু কেটে···তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি, মুসা।'

ওদের ঝগড়াটা বাড়তে দিল না কিশোর। রবিনের দিকে চরিত্রতাসের গাদাটা ঠেলে দিয়ে বলল, 'নাও। তোমারটা তোলো।'

চোখ বন্ধ করে একটা তাস টেনে নিল রবিন। উল্টে দেখেই আঁউক করে উঠল, 'দূর! গথ! হওয়ার আর কিছু পেলাম না যেন?' হতাশা ঢাকতে পারল না সে।

রবিনের হাত থেকে তাসটা নিয়ে দেখতে দেখতে বলল কিশোর, 'এটাও কম শক্তিশালী নয়। এখানে গথ হলো একজন জাদুকর। যে ইচ্ছেমত তার দেহের রূপ পরিবর্তন করতে পারে।'

কিছুটা উজ্জ্বল হলো রবিনের মুখ। 'জাদুকর? তারমানে আমার জাদু করার ক্ষমতা আছে?'

'আছেই, এ কথা বলার সময় হয়নি এখনও,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে ক্ষমতা তৈরি হতে পারে।'

মুসার দিকে তাকাল রবিন। 'ক্ষমতা পেলে রাজাকে ব্যাঙ বানিয়ে ফেলব আমি।'

ব্যাঙের মত ডেকে উঠল মুসা। এত জোরাল আর বাস্তব শোনাল ডাকটা, চমকে গেল রবিন।

হা-হা করে হেসে উঠল মুসা। 'আহা, কি আমার জাদুকররে। বানাও আমাকে ব্যাঙ। এমন হাঁক ছাড়ব, ভয়ে বাপ-বাপ করে আবার মানুষ বানিয়ে দিতে পথ পাবে না।'

কিশোরও হাসল। হাত তুলল। 'আচ্ছা, থামো এখন। প্যাঁচাল বাদ। খেলাটাই তো শুরু করতে দিচ্ছ না। এমন করলে বাদ দিয়ে দেব কিন্তু।'

'না না না, আর করব না।' তাড়াতাড়ি বলে উঠল মুসা। 'অনেক দিন পর তোমাকে পেয়েছি তো। খুশিতে বাচাল হয়ে গেছি। কি করতে হবে বলো এখন?'

চরিত্রতাসগুলোকে আবার শাফল করে নিজেরটা টেনে নিল কিশোর। উল্টে দেখে জানাল, 'আমি হলাম ক্রেল।'

বুড়ো আঙুল আর মধ্যমার সাহায্যে তাসটা তুলে ধরে দেখাল সে। মুসা আর রবিন দুজনেই দেখতে পেল তাসের গায়ে আঁকা ছবিটা। অদ্ভুত এক বামন-জীব। মানুষের মত দেহ। মুখটাও মানুষের মত। কিন্তু নাকটা লম্বা। সামনের দিকে ঠেলে দেয়া। সরু একটা পাইপের মত। গোলাপী কানের ওপরের দিকটা চোখা। মাথায় একটা রোমশ লাল হ্যাট। হাতে ইয়া বড় ছুরি। ফলাটা বাঁকানো।

'এই ক্রেল জিনিসটা কি?' জানতে চাইল মুসা। 'ভাল না মন্দ?'

'সেটা নির্ভর করে অনেক কিছুর ওপর,' জবাব দিল কিশোর।

'ক্রেলের চেয়ে কি গথেরা বেশি শক্তিশালী?' রবিনের প্রশ্ন।

'সেটাও নির্ভর করে।'

'কিসের ওপর নির্ভর করে?' জানতে চাইল রবিন।

'বুঝতে পারবে একটু পরেই,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'চরিত্র নির্বাচন হলো। এখন আমাদের শক্তি অর্জন করতে হবে। পাশা চালতে হবে। মুসা, চারটে পাশা একই সঙ্গে চালো। দেখা যাক কি ওঠে তোমার ভাগ্যে। পাশার এক ফোঁটা সমান একশো পয়েন্ট শক্তি।'

আগের বারের কথা মনে আছে। রবিনকে অভিযোগ করার সুযোগ দিল না মুসা। 'তুমি আগে চালো।'

'কেন, ভয় পাচ্ছ? পয়েন্ট কম পেয়ে গোলাম হয়ে যাওয়ার?'

আর দ্বিধা করল না মুসা। চারটে পাশাই তুলে নিয়ে হাতের তালুতে ঝাঁকিয়ে টেবিলের ওপর গড়িয়ে দিল। সবগুলোতেই পাঁচ কিংবা ছক্কা। হাত ওপরে তুলে ঝাঁকি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ইয়াহু! বিরাট ক্ষমতার অধিকারী এখন আমি!'

রবিন আর কিশোরও পাশা চালল। দুজনের কারোরই তিনের বেশি উঠল না।

'নাহ্,' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল কিশোর, 'রাজাটা সত্যিই শক্তিশালী হয়ে গেল।' রবিনের দিকে তাকাল সে। 'দুজনে একজোট হয়ে রাজার সঙ্গে লাগতে হবে এখন আমাদের। নইলে পারব না।'

মুচকি হাসল মুসা। 'রাজা রাজাই। তাকে দমন করা অত সহজ না।'

'দেখা যাবে,' চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল কিশোর।

'রাজারও ভুলে যাওয়া উচিত না,' রবিন বলল, 'জাদুকরের চেয়ে শক্তিশালী কিছু নেই। যা খুশি করে ফেলতে পারে জাদুকর।'

'কথার লড়াই বাদ দাও না তোমরা,' চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। 'শক্ত হয়ে বসো। খেলাটা অনেকটা পুরানো গল্পের মত। গল্পের তিনটে চরিত্র আমরা। এখন চোখ বোজো। কল্পনা করতে থাকো, প্রাচীন যুগে রয়েছি আমরা। রাজা-বাদশাদের যুগে। বনের মধ্যে বাড়ি। বনের কিনারে একটা দুর্গ।'

'রাজার দুর্গ! আমার!' মুসা বলে উঠল।

তার কথায় কান দিল না কিশোর। গম্ভীর ভঙ্গিতে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'বনটা ভয়ানক বিপজ্জনক। অদ্ভুত সব প্রাণীর বাস ওখানে। মুখোশ পরা নাইট। মিউট্যান্ট যোদ্ধা। ক্রেল। গথ। মর্ড। জেকিল। বিষাক্ত উদ্ভিদ। নিষ্ঠুর শত্রুরা সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায় বনের মধ্যে।'

ভয় পেয়ে গেল মুসা। 'কিশোর, এমন করে বলছ, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!'

থামল না কিশোর। কর্মতাসের গাদাটা মুসার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'তাস টানো। হাতে নিয়ে ওল্টাও। এরপর যা ঘটবে সামাল দেয়ার জন্যে তৈরি করো নিজেকে।'

কি ঘটবে?

কিশোরের গম্ভীর মুখভঙ্গি, আবেগঘন ভারী কণ্ঠ, কালো চোখের স্থির দৃষ্টি ঘাবড়ে দিল মুসাকে। আগের মত হালকা নেই আর পরিবেশটা। কি জানি কেন মেরুদণ্ডের ভেতরে শিরশির করে উঠল তার।

সবচেয়ে ওপরের তাসটা টেনে নিয়ে উল্টে ফেলল।

হলুদ রঙের একটা মোটা বিদ্যুতের শিখা আঁকা রয়েছে ওতে।

তাসটা টেবিলের ওপর রাখল সে।

সঙ্গে সঙ্গে গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল।

জানালার বাইরে বিদ্যুৎ চমকাল।

বাজ পড়ল বিকট শব্দে।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

বাইরে তো উজ্জ্বল রোদ। বজ্রপাত হয় কি করে?

ছোঁ মেরে তাসটা তুলে নিল সে।

আবার মেঘের গুড়গুড়। বিদ্যুতের চমক। বজ্রপাত।

বিদ্যুতের আলোয় চোখে পড়ল একটা কুৎসিত, বিকৃত মুখ। বিচিত্র আলোয় সবুজ, কাঁপা কাঁপা দেখাচ্ছে। জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

চার

চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। ধাক্কা লেগে চেয়ারটা উল্টে পড়ল মেঝেতে। ঠাস করে শব্দ হলো। আরেকবার চমকে গেল সে।

জানালার বাইরে বাজ পড়ল আবার। কাছেই কোথাও। বাড়ির দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল সে-শব্দ।

থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই আলোয় মুখটাকে দেখা যাচ্ছে এখনও।

কাকু-কাকু!

জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে রেখেছে। গোল কুতকুতে চোখের দৃষ্টি ওদের

ওপর স্থির। তারপর হাত তুলে রান্নাঘরের দরজাটা খুলে দিতে ইশারা করল সে।

চিৎকারটা যেন আপনিই বেরিয়ে এল মুসার মুখ থেকে। 'ও এখানে কি করছে?'

ভারী দম নিল। দরজাটা খুলে দিতে এগোল সে।

টান দিয়ে খুলল দরজার পাল্লা। এই সময় প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল আবার। কেঁপে উঠল বাড়িটা। পেছনের সিঁড়িতে মুষলধারে আছড়ে পড়তে দেখল বৃষ্টির ফোঁটা। পেছনের আঙিনার বুড়ো গাছগুলো দমকা বাতাসের ঝাপটায় গুঙিয়ে উঠে নুয়ে নুয়ে পড়ছে।

মুহূর্তে এ ভাবে বদলে গেল কি করে আবহাওয়া? অবাক লাগল তার।

বৃষ্টির মধ্যে পিঠ কুঁজো করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল কাকু-কাকু। সাদা চুলগুলো ভিজে লেপ্টে গেছে মাথার সঙ্গে।

হলুদ রঙের একটা বর্ষাতি চাপিয়ে দিয়েছে তার টি-শার্ট ও পাজামার ওপর। বর্ষাতির গায়ে চকচক করছে বৃষ্টির ফোঁটা। চোখের পাতা সরু করে মুসার দিকে তাকাল সে।

'আমি জানতাম এ বাড়িতেই থাকো তুমি,' খসখসে, চড়া স্বরে কথা বলল কাকু-কাকু। ভেজা গোঁফ জোড়া বিচিত্র ভঙ্গিতে দুলে উঠল ঠোঁটের ওপর।

মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে কিশোর আর রবিনের দিকে তাকাল সে। টেবিল থেকে উঠে এসে ওর পাশে দাঁড়াল রবিন।

'তোমরাই তখন গ্যারেজে ঢুকেছিলে, তাই না?' সন্দিহান দৃষ্টিতে দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল কাকু-কাকু। 'একটা তাসের প্যাকেট খোয়া গেছে ওখান থেকে।' কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল সে। কুতকুতে চোখের দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে মুসা আর রবিনের ওপর। 'তোমরা নিশ্চয় কিছু জানো না। তাই না?'

রবিনকে মাথা ঝাঁকাতে দেখল মুসা। বুঝতে পারল সত্যি কথাটা বলে দিতে যাচ্ছে রবিন।

'আমরা চোর নই, মিস্টার কাকু-কাকু!' রবিন মুখ খোলার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মুসা। 'এ কথাটাই তো জিজ্ঞেস করতে এসেছেন?'

মোরগের মত মাথা কাত করে একপাশ থেকে তাকাল কাকু-কাকু। 'সত্যি জানো না?'

'বললামই তো আমরা চোর নই,' মুসা বলল। 'আমরা আপনার তাস চুরি করিনি।'

মাথা ঝাঁকাল কাকু-কাকু। চোয়াল ডলল। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। তার বর্ষাতিতে বাড়ি খেয়ে রান্নাঘরের মেঝেতে এসে পড়ছে পানি।

ঘরের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিল সে। গলা লম্বা করে তাকাল মুসা আর রবিনের দিকে। মুখের কাছে মুখ চলে এল। পুদিনার গন্ধ তার নিঃশ্বাসে।

'আশা করি সত্যি কথাই বলছ,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে। 'কারণ এ তাসগুলো খেলার জিনিস নয়।'

ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে গেল মুসা। কিন্তু ভয়টা চেহারায় প্রকাশ পেতে দিল না। কাকু-কাকুর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি বলতে চান আপনি?'

'আমি বলতে চাই, ওগুলো খেলনা নয়। ভয়ানক বিপজ্জনক।'

'আপনি···আপনি আমাদের ভয় দেখাতে এসেছেন, ঠিক না?' কোনমতে বলল মুসা।

'ভয়? ভয়ের দেখেছ কি?' তারপর ফিসফিস করে অদ্ভুত সম্মোহনী কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে, ভয় যখন পেতেই চাইছ, পাও ভয়! ভীষণ ভয়!'

হলুদ বর্ষাতিটা ভাল করে গায়ের ওপর টেনে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল সে। হারিয়ে গেল প্রবল ঝড়ের মধ্যে।

বরফের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মুসা। কানে বাজছে কাকু-কাকুর কথাগুলো। পাও ভয়! ভীষণ ভয়! নড়ে উঠল হঠাৎ। তাড়াতাড়ি দরজা লাগিয়ে তালা আটকে দিল।

ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে। তাসগুলো টেবিলে দেখতে পেল না। লুকিয়ে ফেলেছে কিশোর। হাতটা টেবিলের নিচ থেকে বের করে আনল আবার সে।

অন্য সময় হলে হেসে ফেলত মুসা। এখন হাসল না। 'লুকালে কেন?'

'নইলে চোর ভাবত আমাদের। কোনমতেই বিশ্বাস করানো যেত না।'

'আমিও এ জন্যেই স্বীকার করিনি। কিন্তু তুমিও কি শুধু এ কারণেই ফেরত দাওনি তাসগুলো?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'তাসগুলো আমাকে ভীষণ কৌতূহলী করে তুলেছে। সাধারণ খেলা মনে হচ্ছে না এখন আর। এর শেষ না দেখে আমি ছাড়তে চাই না।'

'কিন্তু পাও ভয়। ভীষণ ভয়, বলে কি বুঝিয়ে গেল লোকটা?' চেয়ারে বসল মুসা। 'অভিশাপ দিল নাকি?'

'আরে দূর! অভিশাপ না কচু! খেলো তো···'

রবিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই তাসের গাদার সবচেয়ে ওপরের তাসটা তুলে উল্টে ফেলল মুসা।

তাসটার বুক কালো রঙ করা।

আস্তে করে তাসটা রাখল টেবিলে।

মুহূর্তে দপ করে নিভে গেল ঘরের সমস্ত বাতি।

পাঁচ

'বাবাগো!' বলে চিৎকার দিয়ে আরেকটু হলে চেয়ার থেকেই পড়ে যাচ্ছিল মুসা।

'আরি, এমন করছ কেন?' অন্ধকারে শোনা গেল রবিনের কণ্ঠ। 'ঝড়ের সময় এমন বিদ্যুৎ যেতেই পারে।'

'আ-আমার···তা মনে হয় না,' কথা আটকে যাচ্ছে মুসার। 'বিদ্যুতের শিখা আঁকা একটা তাস তুলে নিলাম। অমনি বিদ্যুৎ চমকানো শুরু করল। এখন একটা কালো রঙ করা তাস তুললাম। আলো চলে গেল। রাতের মত কালো অন্ধকারে

ছেয়ে গেল।'

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। দেয়ালের সুইচবোর্ডটা হাতড়াতে শুরু করল সে। কয়েকবার করে টিপল। খটাখট শব্দ হলো। কিন্তু আলো জ্বলল না।

'থামো, মুসা,' রবিন বলল। 'অকারণে ভয় পাচ্ছ। ঝড়ের সময় ইলেকট্রিসিটি যায়ই,' আবার বলল সে। 'তার জন্যে এ রকম মাথা গরম করে ফেলার কিছু নেই।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'এসো, অন্ধকারেই খেলি। দেখা যাক না কি হয়।'

কিন্তু রাজি হলো না মুসা।

ডাইনিং রুমে গিয়ে ঢুকল। টেবিল থেকে মোমবাতি তুলে নিয়ে ফিরে এল। অন্ধকারে দিয়াশলাই বের করতে সময় লাগল। তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার টেবিলে তাসগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ল ওরা। মোমের কমলা আলোয় লম্বা ছায়া পড়ল রান্নাঘরের টেবিলটাতে।

'আবার খেলা শুরু করা যাক,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কিশোর। 'রবিন, একটা কর্মতাস তুলে নাও।'

একটা তাস টেনে নিল রবিন। মোমের আলোয় তুলে ধরল কি আছে দেখার জন্যে। আড়াআড়ি দুটো তরোয়াল আঁকা। নিচে একটা হেলমেট।

'গথ জাদুবলে একদল সৈন্য সৃষ্টি করল এখন,' কিশোর বলল। 'রাজার দুর্গ হামলার মুখে। নিজের দুর্গ থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাজাকে পাশের অন্য রাজার আরেকটা দুর্গ দখল করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে।'

'কি করে করব?' জানতে চাইল মুসা।

বাইরে বিকট শব্দে বাজ পড়ল। জানালার কাঁচে আঘাত হানছে প্রবল বৃষ্টির ফোঁটা। বাতাসে কাত হয়ে যাচ্ছে মোমের শিখা। প্রায় নিভু নিভু হয়ে গিয়ে লাফিয়ে সোজা হয়ে যাচ্ছে আবার।

'তোমাকেও একদল সৈন্য সৃষ্টি করতে হবে,' মুসার প্রশ্নের জবাব দিল কিশোর। চারটে পাশা ঠেলে দিল টেবিলের ওপর দিয়ে। 'প্রতি ছয় ফোঁটার জন্যে একশো করে নাইট তৈরি হবে তোমার।'

পাশাগুলো তুলে নিয়ে হাতের তালুতে রেখে ঝাঁকানো শুরু করল মুসা। 'কিশোর, নিয়ম-কানুনগুলো কি তুমি বানিয়ে নিচ্ছ ইচ্ছেমত?'

'না। এ ভাবেই এ খেলা খেলতে হয়। মনে মনে রাখতে হয় হিসেবটা। কঠিনই,' টেবিলের ওপর অধৈর্য ভঙ্গিতে টোকা দিতে লাগল কিশোর। 'কথা না বলে যা বলছি করে ফেলো না।...এত ঝাঁকানো লাগে নাকি? ফেলো ফেলো, পাশা ফেলো। পর পর তিনবার ফেলতে পারবে। তার বেশি না। এই তিনবারে তোমাকে কম করে এক হাজার নাইট জোগাড় করতে হবে।'

পাশাগুলো টেবিলে গড়িয়ে দিল মুসা। তিনটে চার আর একটা ছক্কা পেল।

'মোট আঠারো পয়েন্ট,' মোমের আলোয় পাশার ফোঁটাগুলো ভালমত দেখে হিসেব করল কিশোর। 'তারমানে তিনটে ছক্কার সমান। এবং তারমানে তিনশো

নাইট জোগাড় হলো তোমার।'

'মাত্র তিনশো!' হতাশ হলো মুসা। তবে মজা পেতে শুরু করেছে। 'আরও সাতশো সৈন্য...'

থেমে গেল সে। কথা শোনা যাচ্ছে। বহু মানুষের মিলিত কণ্ঠ। চাপা হাসি। একটা ঘোড়া ডাকল। চিৎকার। চেঁচামেচি।

বাইরে থেকে আসছে নাকি?

ঘুরে জানালার দিকে তাকাল মুসা। অন্ধকারে এমনিতেই কিছু দেখা যায় না। তার ওপর জানালার কাঁচে বৃষ্টির পানির পর্দা। দৃষ্টি ভেদ করে ওপাশে যেতে দিচ্ছে না।

'শুনতে পাচ্ছ?' ফিসফিস করে বলল সে।

'ও কিছু না,' রবিন বলল। 'গাছের মাথায় আঘাত হানছে বৃষ্টি আর বাতাস। কি সাংঘাতিক ঝড় শুরু হলোরে বাবা! একেবারে হঠাৎ করেই। একফোঁটা মেঘও তো জমতে দেখিনি।'

'হুঁ, আবার পাশা ফেলো,' কিশোর বলল। 'আরও সৈন্য দরকার তোমার। মাত্র তিনশোজন নাইট নিয়ে একটা দুর্গ দখল করতে পারবে না তুমি।'

আবার পাশা গড়িয়ে দিল মুসা। বাইরের কথা শোনার জন্যে কান পাতল। কানে এল শুধু বাতাসের গর্জন আর বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ার একটানা শব্দ।

দপ্ দপ্ করে উঠে কাত হয়ে গেল মোমের শিখা। পাশাগুলো ভাল করে দেখার জন্যে টেবিলের ওপর ঝুঁকে এল তিনজনে।

মুসা পেল দুটো ছক্কা, একটা পাঁচ, একটা এক। আবারও আঠারো পয়েন্ট এবং তিনশো নাইট।

'আরও চারখান ছক্কা জোগাড় করতে হবে,' হেসে উঠল রবিন। 'আর পারবে বলে মনে হয় না। দেব নাকি রাজার ওপর জাদুর মায়া ছড়িয়ে?'

'তোমার দান এখনও আসেনি,' কিশোর বলল।

'চালো আবার। হতাশ হওয়ার কিছু নেই। চার ছক্কা উঠেও যেতে পারে।' কিশোর বলল। 'একজন অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা বাস করে ওই প্রাসাদে। হাজারের কম নাইট নিয়ে ওর দুর্গ তুমি দখল করতে পারবে না। নাইট কম হলে গথের হাতে মারা পড়বে তুমি।'

'মারা পড়েই গেছি,' বড়ই নিরাশ শোনাল মুসার কণ্ঠ। 'একসঙ্গে চারটে ছক্কা জীবনেও উঠবে না।'

'চারটে ছক্কা আছে যখন চারটে পাশায়, না ওঠার কোন যুক্তি নেই,' আশ্বাস দিল কিশোর। 'মারো। যা হবার হবে।'

একবার ঝাঁকি দিয়েই পাশাগুলো গড়িয়ে দিল মুসা।

ঠিক চারটে ছক্কা।

'ইয়াহু!' বলে আবার চিৎকার করে উঠল মুসা। 'দিলাম রাজার বারোটা বাজিয়ে!' লাফিয়ে উঠে দুই হাত ছুঁড়তে শুরু করল সে।

প্রচণ্ড কানফাটা শব্দে ভেঙে পড়ল কি যেন। ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল মুসা।

পরক্ষণে একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল তিনজনে।
'কিসের শব্দ?' ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রবিনের।
'কোন কিছু বিস্ফোরিত হলো বোধহয়,' কান পেতে থেকে বিড়বিড় করল কিশোর। 'গাড়িও অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে।'
রাগত কথার শব্দ শোনা গেল।
জোরাল চিৎকার।
তারপর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।
সেই সঙ্গে আবারও চিৎকার। কেউ যেন কাউকে আক্রমণ করে বসল।
পরমুহূর্তে ধাতব জিনিসের ঘষাঘষি, ঠোকাঠুকির প্রচণ্ড শব্দ।
তরোয়াল?
আরও চিৎকার। গোঙানি। আর্তনাদ।
জানালার বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল মুসা। পলকের জন্যে। চোখ সরিয়ে ফেলল পরক্ষণে। যদি কিছু ঘটেই থাকে–কি ঘটছে দেখতে চায় না।
'মনে হয় যুদ্ধ হচ্ছে বাইরে,' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল রবিন। উঁচুস্বরে বলতে সাহস পাচ্ছে না।
'আ-আমার…আমার ভাল লাগছে না এ সব,' মুসা বলল। 'খেলাটা বন্ধ করা দরকার।'
কারও কথার অপেক্ষা না করে তাসগুলো সব একখানে জড় করতে শুরু করল সে। হাত কাঁপছে। সব তাসগুলো জড় করার পর একসঙ্গে ঠেলা মেরে সব ঢুকিয়ে দিল বাক্সের ভেতর।
বন্ধ করে দিল বাক্সের মুখ।
মুহূর্তে ফিরে এল দিনের আলো।
'খাইছে!' এতক্ষণ অন্ধকারে থাকার পর তীব্র আলোয় চোখ মিটমিট করতে লাগল মুসা।
'কি ঘটছিল এতক্ষণ?' বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন। গাল চেপে ধরেছে একহাতে। 'তাসের বাক্সটা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার গেল কোথায়?'
'কাকতালীয় ব্যাপার,' চোখের সামনে যা ঘটে গেল, সেটাকে অবিশ্বাস করতে পারছে না কিশোরও আর। একটা ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে চাইছে।
পায়ের শব্দ শোনা গেল।
হল ধরে এগিয়ে আসছে। রান্নাঘরের দিকে। দ্রুত।
ঘরে এসে ঢুকল কুৎসিত চেহারার এক বামন-মানব।

ছয়

চিৎকার করে উঠল রবিন।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। দুই হাত উদ্যত। বাধা দিতে প্রস্তুত।

লাফ দিয়ে দেয়ালের দিকে সরে গেল মুসা। বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন।

গোল মস্ত মাথাটা পেছনে ঝাঁকি দিয়ে হেসে উঠল বামন-প্রাণীটা। তীক্ষ্ণ, উচ্চকিত স্বর।

কালো কোঁকড়া চুল কাঁধের কাছে নেমে গেছে তার। খাটো করে ছাঁটা কালো দাড়ি। সবুজ চোখের মণিতে বন্য দৃষ্টি। লম্বা পাইপের মত নাক। গায়ে লোম ওঠা কালো উলের ফতুয়া। পরনে কালো চামড়ার প্যান্ট। পায়ে লোম বের হয়ে থাকা চোখামাথা বাদামী চটি।

'আমি এখন মুক্ত!' আনন্দে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল প্রাণীটা। ছোট ছোট হাত দুটো মাথার ওপর তুলে নাচাতে থাকল। 'পাখির মত স্বাধীন। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। অনেক ধন্যবাদ।'

'এই, শুনুন শুনুন!' চিৎকার করে বলল কিশোর।

কিন্তু থামল না বামনটা। আনন্দে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। টান দিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুলল। হারিয়ে গেল বাইরের বৃষ্টিতে।

চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল রবিন। একহাত দিয়ে গাল চেপে ধরে আছে এখনও। কিশোর নড়ল না। এখনও হাত দুটো উদ্যত। মুঠোবদ্ধ। বাধা দিতে প্রস্তুত।

ঘন ঘন ঢোক গিলে হৃৎপিণ্ডটাকে শান্ত করতে চাইল মুসা।

অবশেষে নীরবতা ভাঙল কিশোর। আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করে বলল, 'ক্রেল। ওই জীবটা ছিল ক্রেল।'

আবার ঢোক গিলল মুসা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। কিন্তু বাইরের কোন কিছু চোখে পড়ল না।

'জীবটা দেখতে অবিকল চরিত্রতাসের গায়ে আঁকা ছবির ক্রেলটার মত,' রবিন বলল।

'তাই, না?' তাসের বাক্সটার দিকে তাকাল মুসা। 'ঠিকই বলেছ। দেখতে ওরকমই।'

বাক্সটা তুলে নিয়ে ঝাড়া দিয়ে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিল সে। পাগলের মত খুঁজতে লাগল তাসটা। 'কোথায় ওটা? কই গেল?'

তাসগুলো সব উল্টে দেখল সে। কিন্তু ক্রেল আঁকা তাসটা পেল না। বামনটা নিয়ে গেল নাকি?

'বেশি তাড়াহুড়া করে ফেলেছি,' বিশ্বাস করতে পারছে না সে। 'নিশ্চয় আছে এখানেই।'

সময় নিয়ে প্রতিটি তাস উল্টে দেখল সে। রাজা, মিউট্যান্ট বামন, তিন জেকিল, দুই গথ, মুখোশ পরা নাইট...

'কোথায়? কোথায় তুই? বেরো। বেরো বলছি,' আনমনে বলছে আর আছাড় দিয়ে দিয়ে একেকটা করে তাস ফেলছে টেবিলে মুসা।

'নেই!' অবশেষে দুই বন্ধুর দিকে মুখ তুলে ঘোষণা করল সে। 'হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ক্রেল-তাসটা।'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। হাত বাড়াল, 'আমি দেখি তো একবার।'

তাসগুলো তুলতে গিয়ে হাত ফসকে একটা তাস মাটিতে পড়ে গেল।
নিচু হয়ে সেটা তুলে নিল মুসা।
একটা ড্রাগন আঁকা তাস।
বিশাল ড্রাগন। জ্বলন্ত চোখ। মাথাটা ওপরে তোলা। গর্জনের ভঙ্গিতে হাঁ করা মুখে ভয়ঙ্কর দাঁতের সারি। নাক দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে।
তাসটা দুই আঙুলে শক্ত করে চেপে ধরল সে।
কানে এল ভারী পায়ের শব্দ। হল ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে কে যেন।

সাত

'খাইছে! ড্রাগন!' দম আটকে আসতে চাইল মুসার।
তাসটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। ভয় দেখা গেল রবিনের চোখেও। চোখ বড় বড়। মুখ হাঁ।
পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গেছে কিশোর।
'ড্রাগন আসছে!' বিড়বিড় করে বলল মুসা। দরজার দিকে তাকাল।
'মুসা? কিসের ড্রাগন?' জিজ্ঞেস করল একটা পরিচিত কণ্ঠ।
রান্নাঘরে ঢুকলেন মুসার বাবা-মা। বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে। মিসেস আমানের ভেজা চুল থেকে গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। মিস্টার আমানের নীল শার্ট ভিজে লেপ্টে গেছে গায়ের সঙ্গে।
'না, কিছু না, মা,' জবাব দিল মুসা। 'একটা খেলা খেলছি আমরা।'
হাত কাঁপছে ওর। টেবিলের কিনার শক্ত করে খামচে ধরে রাখল, যাতে কাঁপুনিটা মা'র চোখে না পড়ে।
'যাক তবু ভাল, বাড়িতেই আছিস,' মা বললেন। 'আমি তো ভাবলাম হঠাৎ বৃষ্টি নামতে দেখে বেরিয়ে গেছিস বাইরে, ভেজার জন্যে।' ঝাড়া দিয়ে পায়ের ভেজা স্যান্ডেল খুলে ফেললেন তিনি
টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার আমান। 'পাশের বাড়িতে কি হয়েছে জানিস? হই-চই শুনিসনি?'
'কি অবস্থা!' মা বললেন। 'বেচারা হ্যামলিন...'
'কি হয়েছে, মা?' জানতে চাইল মুসা।
হাত দিয়ে মাথা থেকে বৃষ্টির পানি ঝেড়ে ফেললেন মিস্টার আমান। 'ও, দেখিসনি। যা দেখে আয়গে অবস্থা। ভয়াবহ।'
'তোরা শুনিসইনি?' ভ্রূকুটি করলেন মিসেস আমান। 'অবাক করলি আমাকে।'
রান্নাঘরের পেছনের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে বাইরে বেরিয়ে এল। তার পেছনে এল কিশোর আর রবিন।
বৃষ্টি থেমে গেছে। ভারী, কালো মেঘগুলো ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে। মেঘের

ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে শেষ বিকেলের সূর্য। ছুঁড়ে দিয়েছে রোদের বর্শা।

ভেজা ঘাস মাড়িয়ে কাঠের বেড়াটার কাছে ছুটে গেল মুসা। হ্যামলিনদের বাড়িটা চোখে পড়তেই দাঁড়িয়ে গেল।

বাড়ি না বলে বলা ভাল বাড়ির অবশিষ্ট।

ধসিয়ে দেয়া হয়েছে।

সমস্ত জানালাগুলো ভাঙা। খড়খড়িগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে ভেজা মাটিতে। ধসে পড়ে গেছে একটা দেয়াল। ভাঙা ইঁটের ছড়াছড়ি। অর্ধেকটা ছাতও ধসে পড়েছে।

বাড়ির সামনে দিয়ে বেরোনোর রাস্তাটার ধারে পাতাবাহারের বেড়া। ভেঙে, মাড়িয়ে ভর্তা করে ফেলা হয়েছে। পাশের বাগানের ফুলগাছগুলো উপড়ানো। কাদার মধ্যে উল্টে পড়ে আছে ডাকবাক্সটা।

বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে নীরব দর্শকরা। সবাই হ্যামলিনের প্রতিবেশী। দুজন গম্ভীর পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন হ্যামলিন দম্পতি। দুজনেই উত্তেজিত। রাগত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছেন।

'কি হয়েছে?' একজন পড়শীকে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'ঝড়ে করল নাকি এ কাণ্ড?'

'কি জানি,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল মহিলা। 'হ্যামলিনরা বলল, ওদের ওপর নাকি হামলা চালানো হয়েছিল।'

চমকে গেল মুসা।

মিস্টার হ্যামলিনের সীমানায় ঢুকল তিন গোয়েন্দা। জানালার কাঁচ মাড়িয়ে তার দিকে এগোনোর সময় তার কণ্ঠ কানে এল ওদের।

'কোনও ধরনের সেনাবাহিনী!' যেন ঘোরের মধ্যে কথাগুলো বলছেন মিস্টার হ্যামলিন। বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছেন। 'ইউনিফর্ম পরা ছিল। মধ্যযুগীয় নাইটদের মত। ভোজবাজির মত উদয় হলো, আবার ভোজবাজির মতই গায়েব।'

নাইট! নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না তিন গোয়েন্দা।

মিসেস হ্যামলিন ফোঁপাচ্ছেন। 'কি ভয়ানক! ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসেছিল ওরা। মাথায় লোহার হেলমেট। মুখ দেখতে পাইনি ওদের। ওরা...ওরা...' কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি।

গলা জড়িয়ে ধরে স্ত্রীকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন মিস্টার হ্যামলিন।

'বাড়ি আক্রমণ করেছিল ওরা,' পুলিশকে বললেন তিনি। 'মনে হলো যেন সিনেমা। শুনলে হয়তো পাগল ভাববেন আমাকে। কিন্তু সত্যি বলছি। ঘোড়ার পিঠে চড়ে নাইটেরা এসে আমাদের বাড়ি আক্রমণ করেছিল।'

কুঁকড়ে গেল মুসা। গলা শুকিয়ে গেছে। ঢোক গিলতে পারছে না। পা দুটো হঠাৎ করেই দুর্বল লাগতে শুরু করল।

সিনেমা নয় এটা। জানে সে।

এটা ওদের খেলার ফল। ভয়ঙ্কর তাসের খেলা।

খেলার মধ্যে সে ওর সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল প্রতিবেশীর দুর্গ আক্রমণ করতে।

আর হ্যামলিনরা আক্রান্ত হয়েছে একদল ঘোড়সওয়ার হেলমেট পরা নাইটদের দ্বারা।

হঠাৎ করেই দুর্বল লাগতে লাগল মুসার। দুই হাতে মুখ ঢাকল। পেটের ভেতর পাক দিচ্ছে। সেটা থামার অপেক্ষা করতে লাগল।

কি করবে সে? নিজেকে প্রশ্ন করল। কি ব্যাখ্যা এর?

হ্যামলিনদের সঙ্গে তর্ক করছে পুলিশ অফিসারেরা। বিশ্বাস করছে না।

কিন্তু মুসা করছে। তার মনে হচ্ছে পুরো দোষটা তার। তাসের খেলা খেলে এই সর্বনাশ করেছে পড়শীদের।

পাতাবাহারের একটা ঝাড়ের দিকে নজর পড়তেই ধড়াস করে উঠল তার বুক। ঘন ছায়ার ভেতর থেকে আলোয় বেরিয়ে এল একজন লোক।

মিস্টার কাকু-কাকু!

চোখে চোখ আটকে গেল দুজনের। শীতল ভ্রূকুটিতে কঠোর হয়ে আছে কাকু-কাকুর চেহারা।

এক পা পিছিয়ে গেল মুসা। প্রয়োজন হলেই যাতে দৌড় দিয়ে বাড়ি চলে যেতে পারে।

দ্রুত এগিয়ে এল কাকু-কাকু। লম্বা লম্বা পায়ে। ভেজা ঘাস মাড়িয়ে। পেছনে বাতাসে উড়ছে তার হলুদ বর্ষাতির কানা। বিশাল ভুঁড়ি নাচছে হাঁটার তালে তালে।

'কিছু বলবে নাকি আমাকে, ইয়াং ম্যান?' স্থির, কঠিন দৃষ্টিতে মুসার দিকে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলল কাকু-কাকু। 'আমার হারানো তাসের বাক্সটা সম্পর্কে?'

তারমানে কাকু-কাকু জানে সব। তাস খেলা হয়েছে বলেই যে হ্যামলিনদের বাড়িটা ধসে পড়েছে, জানে।

আট

কাকু-কাকুর কুতকুতে গোল চোখজোড়া যেন লেজার রশ্মির মত এসে বিদ্ধ করতে লাগল মুসার চোখকে। সাদা গোঁফের নিচে ঠোঁট দুটো নড়ছে। বিড়বিড় করে বলছে কিছু। গম্ভীর ভ্রূকুটিতে গভীর ভাঁজ পড়েছে চামড়ায়।

জোরে ঢোক গিলল মুসা। সত্যি কথাটা বলতে পারছে না। ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে তাহলে। বলতে পারছে না তাসগুলো ওদের কাছে আছে।

হ্যামলিনের বাড়িটা ধ্বংসের জন্যে ওরাই দায়ী, সেটাও বলার উপায় নেই। বড় অনুশোচনা হচ্ছে।

কাকু-কাকুর পেছনে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়ছে পুলিশ অফিসারেরা। প্রতিবেশীরা জটলা করছে এখানে ওখানে। নিচু স্বরে কথা বলছে। সবাইই মোটামুটি অবাক, এটুকু বোঝা যাচ্ছে।

'না, আমার কিছু বলার নেই,' কাকু-কাকুকে বলে দিল মুসা। গলা কাঁপছে।

বুকের মধ্যে এত জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, মনে হচ্ছে গলার কাছে উঠে চলে আসবে। কাশি দিল সে। বড় করে দম নিল। 'নাহ্, কিচ্ছু বলার নেই।'

তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ভেজা পিচ্ছিল ঘাসের ওপর দিয়ে দৌড়ানো শুরু করল।

পালাতে চায়। ব্যাপারটা নিয়ে শান্ত মাথায় ভাবতে চায়। কি করা উচিত বোঝা দরকার।

রবিন কিংবা কিশোরের জন্যে অপেক্ষা করল না সে। ফিরে তাকাল না ওদের দিকে।

নিজের বাড়ির নিরাপত্তার মধ্যে পৌঁছানোর আগে থামলও না। সোজা ওপরতলায় নিজের শোবার ঘরে এসে ঢুকল। দরজা লাগিয়ে দিল।

জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে গেছে সারা দেহ। ধপ করে বসে পড়ল বিছানার কিনারে। মাথা ঘুরছে। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে।

চোখ বুজল। চোখের সামনে ভেসে উঠল তাসের বাক্সটা। ওপরে লেখা: ভয়াল তাস!

*

সে-রাতে কাকু-কাকুর স্বপ্ন দেখল সে।

সাদা পোশাক পরে আছে কাকু-কাকু। সাদা সুট, সাদা শার্ট, সাদা টাই। সব সাদা। ওর চুল আর গোঁফের মত সাদা।

হাত তুলল সে। গম্ভীর সম্মোহনী ভাষায় বলল: ভয় পাও, মুসা! ভীষণ ভয়!

তারপর ঘুরে দাঁড়াল দরজার দিকে। ট্র্যাফিক পুলিশের মত হাত তুলে সঙ্কেত দিতে লাগল।

স্বপ্নের মধ্যেই ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসল মুসা। নিজের বিস্মিত চেহারা নিজেই দেখতে পেল। স্বপ্নে সবই সম্ভব।

দরজার বাইরে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। নানা রকম শব্দ। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ, চিৎকার, জোরাল গোঙানি।

জোরে জোরে হাত নাড়তে শুরু করল কাকু-কাকু। মাথাটাকে পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে মুখ ওপরে তুলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। ঝাঁকি খেতে থাকল তার কাঁধ ছোঁয়া চুল।

গটমট করে ঘরে ঢুকল ঝকঝকে ধাতব বর্ম পরা একজন নাইট। ঢোকার সময় তার চওড়া কাঁধ ঢাকা বর্ম বাড়ি খেল দরজার সঙ্গে।

'খাইছে!...এই, যান, যান!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

স্বপ্নের মধ্যেও বুঝতে পারছে সে, স্বপ্ন দেখছে। গলা চিপে ধরেছে যেন ভয়। বর্ম পরা নাইটের পেছন পেছন আরও কতগুলো প্রাণীকে ঢুকতে দেখে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল সে।

গথ আর ত্রেল। লম্বা নাকওয়ালা বামন প্রাণী। মুখোশ পরা নাইট। শুয়োরমাথা মানবদেহী প্রাণী।

অদ্ভুত ভঙ্গিতে পেছনে মাথা ঝাঁকি দিতে দিতে চেঁচাতে শুরু করল প্রাণীগুলো। কোনটা লম্বা ডাক ছাড়ছে, কোনটা গোঙাচ্ছে, কোনটা বা গর্জন করছে

জানোয়ারের মত।

এত চিৎকার! এত শব্দ! এত হট্টগোল! কান চেপে ধরল মুসা।

কিন্তু কানে শব্দ ঢোকা কোনমতে আটকাতে পারল না। তার ওপর মারামারি বাধিয়ে দিল প্রাণীগুলো। চেঁচামেচি আর হট্টগোল বেড়ে গেল আরও বহুগুণ।

বড় বড় ছুরি আর তরোয়াল তুলে একে অন্যকে লক্ষ্য করে কোপ মারতে শুরু করল ওরা। ধস্তাধস্তি করছে। বর্মধারীরা বুকের সঙ্গে বুক ঠেকিয়ে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করছে একে অন্যকে। তরোয়ালের আঘাত ঠেকাতে বর্ম বাড়িয়ে ধরছে সামনে।

ধস্তাধস্তি করতে করতে বিছানার ওপর এসে পড়ছে ওরা। তরোয়ালের আঘাতে পর্দা কেটে যাচ্ছে। ডেস্কে রাখা জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে ফেলছে মেঝেতে।

যুদ্ধরত একজন ক্রেল ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে জানালার কাঁচের ওপর ফেলল একজন মুখোশধারী নাইটকে। ঝনঝন করে হাজারও টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচ। দেয়ালের কাগজ চিরে দিল তরোয়ালের আঘাত।

'বেরোন! বেরোন! বেরোন!' গানের সুরে চিৎকার করে উঠল মুসা।

বেরোল না ওরা।

'বেরোন! বেরোন! বেরোন!' আবার চিৎকার করে উঠল সে। চিৎকার করতে করতে জেগে গেল। থরথর করে কাঁপছে। সারা শরীর ঘামে ভেজা। শার্টের পেছনটা ভিজে পিঠের সঙ্গে আটকে গেছে।

বিছানায় বসে রইল সে। পুরো সজাগ। জানালার পর্দা ভেদ করে ঘরে আসছে সকালের কমলা রোদ।

জানালার কাঁচ! না, ভাঙেনি তো! ভাঙেনি!

ওয়ালপেপারও কাটেনি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পা রাখল বিছানার বাইরে। উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু মেঝের দিকে চোখ পড়তেই খাড়া থাকতে পারল না আর। ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। সমস্ত কার্পেটে কাদা। কাদামাখা অসংখ্য পায়ের ছাপ। ছোট, বড়, নানা রকম।

নিজের অজান্তেই একটা অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

'নিশ্চয় তাসের কাণ্ড!' বিড়বিড় করল সে। দুই হাতে শক্ত করে নিজের বুক জড়িয়ে ধরল। কাঁপুনি বন্ধ করার চেষ্টা করল।

'সর্বনেশে তাসের খেলা! আর কিচ্ছু না!'

ওই তাসগুলোর কবল থেকে মুক্তি দরকার। যতক্ষণ ঘরে আছে ওগুলো, এই অত্যাচার চলতেই থাকবে। বাঁচতে চাইলে কাকু-কাকুকে তার জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে আসা দরকার।

নিজেকে টেনে তুলল আবার। খাড়া হলো।

ঠিক করল, এখনই ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ নয়। তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে নিয়ে দিয়ে আসবে গিয়ে এখনই।

মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে। সামনের সিঁড়ির ওপর রেখে এলেও হয়।

হ্যাঁ। তা-ই করবে।

তার সঙ্গে কথা বলার কোন দরকার নেই। চুরি করা যে কত বড় অপরাধ, সেই উপদেশ শোনারও প্রয়োজন নেই।

ওসব তার জানা। অন্যের কাছ থেকে সদুপদেশ নেয়া লাগবে না। তা ছাড়া সে নিজে চুরি করেনি। তাস খেলতে গিয়ে অন্যের বাড়িঘর ধ্বংসটাও ইচ্ছে করে করেনি। কি করে জানবে, তাস খেলা বাস্তব হয়ে ওঠে! নিজের চোখে না দেখলে পাগলেও বিশ্বাস করবে না। সে নিজেও করত না। অন্যায় একটাই করেছে, মিথ্যে কথা বলে। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাসগুলো দিয়ে দেয়া উচিত ছিল কাকু-কাকুকে। দিয়ে দিতও। কাকু-কাকুর ভয়েই দিতে পারেনি। দিতে গেলে ঠিকই চোর বলত।

একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরে অনেকটা শান্ত হয়ে এল সে। ভাল লাগছে এখন। কাকু-কাকুর মুখোমুখি না হয়ে কি ভাবে ফেরত দেবে, সেটাও ঠিক করে ফেলল।

জিনসের প্যান্ট আর একটা টি-শার্ট পরে নিল। জুতোর ফিতে বাঁধতে গিয়ে দেখে হাত কাঁপছে। কই? শান্ত হলো কোথায়?

বড় করে দম নিল।

মুসা, সব ঠিক হয়ে যাবে, নিজেকে বোঝাল সে। তাসগুলো শুধু ফিরিয়ে দিয়ে এসো। আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

কিন্তু তাসগুলো রাখল কোথায়?

ড্রেসারের ওপর।

ড্রেসারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু তাসগুলো নেই সেখানে।

নয়

ড্রেসারের ওপর জিনিসপত্রের অভাব নেই। এলোমেলো। এক মহা বিশৃঙ্খল অবস্থা। তার মধ্যেই খুঁজতে শুরু করল সে। পেল না।

হাঁটু গেড়ে বসে ড্রেসারের নিচে খুঁজল। সেখানেও নেই তাসগুলো।

নিচতলা থেকে কথার শব্দ আসছে। রবিনের হাসি চিনতে পারল। চেয়ার টানার শব্দ হলো। সকাল সকালই চলে এসেছে। নিশ্চয় তাসের নেশায়।

এতক্ষণে মনে পড়ল, তাসগুলো নিচেই ফেলে এসেছে। নিচতলায়। রান্নাঘরের টেবিলের ওপর।

মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত এগোল সিঁড়ির দিকে।

রান্নাঘরে ঢুকে দেখল টেবিলে বসে আছে কিশোর আর রবিন। তাসগুলোকে আগের মত চার ভাগে ভাগ করেছে আবার কিশোর।

ঠিকই অনুমান করেছিল মুসা। তাসের নেশাতেই অত সকালে হাজির হয়ে গেছে কিশোর আর রবিন।

কিন্তু মা-বাবা কোথায়? ঘুম থেকেই ওঠেনি এখনও? নাকি বাইরে বেরিয়ে

গেছে? বাইরেই গেছে হয়তো। যাবার কথা আছে।

'তোমার জন্যেই বসে আছি আমরা,' রবিন বলল। 'তোমার ঘুম ভাঙাতে চাইনি।'

'মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'আঙ্কেল-আন্টি দুজনেই বাইরে গেছেন। কি নাকি জরুরী কাজ আছে।'

'তুমি জলদি জলদি নাস্তা খেয়ে নাও,' কিশোর বলল। তাস নিয়ে শাফল করতে শুরু করল সে।

'আবার খেলা!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'বাক্সে ঢোকাও। কাকু-কাকুকে ফেরত দিয়ে আসব। এখনই।'

'এখনই?' ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। 'খেলাটা শেষ না করেই? মাত্র তো অর্ধেক খেললাম।'

'মাত্র একটা দুর্গকে ধ্বংস করেছ,' রবিন বলল। 'জিততে আরম্ভ করেছ। কিন্তু আমাদেরকে, অর্থাৎ গথ আর ক্রেলদের তোমাকে ধরার একটা সুযোগ দেয়া উচিত।'

'পারব না!' মুসা বলল। 'তোমাদের হলোটা কি? খেলাটা ভয়ানক বিপজ্জনক। আমাদের পাশের বাড়িটার অবস্থা দেখনি? কাকু-কাকু তো সাবধানই করে দিয়ে গেছে আমাদের। বলেছে...'

'সেটাই তো দেখতে চাইছি,' কিশোর বলল, 'সত্যি কথা বলেছে কিনা। ওর রূপকথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না আমার। করতে হলে আরও প্রমাণ চাই। ছোটদের ঘৃণা করে সে। ভাল করেই জানো।'

'আমাদের ভয় দেখানোর জন্যেও বানিয়ে বলতে পারে,' রবিন বলল। 'তুমি তার কথা বিশ্বাস করে ভয় পেয়েছ, মুসা। তাসের চরিত্র কখনও বাস্তব হতে পারে না। তোমাকে বোকা বানিয়েছে।'

'কিন্তু...কিন্তু...' কথা খুঁজে পাচ্ছে না মুসা। 'হ্যামলিনদের বাড়িটা?'

'তুফানে ধসে পড়েছে,' রবিন বলল। 'ঝড়ে এরচেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয় ঘরবাড়ির।'

'কিন্তু বিদ্যুৎ আঁকা তাসটা আমি তুলে নেয়ার আগে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়নি!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মুসার কণ্ঠ।

কিশোর আর রবিন দুজনেই হেসে উঠল।

'তারমানে ওসব ভুয়া কথা সত্যি বিশ্বাস করে বসে আছ তুমি?' কিশোর বলল।

'বোসো,' রবিন বলল। 'অকারণে সময় নষ্ট করছ। এসো, শেষ করে ফেলি খেলাটা।'

দুজনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। খেলাটা চালিয়ে যাবে, মনস্থির করে ফেলেছে ওরা। কিশোর যখন একবার ঠিক করেছে খেলবে, খেলবেই। কোন কথা বলেই থামানো যাবে না ওকে।

'বেশ।' বিড়বিড় করে আরও কি বলল মুসা, বোঝা গেল না।

রেফ্রিজারেটর থেকে কমলার রসের বোতল বের করে গ্লাসে ঢেলে নিল সে। ফিরে তাকাল কিশোর আর রবিনের দিকে। 'এক গেম খেলব আমি। মাত্র একটা গেম। ব্যস। তারপর কিছু ঘটুক বা না ঘটুক, তাসগুলো আমি ফেরত দিয়ে আসব কাকু-কাকুকে।'

তাস শাফল করে টেবিলে উপুড় করে রাখল কিশোর।

একটা তাস টেনে নিতে হাত বাড়াল রবিন। তিনজনেই সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে কি ওঠে দেখার জন্যে।

ঘাড়ের পেছনে শিরশির করছে মুসার।

তাস ওল্টানোটা কি ঠিক হচ্ছে? ভুল করছে না তো আবার?

তাস টেনে নিল রবিন।

উল্টে ফেলল।

চিৎকার করে উঠল মুসা।

দশ

রবিনের হাতের তাসটায় ড্রাগন আঁকা।

মাথা তুলে রেখেছে ড্রাগনটা। গাঢ় রূপালী রঙ। লম্বা ঘাড়টা বাঁকা করে রেখেছে আক্রমণের ভঙ্গিতে। পিঠের মেরুদণ্ড বরাবর বড় বড় মারাত্মক কাঁটা খাড়া হয়ে আছে। প্রচণ্ড রাগে চোখ দুটো জ্বলছে। বুকের আঁশগুলোকে মনে হচ্ছে ধাতব বর্মের মত। বুঝিয়ে দিচ্ছে যেন কোন বাধাই বাধা নয় ওটার কাছে। আধ ছড়ানো অবস্থায় রয়েছে কাঁধের কাছের ডানা দুটো।

লম্বা কুমিরের মত মুখটা হাঁ করে আছে গর্জনের ভঙ্গিতে। মুখের ভেতরে অসংখ্য ধারাল দাঁতের সারি। নাকের ফুটো দুটো ছড়ানো। কমলা রঙের আগুন বেরোচ্ছে নিঃশ্বাসের সঙ্গে।

হাঁ করে তাসটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিনজনে।

'রবিন, একটা ভাগ্যতাস তুলে নাও।' আরেক গাদা তাস রবিনের দিকে ঠেলে দিল কিশোর।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রবিন। তারপর ভাগ্যতাসের স্তূপ থেকে সবচেয়ে ওপরের তাসটা তুলে নিয়ে ওল্টাল। দুটো কালো রঙের তীর এমন করে বাঁকা করে আঁকা হয়েছে, ফলার মাথা দুটো পরস্পরের দিকে মুখ করে আছে।

'এর মানে কি?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এটা হলো নিয়ন্ত্রক তাস,' কিশোর বলল। 'এর সাহায্যে চরিত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তুমি। তুমি আর এখন গথ নও। ড্রাগনটাকে চালু করো।'

'হ্যাঁ, করছি।'

চোখ বুজল মুসা। স্বপ্নের দৃশ্যগুলো ভেসে উঠল আবার মনের পর্দায়। শোবার ঘরে চিৎকার-চেঁচামেচি আর গর্জন করতে থাকা, কুৎসিত ভয়ঙ্কর

জানোয়ারগুলোর চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেল।

নাহ্, খেলাটা চালিয়ে যেতে ভাল লাগছে না তার।

চোখ মেলে দেখল, পাশাগুলো রবিনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কিশোর। 'শক্তি সঞ্চয় করো। দেখাও তোমার ড্রাগনটা কত শক্তিশালী!' নাক দিয়ে খোঁতখোঁত শব্দ করল সে। 'দুই-এক পয়েন্ট পেয়ে বোসো না আবার।'

পাশা চালল রবিন। চারটেই গড়িয়ে দিল একসঙ্গে। দুটো ছক্কা, একটা পাঁচ, একটা চার।

'দারুণ! চমৎকার!' চিৎকার করে টেবিলে কিল মারল কিশোর। 'সাংঘাতিক শক্তিশালী করে তুলেছ ড্রাগনটাকে!'

ড্রাগনের শক্তিশালী হবার কথা শুনে পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরল মুসার।

'এখনও আমি রাজা, তাই না?' মিনমিন করে জিজ্ঞেস করল সে। 'নাইটেরা এখনও আমার দখলে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'বেশ,' মুসা বলল। 'আমি তাহলে আমার সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছি ড্রাগনটাকে ধ্বংস করার জন্যে।'

পাশাগুলোর জন্যে হাত বাড়াল সে।

হাতটা সরিয়ে দিল কিশোর। 'এখন আমার পালা।' রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ড্রাগনের সঙ্গে হাত মেলানোর সময় হয়েছে ক্রেলের।'

'মানে?' বুঝতে পারল না মুসা।

'ক্রেলেরা ভীষণ চালাক,' কিশোর বলল। 'খুব সাবধানী। কখন কোন পক্ষ নিয়ে খেলতে হবে, ভাল করেই জানে।'

'কিন্তু এর মানেটা কি?'

'এত সহজ কথাটা বুঝলে না? আমি আমার শক্তি ড্রাগনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলব।'

'সাংঘাতিক হবে তাহলে!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'আমাদের মিলিত শক্তির কাছে পরাজিত হতে বাধ্য হবে দুষ্ট রাজা, সে যত শক্তিশালীই হোক।'

'কাজটা কি ঠিক হলো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না হওয়ার কি হলো? খেলা খেলাই।'

তাসের গাদা থেকে সবচেয়ে ওপরের তাসটা টেনে নিল সে। ওল্টাল। দাড়িওলা একটা এলফের ছবি। বাদামী অ্যাপ্রন পরে আছে কল্পিত বামন-মানবের মত প্রাণীটা। হাতে মাছ ধরার জাল।

'একজন এলফ জেলে,' বলে পাশাগুলোকে গড়িয়ে দিল কিশোর। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভীষণ বিপদে পড়তে যাচ্ছ তুমি, রাজা। সেনাবাহিনী হিসেবে লড়াই করার জন্যে দুই হাজার এলফ জেলেকে তার পক্ষে পেয়ে গেছে ক্রেল। নিঃশব্দে তোমার নাইটদের কাছে গিয়ে মাথার ওপর জাল ফেলবে এলফরা। ওদের পরাস্ত করে তোমার ওপর হামলা চালাবে। বাঁচাটা কঠিন হয়ে গেছে তোমার জন্যে।'

'এত্ত সহজ না!' আবার খেলায় ফিরে আসতে শুরু করেছে মুসা।

'এতই সহজ,' জবাব দিল কিশোর।

'তারমানে আমাকে আটকে ফেলা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, তুমি এখন ক্রেলের হাতে বন্দি,' ঘোষণা করল কিশোর। পাশাগুলো রবিনের দিকে ঠেলে দিল। 'রাজা এখন বন্দি। ড্রাগন আসছে তাকে খতম করার জন্যে।'

'না না, দাঁড়াও! দাঁড়াও!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

কিন্তু ততক্ষণে পাশা গড়িয়ে দিয়েছে রবিন।

রাস্তার দিক থেকে গর্জন শোনা গেল।

খানিক পরেই মহিলাকণ্ঠের চিৎকার।

গাড়ির চাকার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। পরক্ষণে সংঘর্ষের শব্দ।

আবার শোনা গেল খেপে ওঠা জান্তব গর্জন। আগের চেয়ে জোরে। আরও কাছে থেকে।

কিশোর আর রবিনের চেহারায় বিস্ময়।

মনেপ্রাণে দোয়া চাইতে শুরু করল মুসা, ড্রাগনটা যাতে জ্যান্ত হয়ে উঠতে না পারে।

এগারো

লাফ দিয়ে উঠে জানালার দিকে দৌড় দিল মুসা।

হই-হট্টগোল শুরু হয়েছে।

আরেকটা গাড়ি থামার শব্দ হলো। ব্রেক কষার ফলে কর্কশ আর্তনাদ করে উঠল চাকা।

শব্দ শুনছে, কিন্তু বাড়ির পেছনটা চোখে পড়ছে না বলে কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

ঘুরে সামনের দরজার দিকে দৌড় দিল মুসা। পেছনে ছুটল কিশোর আর রবিন।

ঠেলা দিয়ে পাল্লাটা খুলে ফেলল মুসা। ভয়ঙ্কর আরেকটা গর্জন শুনতে পেল।

এ রকম শব্দ জীবনে শোনেনি সে।

বাঘ-সিংহের ভারী গলার কর্কশ গর্জন নয়। এমনকি হাতির কানফাটা চিৎকারও নয়।

শব্দটা কেমন বোঝানো খুব কঠিন। এ শব্দটা শুরু হচ্ছে মেঘের চাপা গুড়গুড় ডাকের মত। পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার সময় দ্রুত বেড়ে যায়। মাটি কাঁপতে থাকে। বাড়তেই থাকে, বাড়তেই থাকে। ভারী এই গমগমে গর্জনের সঙ্গে মিলিত হয় শিসের মত তীক্ষ্ণ একটানা শব্দ।

মড়মড় শব্দ শোনা গেল। একটা গাছ ভেঙে পড়ল।

মানুষের চিৎকার-চেঁচামেচি বাড়ছে।

মুসাদের সামনের লনে নেমে এল তিন গোয়েন্দা। দৌড় দিল রাস্তার দিকে। মোড়ের কাছে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল। রাস্তার ওপর মস্ত এক ছায়া পড়েছে।

ড্রাগনটাকে দেখতে পেল মুসা। ছায়ার ওপর সরে আসছে।

টাওয়ারের মত উঁচু। কাঁটা বসানো। বদমেজাজী। অবিকল তাসের গায়ে আঁকা ছবিটার মত।

'আমি···আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

কাঁটা বসানো মেরুদণ্ডটার দু'পাশে দুটো রূপালী ডানা। ছড়িয়ে রেখেছে জাহাজের পালের মত। হাঁটার সময় ওই ডানা লেগে ছিঁড়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের তার। ঝরঝর, ছরছর করে স্ফুলিঙ্গ ছিটাচ্ছে বিদ্যুৎ।

বিশাল মাথাটা কাত করে আবার প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল দানবটা। থপ্ থপ্ শব্দ তুলে ঝোলা ভারী দেহটা নিয়ে দুলে দুলে সামনে এগোচ্ছে। ধাক্কা লেগে মাটিতে ভেঙে পড়ছে বিদ্যুতের খুঁটি।

মস্ত একটা পা উঁচু করল ড্রাগনটা। একটা গাড়ির ওপর ফেলল। দিয়াশলাইয়ের বাক্সের মত চ্যাপ্টা হয়ে গেল গাড়িটা।

লোকে চিৎকার করতে করতে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। বাচ্চারা কাঁদছে। চেঁচাচ্ছে। নিয়ন্ত্রণ হারাল একটা গাড়ি। চাকার আর্তনাদ আর ইঞ্জিনের গর্জন তুলে এলোপাতাড়ি ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল একটা বাড়ির লনে।

মুসার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ড্রাগনটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সিনেমা হলে গডজিলার ছবি দেখছে যেন। বিড়বিড় করে বলল, 'ড্রাগন···একটা সত্যিকারের ড্রাগন!'

'আমরা ওটাকে এখানে নিয়ে এসেছি,' কিশোরের হাত খামচে ধরল মুসা। 'ওটাকে সরানোও আমাদেরই দায়িত্ব। কিছু একটা করা দরকার। জলদি।'

ঘুরে তাকাল রবিন। চোখেমুখে আতঙ্ক। 'করা তো দরকার। কিন্তু কি?'

'ইয়ে···'

মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠল কিশোর, 'এক কাজ করা যায়।'

আবার গর্জন করে উঠে আরেকটা গাড়ি পায়ের নিচে ফেলে ভর্তা করল ড্রাগন।

'জলদি···' তাগাদা দিল কিশোর। 'বাড়ির ভেতরে চলো।' লন ধরে দৌড়ানো শুরু করল সে।

শেষবারের মত ড্রাগনটার দিকে তাকাল আরেকবার মুসা। নাক দিয়ে আগুন বের করছে তখন ওটা। তারপর দৌড় দিল কিশোর আর রবিনের পেছন পেছন। দৌড়াতে দৌড়াতেই জিজ্ঞেস করল, 'তোমার উদ্দেশ্যটা কি?'

রান্নাঘরে ঢোকার আগে আর জবাব দিল না কিশোর। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তাস! ড্রাগন আঁকা তাসটা দরকার। ওটাকে বাক্সে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই হয়তো ড্রাগনটাও চলে যাবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ!' একমত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ঠিকই বলেছ। কাল রাতের কথা মনে আছে? তাসটা বাক্সে রাখতেই ঝড়-বৃষ্টি সব থেমে গেল।'

'জানি না কি ঘটবে,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'তবে কাজ

হলেও হতে পারে।’

বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল কি যেন। চমকে গেল তিনজনেই। আরেকটা গাছ পড়ল নাকি? এত কাছে! যেন ওদের জানালাটার বাইরেই।

‘কোথায় ওটা?’ চিৎকার করে উঠল মুসা। ‘ড্রাগনের তাসটা কোনখানে?’

‘চিত করে রেখেছিলাম আমি ওটা,’ রবিন বলল। ‘মনে পড়ে? আমার সামনে টেবিলের ওপর রেখেছি।’

খুঁজে না পেয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। ‘এখানে নেই ওটা!’

হাল ছাড়ল না মুসা। তাসগুলোর মধ্যে খুঁজতে শুরু করল। বুঝল, কিশোর ঠিকই বলেছে।

ড্রাগনের তাসটা উধাও।

‘তারমানে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, যাকেই ডেকে আনা হচ্ছে, ফিরে যাবার সময় মুক্ত হয়ে যাচ্ছে ওটা। তাতেই সম্ভবত উধাও হয়ে যাচ্ছে তাসগুলো,’ কিশোর বলল।

‘এখন? এবার কি করা?’ গুঙিয়ে উঠল রবিন।

বাইরের হট্টগোল বেড়েই চলেছে। সাইরেনের শব্দ ওঠা-নামা করছে। মড়মড় করে কাঠ ভেঙে পড়ার শব্দ হলো।

মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ বয়ে গেল কিশোরের। টেবিলে পড়ে থাকা একটা তাসের দিকে তাকিয়ে থেকে আরেকটা বুদ্ধি এল মাথায়।

‘মুখোশ পরা নাইট!’ চেঁচিয়ে উঠল সে।

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মুসা আর রবিন।

‘নাইট দিয়ে কি হবে?’ জিজ্ঞেস করল মুসা।

খাবলা দিয়ে টেবিল থেকে পাশাগুলো তুলে এনে মুসার দিকে বাড়িয়ে ধরল কিশোর, ‘নাও, চালো। নাইটদের এক বিশাল বাহিনী দরকার আমাদের। রূপকথার গল্পে এ ধরনের সৈন্যরাই লড়াই করে ড্রাগন তাড়াত।’

‘কিন্তু…’ পাশাগুলোর দিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে বলতে গেল মুসা।

ওকে কথা শেষ করতে দিল না কিশোর। ‘চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? যত বেশি সম্ভব পয়েন্ট জোগাড় করতে হবে এখন আমাদের। প্রচুর শক্তি দরকার।’

সাহস জোগানোর জন্যে মুসার পিঠে চাপড় মারল কিশোর। ‘গুড লাক, মুসা। চালো। সবগুলোতেই ছক্কা তোলো। জলদি!’

বাইরে আবার গর্জন। বিদ্যুতের চড়চড়ানি। রাস্তায় আতঙ্কিত মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি।

পাশাগুলো হাতের তালুতে নিয়ে চেপে ধরল মুসা। হাতের তালু খুলে ঝাঁকাল। চোখ বুজল। প্রার্থনা করতে লাগল চারটে ছক্কার জন্যে।

হাতটা নামাল টেবিলের ওপর। আস্তে করে গড়িয়ে দিল পাশাগুলো।

বারো

'দূর!' গুঙিয়ে উঠল মুসা।

তিনটে এক আর একটা দুই।

'আবার চালো! আবার চালো!' তাগাদা দিল কিশোর। 'চেষ্টা করে যাও, মুসা। তিনটে চাল আছে হাতে।'

পাশাগুলোর জন্যে হাত বাড়াল মুসা। বাইরে একটা শব্দ থামিয়ে দিল ওকে। টেবিলের কাছ থেকে সরে এসে দৌড় দিল সামনের জানালার দিকে।

'খাইছে!' বিড়বিড় করে বলল সে। সামনের রাস্তায় মুখোশ পরা পাঁচজন নাইট চোখে পড়ল। একসঙ্গে হাঁটছে। মার্চ করে। ধীরে ধীরে। এক হাতে ধরা বর্মগুলো সামনে বাড়ানো। অন্য হাতের তরোয়াল খাড়া করে ধরে রেখেছে ওপর দিকে।

রোদে চকচক করছে পরনের ধাতব বর্ম। ড্রাগনের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। গভীর ধূসর ছায়াতে মিশে গেল ওদের বর্ম পরা দেহ।

'এ ক'জনকে দিয়ে আর কি হবে,' পাশ থেকে বিড়বিড় করল কিশোর। 'চারটেতেই যদি ছক্কা উঠত, তাহলেও নাহয় একটা কথা ছিল...'

কথা শেষ হলো না তার।

তিনজনেই দম আটকে ফেলল। একসঙ্গে দু'জন নাইটকে কামড়ে ধরে তুলে নিয়েছে ড্রাগনটা। মাথাটাকে ঝাড়া দিয়ে ছুঁড়ে দিল একপাশে। একটা বাড়ির ছাতের ওপর দিয়ে উড়ে গেল দেহ দুটো।

আবার মুখ নামাল ক্ষিপ্ত জানোয়ারটা। রাগে গর্জন করে মুখ দিয়ে তিনবার আগুন নিক্ষেপ করল বাকি তিনজন নাইটকে লক্ষ্য করে।

আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে তরোয়াল, বর্ম সব ফেলে দিয়ে দৌড় মারল নাইটেরা। নিজেদের গায়ের বর্মের ঝনঝনানিতে ঢাকা পড়ে গেল ওদের চিৎকার।

'ড্রাগনটাই জিতছে,' বিড়বিড় করে বলল রবিন।

আতঙ্কে জমে গিয়ে দেখল ওরা, ড্রাগনটা এগিয়ে আসছে মুসাদের বাড়ির দিকে। মাথাটা বার বার ঝাঁকি দিয়ে পেছনে টেনে নিচ্ছে আক্রমণের ভঙ্গিতে।

ঢুকে পড়ল ওটা সামনের লনে। বিশাল ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল বাড়িটা।

'সর্বনাশ! এদিকেই তো আসছে!' ভয়ে দম আটকে আসছে মুসার। 'আমাদেরকে ধরতে আসছে!'

তেরো

আকাশে ভাসমান মেঘ যেমন সচল ভাবে ছায়া ফেলে ঢেকে দেয়, তেমনি ভাবে মুসাদের বাড়িটাকে ঢেকে দিয়েছে ড্রাগনের ছায়া। হঠাৎ শীত করতে লাগল ওদের। যেন সূর্যের সমস্ত উত্তাপ শুষে নিয়েছে ড্রাগনের ছায়া।

ঘুরে দাঁড়াল মুসা। জোর করে সরে এল জানালার কাছ থেকে।

কাঁপতে কাঁপতে দৌড় দিল রান্নাঘরের দিকে।

সামনের আঙিনায় ড্রাগনের সরীসৃপ সুলভ হিঁচড়ে আসার শব্দ হচ্ছে। প্রতিবার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠছে বাড়িটা।

একটা গাছ ভাঙার মড়মড় শব্দ কানে এল। ধড়াস করে আছড়ে পড়ল গাছটা। তার ছিঁড়ে চড়চড় শব্দ করতে লাগল বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ।

'বাড়ির পাশ ঘুরে আসছে,' চিৎকার করে জানাল রবিন।

শীতল অন্ধকার ছায়া এগিয়ে এসে ঢেকে দিচ্ছে এখন পেছনের আঙিনা। তারপর ছায়াটা পড়ল রান্নাঘরের জানালায়।

চোখ তুলে জানালার দিকে তাকাল মুসা। ড্রাগনের মস্ত, রিঙের মত করে পরানো আঁশওয়ালা, বর্মপরা চেহারার বুকটা দেখতে পেল। বাড়ির পেছনে ধাক্কা খেল ওটার শরীর। থরথর করে কেঁপে উঠল পুরো বাড়িটা। রান্নাঘরের প্লাস্টার ভেঙে খসে গিয়ে ঝুরঝুর করে পড়তে লাগল।

জানালার কাছে মুখ নামাল ওটা। কানফাটা শব্দ তুলে বন্ধ করল হাঁ করা চোয়াল দুটো। বাস্কেটবলের সমান বড় লাল টকটকে চোখ মেলে উঁকি দিল ঘরের ভেতরে।

চিৎকার দিয়ে জানালার কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে শুরু করল রবিন। কিশোরের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। থামল না। কিশোরের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে লাগল ঘরের অন্য প্রান্তের দিকে।

জানালার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। অন্য কোন দিকে নজর নেই। ঘনঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। আচমকা ছোট্ট একটা চিৎকার দিয়ে ঘুরে দৌড় মারল টেবিলের দিকে। একটা মরিয়া ভাবনা মাথাচাড়া দিয়েছে মনে।

টেবিলটার ওপর প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ল সে। দু'হাতে দু'দিক থেকে ঝাড়ু দিয়ে এনে জড় করতে শুরু করল টেবিলে পড়ে থাকা তাসগুলো। থরথর করে কাঁপছে।

সবগুলো তাস একহাতে নিয়ে অন্য হাতে তুলে নিল বাক্সটা।

তাসগুলোকে বাক্সে ঢোকানোর চিন্তা ছাড়া আর কিছু ভাবছে না আপাতত।

ঢোকাতে পারলে হয়তো চলে যাবে ড্রাগনটা।

গত রাতের মত।

গতরাতে, মনে আছে তার, তাসগুলোকে সব একসঙ্গে করে বাক্সে ঢোকাতেই

থেমে গিয়েছিল ঝড়বৃষ্টি। আলো ফিরে এসেছিল।

ঝনঝন করে উঠল জানালা। ড্রাগনটার নাকের ছোঁয়া লেগেছে ওখানে। ফিরে তাকাল কিশোর। লাল চোখ দুটো ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। নাকের ফুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল দানবটার।

মাথাটাকে পেছনে টেনে নিল ড্রাগন। লম্বা গলাটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল।

আঘাত হানতে যাচ্ছে। মাথা দিয়ে বাড়ি মারবে। প্রচণ্ড আঘাতে গুঁড়িয়ে দেবে ঘরের দেয়াল। তারপর ওদেরকে কামড়ে ধরে টেনে বের করবে।

সময় নেই। একেবারেই সময় নেই।

বাক্সের মধ্যে তাসগুলো ঢোকানো শুরু করল সে।

তাড়াহুড়োয় হাত থেকে পড়ে গেল বাক্সটা।

আপনাআপনি চাপা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

ঝপ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। কাঁপা হাতে থাবা দিয়ে তুলে নিল আবার বাক্সটা।

তাসগুলো অর্ধেক ঢুকিয়েছিল। ঠেলা দিয়ে বাকিটাও ঢুকিয়ে দিতে লাগল।

ঠেলা! ঠেলা! ঢুকে যাচ্ছে তাসগুলো।

ঢোকা শেষ।

বাক্সের মুখ বন্ধ করে দিল সে।

কাজ হবে তো?

চোদ্দ

ফট করে জোরাল একটা শব্দ হলো। অনেক বড় একটা বেলুন ফেটে যাওয়ার মত।

তীব্র সাদা আলোর ঝলকানিতে একই সঙ্গে শোনা গেল তিনজনের বিস্মিত চিৎকার।

চোখ মিটমিট করে জানালার দিকে দৃষ্টি ফেরাল কিশোর। সকালের ঝলমলে রোদ বন্যার মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঘরে।

বাইরে এখন স্তব্ধ নীরবতা।

জানালার কাছে ছুটে গেল ওরা। বাইরে উঁকি দিল।

ইয়া বড় বড় পায়ের ছাপ পড়ে আছে মাটিতে। গভীর হয়ে দাগ বসে গেছে।

ড্রাগন নেই। কোথাও দেখা গেল না ওটাকে। উধাও হয়ে গেছে।

আনন্দে কথা বেরোল না মুসার মুখ থেকে। নীরবে পিঠ চাপড়ে দিতে লাগল কিশোরের।

হাসতে শুরু করল রবিন। হাসিটা সংক্রামিত হলো মুসার মাঝে। কিশোরও নীরব রইল না আর। পাগলের মত হাসতে লাগল তিনজনে। পিঠ চাপড়ে দিতে

লাগল পরস্পরের। শেষে কোলাকুলি শুরু করল।

ড্রাগনটা চলে যাওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

কিন্তু টেবিলের ওপর রাখা তাসগুলোর দিকে চোখ পড়তেই হাসি বন্ধ হয়ে গেল মুসার। 'ওগুলো দিয়ে আসতে হবে কাকু-কাকুকে। এখনই।'

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন। এমন করে তাকাতে লাগল তাসগুলোর দিকে, যেন যে কোন মুহূর্তে বোমার মত ফেটে যাবে ওগুলো। 'কাকু-কাকু আগেই সাবধান করে দিয়েছিল আমাদের, তাসগুলো বিপজ্জনক। আমরাই কানে তুলিনি।'

মাথার ঘন কোঁকড়া চুলে আঙুল চালাল কিশোর। 'কাকু-কাকু যদি জানবেই তাসগুলো এতটা বিপজ্জনক, তাহলে বিক্রির জন্যে সাজাল কেন?'

'ওগুলোর হাত থেকে মুক্তি চেয়েছিল হয়তো,' জবাব দিল রবিন।

'মিসেস রেডরোজই বা চুরি করল কেন?'

'অতিরিক্ত দাম হাঁকত কাকু-কাকু। বিনে পয়সায় জোগাড় করা গেলে দাম দিতে যাবে কেন?'

'তাহলে মুসার পকেটে ভরে পাচার করল কেন?'

'ধরা পড়লে মুসা পড়ত। চোর হিসেবে তার শাস্তি হত। এটা তো সোজা কথা।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'উঁহু, অত সোজা নয়।' নিজের ঠোঁটে জোরে এক টান দিয়ে ছেড়ে দিল। 'কারণটা অন্যখানে। মিসেস রেডরোজ জানত, তাকে দেখতে পারে না প্রতিবেশীরা। তাড়াতে চায় এখান থেকে। চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রেডরোজ। তবে যাওয়ার আগে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। তাসগুলো মুসার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল প্ল্যান করেই। জানত, তাসগুলো পেলেই খেলতে চাইব আমরা। আর খেলতে বসলে নিজেদের অজান্তেই ভয়ানক ক্ষতি করে দেব পড়শীদের। যদি দোষ পড়ে আমাদের ওপর পড়বে।' এক মুহূর্ত ভাবল সে। তারপব বলল, 'হ্যাঁ, এটাই একমাত্র কারণ। আমি শিওর।'

রেগে উঠল মুসা, 'তাহলে তো মহিলাকে গিয়ে এখনই ধরা দরকার...'

'পাবে কোথায়?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'গিয়ে দেখগে, তার বাড়িতে তালা মারা।'

'তুমি দেখেছ নাকি?'

'না। অনুমান করছি। তাসের খেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্যে বসে থাকবে না সে।'

'তাহলে আর সময় নষ্ট করছি কেন? চলো যাই। আগে মিসেস রেডরোজের বাড়িতেই যাব। ওখান থেকে কাকু-কাকুর বাড়িতে যাব। তাসগুলো ফেরত দিয়ে আসতে।'

'আমরাও যাব?' কাকু-কাকুর বাড়িতে যেতে ভয় পাচ্ছে রবিন। সমর্থনের আশায় কিশোরের দিকে তাকাল।

কিশোর কিছু বলার আগেই মুসা বলে উঠল, 'আমাকে একা পাঠাতে চাও নাকি? আমি বাপু একা যেতে পারব না। তোমরা সঙ্গে থাকলে তা-ও সাহস

পাব।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'বেশ। চলো।'

তাসের বাক্সটার জন্যে হাত বাড়াল মুসা। যেই তুলে নিতে যাবে মুখটা খুলে গিয়ে একটা তাস পড়ে গেল মাটিতে। ধড়াস করে উঠল তার বুকের ভেতর। আবার না কোন অঘটন ঘটে যায়।

নিচু হয়ে তাড়াতাড়ি তুলে নিল তাসটা।

ওটায় কি আছে দেখে আঁতকে গেল।

'দেখো দেখো!' চিৎকার করে উঠল সে। 'এ তাসটা তো আগে দেখিনি একবারও!'

অন্য দুজনের দেখার জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিল সে।

'আরে এ তো…এ তো কাকু-কাকুর ছবি!' রবিনও হতবাক।

কিশোরও দেখল। ভুল বলেনি মুসা বা রবিন। কাকু-কাকুই। সাদা চুল। সাদা গোঁফ। অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঠেলে বেরিয়ে আছে ঠোঁটের দুই কোণে গোল গোল কুতকুতে নীল চোখ মেলে যেন সরাসরি তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে।

'দেখো তো, উল্টো দিকে কিছু আঁকা আছে কিনা?' কিশোর বলল।

তাসটা ওল্টাল মুসা। অবাক হয়ে দেখল, লেখা রয়েছে: জাদুকর।

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'জাদুকর। তারমানে এটা মায়াতাস। সমস্ত তাসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিছু বুঝলে?'

জোরে জোরে মাথা নাড়াল মুসা। 'বোঝাবুঝির আমার দরকার নেই। এগুলোর কোন ব্যাপারেই আর ঢুকতে চাই না। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। চলো, গিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরত দিয়ে আসি।'

কিন্তু তার কথায় কান দিল না কিশোর। তাসটা হাতে নিয়ে উঁচু করে দেখল। আনমনে বিড়বিড় করল, 'সত্যিই কি জাদুকর? জাদু বলে সত্যি কোন জিনিস আছে?'

তাসটা আবার কেড়ে নিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে পকেটে ভরে ফেলল মুসা, 'না থাকলে খানিক আগে কার ভয়ে ঘাম ছুটে গেল আমাদের? ড্রাগনের পায়ের ছাপ তো এখনও রয়েছে মাটিতে। ওগুলো কি মিথ্যে? দেখো, অত কথার দরকার নেই। চলো, ফেরত দিয়ে আসি…'

'কিন্তু রহস্যটা ভেদ না করেই?'

কিশোরের কোন কথার ধার দিয়েই গেল না আর মুসা। তার হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে চলল দরজার দিকে।

জিনসের প্যান্টের পেছনের পকেটে ভরে নিয়েছে তাসের প্যাকেটটা।

পনেরো

সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল তিনজনে। সামনের লনের ওপর দিয়ে হাঁটতে

লাগল।

মোড়ের কাছে বিশাল একটা ম্যাপল গাছ ছিল। কাত হয়ে পড়ে আছে এখন বিদ্যুতের তারের ওপর। একনাগাড়ে স্ফুলিঙ্গ ছিটাচ্ছে এখন ছেঁড়া তারগুলো। মাঝে মাঝে বেড়ে গিয়ে স্ফুলিঙ্গের ফুলঝুরি তৈরি করছে। চড়চড়, ছরছর শব্দ করেই চলেছে।

গাছটার সামনে থামল ওরা।

রাস্তার ওধারে লাল রঙের একটা ভর্তা হয়ে যাওয়া জিনিস দেখাল মুসা। 'গাড়ি ছিল ওটা।'

সারা ব্লক জুড়ে ধ্বংসলীলা চলেছে। ভেঙেচুরে তছনছ করে দেয়া হয়েছে। ভর্তা হয়ে যাওয়া গাড়ি। ভেঙে পড়া গাছ। ছেঁড়া তার। রাস্তায় বড় বড় গর্ত। দলিত মথিত পাতাবাহারের বেড়া আর ফুলের বেড।

রাস্তা আটকে রেখেছে তিনটে পুলিশের গাড়ি। নীরবে জ্বলছে নিভছে ওগুলোর লাল আলো।

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে জটলা করছে লোকে। নানা রকম জল্পনা করছে। মাথা চাপড়াচ্ছে কেউ। কেউ বা উত্তেজিত কণ্ঠে বোঝানোর চেষ্টা করছে অন্যকে; হাত তুলে দেখাচ্ছে ধসে পড়া বাড়িঘর, ভর্তা হয়ে যাওয়া গাড়ি। চমকে যাওয়া বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে কেউ কেউ।

'এ সবের মূলে আমরা!' বিড়বিড় করে বলল মুসা। নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না কোনমতেই। 'লোকের সর্বনাশ করেছি!'

'আমাদের দোষ বলা যাবে না,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'আমরা তো জানতাম না তাস খেললে এতবড় কাণ্ড ঘটবে। আমাদেরকে দিয়ে যে ঘটনাটা ঘটিয়েছে, দোষী আসলে সে। মিস লীলা রেডরোজ। তাকে খুঁজে বের করা দরকার।'

'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না,' হতভম্ব হয়ে যাওয়া ভঙ্গিতে বলল রবিন। গলা কাঁপছে। 'ভাবতেই পারছি না, সাধারণ কয়েকটা তাস এতবড় ক্ষতি করে দিতে পারে।'

কয়েকজন প্রতিবেশীকে ওদের দিকে তাকাতে দেখে কুঁকড়ে গেল মুসা। তার মনে হতে লাগল ওরা যে অপরাধী লোকে সেটা টের পেয়ে গেছে। জেনে গেছে খেলতে বসে নাইট আর ড্রাগন ডেকে এনে ওরা এই মহা সর্বনাশ ঘটিয়েছে।

ভাবনাগুলো কোনমতেই স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না মুসাকে। তাসের প্যাকেটটা বয়ে এনেছে বলে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে তার। ইস্, কোন কুক্ষণে যে কাকু-কাকুর বাড়িতে গিয়েছিল!

ভাবনাগুলো অন্য দু'জনেরও শান্তি হারাম করছে। যতই ভাবছে, রাগটা গিয়ে পড়ছে লীলা রেডরোজের ওপর, অঘটনগুলোর জন্যে সত্যিই যে দায়ী।

ওর বাড়ির দিকে হাঁটা দিল আবার তিন গোয়েন্দা। পুলিশের গাড়িগুলো পার হয়ে এল। কানে এল রেডিওর কড়কড় শব্দ। ইউনিফর্ম পরা অফিসারেরা রাস্তার এ মাথা ও মাথায় হাঁটছে। গভীর ছাপগুলো দেখছে। মাথা চুলকাচ্ছে বোকার মত। বিস্মিত ভাবভঙ্গি।

মোড়ের কাছ থেকেই দেখা গেল লীলা রেডরোজের বাড়িটা। দরজা-জানালা সব বন্ধ। বাড়িতে যে কেউ নেই সেটা বোঝার জন্যে কাছে যাওয়া লাগে না।

বাড়িটায় ঢুকল ওরা। কিশোরের অনুমানই ঠিক। তালা লাগানো। বাড়িতে কেউ নেই। বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে লীলা রেডরোজ।

হতাশ হলো মুসা। ক্ষতিপূরণ আদায় করতে না পেরে।

কিশোর বলল, 'মহিলাকে খুঁজে বের করবই আমরা। জিনিসপত্র যা নষ্ট হয়েছে, সেগুলোর ক্ষতিপূরণ যদি না দিতে পারে, জেলের ভাত খাবে।'

রেডরোজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কাকু-কাকুর বাড়ির দিকে এগোল ওরা। সামনের দরজা বন্ধ। জানালাগুলোর কোনটাতেই প্রাণের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার। বাড়িতে ঢুকে দেখা গেল সকালের খবরের কাগজটা পড়ে রয়েছে ড্রাইভওয়েতে।

ঘটনাটা কি? কাকু-কাকুও বাড়ি ছেড়ে চলে গেল নাকি?

'দেখো, কাকু-কাকুর বাড়িটার কিছুই হয়নি,' কিশোর বলল। 'ওর লন, সামনের আঙিনা, কোথাও কোন ক্ষতি হয়নি।'

পকেটের তাসের প্যাকেটটায় হাত রাখল মুসা। 'বাড়ি থাকলেই হয় এখন। তাসগুলোকে তাড়াতে পারলে বাঁচি।'

রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে কাকু-কাকুর সুন্দর করে ছাঁটা লনে প্রবেশ করল ওরা। ওর সামনের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

জানালা দিয়ে উঁকি দিল মুসা। কিন্তু রোদের প্রতিফলন জানালার কাঁচে এক ধরনের সোনালি পর্দা সৃষ্টি করেছে। ভেতরে দৃষ্টি প্রবেশে বাধা দিচ্ছে।

বড় করে দম নিল সে। তারপর যা থাকে কপালে ভেবে তিন ধাপ নিচু সিঁড়ি বেয়ে সামনের দরজার কাছে উঠে ঘণ্টার বোতাম টিপে ধরল। বাড়ির ভেতর থেকে ঘণ্টা বাজার আওয়াজ কানে এল।

'মিস্টার কাকু-কাকু, বাড়ি আছেন?' ডেকে জিজ্ঞেস করল মুসা। ভয় যে পাচ্ছে, সেটা প্রকাশ পেল কণ্ঠস্বরেই। 'মিস্টার কাকু-কাকু?'

জবাব নেই।

বাড়ির ভেতর থেকে পদশব্দ ভেসে এল না। কোন শব্দই নেই।

আবার বেল বাজাল মুসা। অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ করেই হাত দুটো বরফের মত শীতল লাগতে লাগল তার। চাঁদির কাছে দপ্‌দপ্‌ করছে মাথার শিরাগুলো।

ভয় তো পাবই, নিজেকে কৈফিয়ত দিল সে। লোকটা জাদুকর। অদ্ভুত, অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে তার। হয়তো একজন ভয়ঙ্কর ক্ষমতাশালী প্রেতসাধকই, কে জানে।

এবং সেই ক্ষমতাশালী লোকটা ভাবছে, তার জিনিস চুরি করেছে মুসা।

'কি, কিছু শুনছ?' নিচ থেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। তার কাছ ঘেঁষে এল রবিন। দুজনে তাকিয়ে রয়েছে মুসার দিকে।

আবার বেল বাজাল মুসা। দুই হাতে কিল মারতে শুরু করল দরজায়।

ঠেলা লেগে খুলে গেল দরজা।

ভীষণ চমকে গেল সে। মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি।

অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করে মাথা ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। বাড়ির ভেতরে সামনের অংশটা অন্ধকার। ভারী দম নিল সে। নাকে এল তীক্ষ্ণ, মিষ্টি এক ধরনের সুবাস। মশলা মেশানো।

'মিস্টার কাকু-কাকু?' ডাক দিল আবার।

অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হলো তার ডাক। ভোঁতা, ফাঁপা এক ধরনের শব্দ।

আবার ভারী দম নিল সে। প্রচণ্ড গতিতে চলতে থাকা হৃৎপিণ্ডটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। তারপর দরজাটাকে আরেকটু ফাঁক করে পা রাখল ঘরের ভেতর।

'শুনছেন?' ডেকে জিজ্ঞেস করল সে। 'কেউ আছেন?'

পরক্ষণেই ধড়াস করে এক লাফ মারল তার হৃৎপিণ্ড। লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল সে। সামনের ঘর থেকে ভেসে এল একটুকরো তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ।

ষোলো

দরজার কাছে পিছিয়ে আসতে গিয়ে ধাক্কা খেল কিশোর আর রবিনের গায়ে। মুসা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির মাথায় উঠে এসেছে ওরা।

'আ-আছে…ঘ-ঘ-ঘরেই আছে সে…' তোতলাতে শুরু করল মুসা।

আবার শোনা গেল তীক্ষ্ণ, উচ্চকিত হাসি।

'আমার কাছে তো বাচ্চাদের হাসির মত লাগছে,' মুসার গা ঘেঁষে এসে ফিসফিস করে বলল রবিন। 'কিংবা কোন জানোয়ারের।'

ফ্যাকাসে এক ফালি রোদ পড়েছে লিভিং রুমে। সেটা ধরে প্রায় গায়ে গায়ে লেগে থেকে এগোতে শুরু করল ওরা। ঘরের অন্ধকার চোখে সয়ে এলে দেখা গেল ঘর ভর্তি পুরানো আসবাবপত্র। কয়েকটা খাড়া হেলানওয়ালা কাঠের চেয়ার আছে। একটা টেবিল আছে, তাতে এলোমেলো ভাবে নানা রকম জিনিস ছড়ানো। একটা ভাঙাচোরা পিয়ানো আছে। ছোট একটা টেবিলে রাখা একটা রূপার বল। জানালায় এত ভারী পর্দা টানা যে, আলোই আসতে পারছে না।

আবার হাসির শব্দ শোনা গেল।

ফিরে তাকাল মুসা। হাসিটা কোথা থেকে আসছে, শব্দ সৃষ্টিকারীটা কে, দেখে ফেলল।

একটা বানর। ছোট একটা বাদামী বানর একটা পিতলের খাঁচার মধ্যে উত্তেজিত ভঙ্গিতে লাফালাফি করছে। বানরের ভাষায় কিচকিচ করে চলেছে সমানে।

'বাহ্, সুন্দর তো বানরটা!' রবিন বলল। খাঁচাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

তীক্ষ্ণ কিচির-মিচির থামিয়ে দিল বানরটা। মাথা কাত করে তাকিয়ে দেখতে লাগল রবিনকে।

'পোষাই তো মনে হচ্ছে,' রবিনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। সাবধানে তাকিয়ে আছে বানরটার দিকে। 'নাকি আগে মানুষ ছিল, কাকু-কাকু জাদু করে ওকে বানর বানিয়ে ফেলেছে?'

'না, ও সব সময়ই বানর ছিল!' পেছন থেকে বলে উঠল একটা তীক্ষ্ণ খসখসে কণ্ঠ।

কাকু-কাকুর গলা চিনতে পেরে চরকির মত পাক খেয়ে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল মুসা।

শীতল গোল গোল কুতকুতে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে কাকু-কাকু। সাদা চুলগুলো মাথার পেছনে ঘাড়ের কাছে খাড়া হয়ে আছে। মখমলের লাল আলখেল্লার নিচে ডোরাকাটা পাজামা পরেছে।

'মিস্টার কাকু-কাকু...' শুরু করতে গেল মুসা।

'এখানে কি তোমাদের?' রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করল কাকু-কাকু। 'এখন ক'টা বাজে? এত সকালে এসে ঘুম ভাঙালে কেন আমার? নাকি বাড়িটা খালি ভেবে আর লোভ সামলাতে পারোনি। চুরি করতে ঢুকে পড়েছ?'

'না-না!' তোতলাতে শুরু করল মুসা, 'আ-আ-আমরা আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। আ-আমরা...'

'বেশ দেখা তো হলো আমার সঙ্গে!' চিৎকার করে উঠল কাকু-কাকু। 'সব সময় এ ভাবে চুরি করেই লোকের সঙ্গে দেখা করতে ঢোকো নাকি?'

'না। দরজাটা খোলাই ছিল,' জবাব দিল মুসা।

'চুরি করে ঢুকিনি আমরা,' এতক্ষণে কথা বলল কিশোর। 'ঢোকার আগে বেশ কয়েকবার বেল বাজিয়েছি।'

ব্যঙ্গের স্বরে বলল কাকু-কাকু, 'তাই নাকি...'

বাধা দিয়ে রবিন বলল, 'দেখুন, আমরা সত্যি বলছি। চুরি করার সামান্যতম ইচ্ছে আমাদের নেই।'

চোয়াল ডলল কাকু-কাকু। গোঁফের মাথা দুটো টেনে লম্বা করে দিল। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে গোয়েন্দাদের দিকে। 'তোমরা কেন এসেছ, আমি জানি,' অবশেষে বলল সে।

'অ, জানেন...জানবেনই তো...' পেছনের পকেট থেকে তাসের প্যাকেটটা বের করে আনল মুসা। কাঁপা কাঁপা হাতে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে, নিন!'

জ্বলে উঠল কাকু-কাকুর নীল চোখ। 'তাহলে তোমরাই বাক্সটা চুরি করেছিলে।'

'না, আমরা চুরি করিনি,' মুসা বলল।

'তাহলে তোমাদের কাছে গেল কি করে?'

'মিস লীলা রেডরোজ চুরি করে আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেদিন। আমাদেরকে দিয়ে খেলিয়ে প্রতিবেশীদের ক্ষতি করে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত মুসার দিকে তাকিয়ে রইল কাকু-কাকু। তারপর কিশোর

আর রবিনের ওপর ঘুরে এসে আবার মুসার ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। 'অ, তারমানে খেলাটাও তোমাদেরই কাজ। ড্রাগন ডেকে এনেছ। আরেকটু হলেই ধ্বংস করে দিচ্ছিলে তোমাদের পুরোটা ব্লক।'

'হয়তো,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু তারপরেও স্বীকার করব না, দোষটা আমাদের। কারণ, ওরকম এক প্যাকেট তাস হাতে পেলে আপনিও খেলতে বসতেন। তাস খেলাটা দোষের কিছু না। কিন্তু সেটা যে এ রকম বাস্তব হয়ে উঠবে, সব কিছু ধ্বংস করে দেবে, সেটা কে জানত? যখনই বুঝলাম বিপজ্জনক, ফেরত দিতে নিয়ে এলাম।'

'যখন আনতে গেলাম, তখন দিলে না কেন?' রেগে উঠল কাকু-কাকু।

'তখন দিলে চোর বলতেন আমাদের।'

'এখনও যদি বলি?'

'বললে বলুনগে। এখন চোর বললে আর ততটা গায়ে লাগবে না। কারণ, আমরা বুঝে গেছি, তাসগুলো বিপজ্জনক। যা-ই বলুন, কোন কিছু আর কেয়ার করি না। কারণ, কারও ক্ষতির কারণ আর হতে চাই না আমরা। কিন্তু একটা কথা বলুন তো, আপনিই বা এ রকম এক প্যাকেট বিপজ্জনক তাস বিক্রির জন্যে রেখেছিলেন কেন? যে কিনত, সে কি ভাবছেন খেলত না? ক্ষতির কারণ হত না? আর না জেনে ক্ষতি করলে দোষটা কার ওপর বর্তাত?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'আপনার ওপর। কারণ আপনিই এগুলোর আসল মালিক।'

'মানুষের ক্ষতি তো করেছই, আবার বেশি···চোরের মা'র বড় গলা···' থাবা দিয়ে মুসার হাত থেকে প্যাকেটটা কেড়ে নিল কাকু-কাকু।

'দেখুন যা হবার হয়ে গেছে,' পরিস্থিতিটাকে হালকা করার জন্যে বলল রবিন, কাকু-কাকুকে ভয় পাচ্ছে সে। 'এটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই।'

'বাড়াবাড়ি মানে?' রাগ তো কমলই না, বেড়ে গেল আরও কাকু-কাকুর। 'শয়তানিটা আমি করেছি, না তোমরা? চুরি তো চুরি, আবার সিনাজুরি···'

সহ্য করতে পারল না আর মুসা। রেগে উঠল, 'দেখুন, আমরা চুরি করিনি! আমরা চোর নই, বার বার বলছি আপনাকে। কিছুতেই বিশ্বাস করছেন না। তা ছাড়া কি করে জানব আমরা, তাস খেলে বাস্তবে ড্রাগন আর নাইট ডেকে আনা যায়? এ রকম গাঁজাখুরি কথা কেউ বিশ্বাস করবে? আগে খুলে বলেননি কেন সে-কথা? আসলে, ভুল আমাদের সবারই হয়েছে! আপনিও বাদ যাবেন না।'

'হ্যাঁ,' যেন একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কাকু-কাকু। গোঁফের কোনায় চাড় দিতে শুরু করল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মুসার দিকে। 'ভুল। বড় রকমের ভুল। অনেক বেশি জেনে ফেলেছ তোমরা।'

কাকু-কাকুর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। ঘাবড়ে গেল। পিছাতে গিয়ে ধাক্কা লাগল একটা উঁচু হেলানওয়ালা সোফায়। 'অনেক বেশি জেনে ফেলেছি মানে? কি বলতে চান?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তার কণ্ঠ।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন।

প্রশ্নের জবাব দিল না কাকু-কাকু। অদ্ভুত হাসি ফুটল তার ফ্যাকাসে মুখে।

তিন গোয়েন্দার ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে তাসগুলো সব বের করল প্যাকেট থেকে।

'তাস যখন তোমাদের এতই পছন্দ,' বিচিত্র হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে—তার গোঁফ জোড়াকে মনে হলো ডানা মেলে উড়ছে, 'নিজেরাই এর চরিত্র হয়ে যাও না কেন? তাসের জগতেই ঢুকে পড়ো তোমরা।'

'মানে?' দম আটকে এল মুসার। 'কি বলতে চান...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই হাত সরিয়ে তাসগুলোকে শূন্যে উড়িয়ে দিল কাকু-কাকু।

ছুঁড়ে ফেলল মুসা, রবিন আর কিশোরকে লক্ষ্য করে।

ঘুরতে ঘুরতে, ওলট-পালট করতে করতে নিচে পড়তে লাগল তাসগুলো। ওদের মাথায়, ওদের কাঁধে। নীরবে ভাসতে ভাসতে মাটিতে নেমে গেল।

তাসগুলো সব মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার নেমে এল ওদের ওপর।

গাঢ়, ঠাণ্ডা অন্ধকার। এ রকম অনুভূতি আর আগে কখনও হয়নি ওদের।

ধীরে ধীরে ঘরটা মিলিয়ে গেল। কাকু-কাকু মিলিয়ে গেল। নিজেরাও পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে না আর।

নড়ল না তিনজনের কেউ। মনে হচ্ছে পড়ে যাচ্ছে। তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। বরফের মত শীতলতার মধ্যে।

নিথর নীরবতার মধ্যে।

তারপর একটা বিস্ফোরণ ঘটল যেন নিজেদের দেহে। তীক্ষ্ণ ব্যথা। আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি।

ব্যথাটা বুকের কাছ থেকে ছড়িয়ে গেল সমস্ত শরীরে। বাহুতে। পায়ে। মাথার মধ্যে ফেটে পড়ল ব্যথা। ঝিমঝিম করতে থাকল।

মাথা...মাথা...ঝিমঝিম...

মনে হলো টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে মাথাটা।

মনে হলো কোটর থেকে খুলে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে চোখ। দাঁত খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে মুখ থেকে।

চিৎকার করতে থাকা ওদের হাঁ করা মুখ দিয়ে মগজটা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ করেই মনে হলো ওদের, এই অন্ধকার ওদের চেনা।

নিথর এই শীতল অন্ধকারটাকে চেনে ওরা।

মনে হতে লাগল, এটাই মৃত্যু।

সতেরো

অন্ধকার কেটে যাওয়ার আগেই যেন ধুয়ে চলে গেল শীতলতা। গরম ঢেউয়ের ধাক্কা এসে লাগল যেন শরীরে।

কয়লা-কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। অন্ধকার চাদরের মধ্যে মিটমিট করছে কতগুলো আলোর ফোঁটা।

তারা?

হ্যাঁ। তারকা খচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। মেঘমুক্ত আকাশ। ঝিরঝিরে বাতাস। চুল কাঁপে।

হাঁটুতে ভর দিয়ে রয়েছে, বুঝতে পারল। হাঁটু আর হাতের তালুতে। চার হাত-পায়ে। লম্বা ঘাসের মধ্যে।

বাতাস এত তাজা। এত মিষ্টি। দারুণ সুবাস।

বেঁচে আছি! আমি বেঁচে আছি! প্রথমেই এ কথাটা মনে পড়ল ওর।

কানে এল গোঙানির শব্দ। ওর পাশে থেকে। ঘাসের মধ্যে খসখস শব্দ।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল রবিন। চোখের পাতা সরু সরু করে তাকাল কিশোরের দিকে। যেন চিনতে পারছে না। ঝাঁকি দিয়ে চুল থেকে কুটো ফেলল। ফিসফিস করে বলল, 'কিশোর, কোথায় রয়েছি আমরা?'

'তাই তো! কোথায় রয়েছি?' লম্বা ঘাসের মধ্যে রবিনকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল মুসা।

'ভালই তো আছি দেখা যাচ্ছে,' জবাব দিল কিশোর। যদিও গলা কাঁপছে তার। 'আমার মনে হচ্ছিল মগজ ফেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল, মারা যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমরা এখন কোথায়?' আবার প্রশ্ন করল রবিন। 'ছিল সকাল। এখন তো দেখতে পাচ্ছি রাত।'

নিজেকে টেনে তুলল কিশোর। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল। 'চওড়া একটা মাঠের মধ্যে রয়েছি আমরা। সমতল মাঠ।'

রবিন আর মুসাও উঠে দাঁড়াল।

চারপাশে তাকাতে তাকাতে মুসা বলল, 'কোন খামার-টামারের সামনে রয়েছি।'

লম্বা ঘাসের মাঠ ছাড়িয়ে ওপাশে কমলা রঙের ছোট ছোট আগুনের কুণ্ড দেখতে পেল সে। গোল, নিচু কতগুলো কুঁড়েঘরের সামনে জ্বলছে।

'গ্রামটাম হবে,' কিশোর বলল। 'ঘরগুলো দেখো। ঘাস কিংবা খড় দিয়ে তৈরি।'

'অদ্ভুত!' বিড়বিড় করল মুসা

ধূসর রাতের আলোতে ভাল করে দেখা যায় না। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকাল কিশোর। উঁচু একটা খড়ের গাদা চোখে পড়ল। ওটার পাশে উবু হয়ে আছে একটা ঠেলাগাড়ি। ছোট ছোট আরও দুটো ঠেলাগাড়ি চোখে পড়ল ওদের। দূরে কুঁড়ের সারির কাছেই কোনখান থেকে ভেসে এল একটা ঘোড়ার ডাক।

ঘাড় থেকে থাবা মেরে লাল একটা পোকা ফেলল রবিন। 'অনেক রাত হয়ে গেছে। বাড়ি যাওয়া দরকার। জায়গাটাও আমার ভাল লাগছে না।'

'মনে তো হচ্ছে বাড়ি যাওয়াটা অত সহজ হবে না,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা; 'বাড়ি থেকে বহু দূরে রয়েছি আমরা। কাকু-কাকু কি করেছে আমাদের? এতই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কি যে বলছিল খেয়ালই করিনি ঠিকমত।'

‘ও বলেছে,’ কিশোর বলল, ‘তাস যখন এত পছন্দ, তাসের জগতেই ঢুকে পড়ো তোমরা। তাসগুলো ছুঁড়ে মেরেছে আমাদের ওপর। তারপর এখানে পৌঁছে গেছি আমরা।’

‘তারমানে তাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছি আমরা?’ চিৎকার করে উঠল মুসা। ‘তাসের খেলায়? মুখোশ পরা নাইট আর আগুন ঝরানো ড্রাগনের দেশে?’

‘অসম্ভব!’ বিড়বিড় করে বলল আতঙ্কিত রবিন।

‘হ্যাঁ, সত্যিই অসম্ভব।’ প্রতিধ্বনি করল কিশোর। ‘কিন্তু সেটাই ঘটিয়ে বসে আছি আমরা।’

‘কিন্তু···কিন্তু···,’ কথা খুঁজে পেল না মুসা।

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার কানে আসতেই ফিরে তাকাল কিশোর।

খসখস শব্দ। পায়ের আওয়াজ। লম্বা ঘাসের ডগা বেঁকে যেতে দেখল সে।

লম্বা এক সারি খুদে মানুষকে ঘাসের মধ্যে সারি দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। গায়ে চামড়ার পোশাক। বড় বড় এলোমেলো চুলে ঢাকা মাথায় গম্বুজ আকৃতির ধাতব হেলমেট. তারার ভোঁতা আলোয় চকচক করছে। হাতে লম্বা, চোখা ফলাওয়ালা বল্লম।

হুপ! হুপ! হুপ! হুপ! হাঁটার তালে তালে একনাগাড়ে বিচিত্র শব্দ করছে ওরা।

‘জেকিলস!’ ফিসফিস করে বলল কিশোর। সাবধান হয়ে গেল। ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ।

ঝট করে বসে পড়ল তিনজনে। লুকিয়ে পড়ল লম্বা ঘাসের মধ্যে।

‘আমি ওদের চিনে ফেলেছি,’ ফিসফিস করে বলল কিশোর। ‘তাসের মধ্যেও ওদের ছবি ছিল। ওরা শয়তান···’

‘তাসের পেছনে আমিও লেখা দেখেছি,’ কম্পিত কণ্ঠে রবিন বলল। ‘ওরা খুব দুষ্ট শিকারী। নিজেদের মাংস নিজেরা খায়। মানুষ তো খায়ই।’

আঠারো

হুপ! হুপ! হুপ! হুপ!

আতঙ্কিত হয়ে বামন-মানবগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। মার্চ করে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। হাঁটার তালে তালে বল্লম উঠছে, বল্লম নামছে। এক ভাবে। এক ভঙ্গিতে।

ভারী দম নিল কিশোর। ঘাসের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে শুরু করল লোকগুলোর চলার পথ থেকে।

হুপ! হুপ! হুপ! হুপ!

লোকগুলো কি ওদের দেখে ফেলেছে?

জানার জন্যে অপেক্ষা করা যাবে না।

হামাগুড়ি দিয়ে বেশ খানিকটা সরে গেল ওরা। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে মাথা নিচু

করে লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে দৌড় দিল কিশোর। রবিন আর মুসা ছুটল ওর পাশে পাশে।

ঘাসে ঢাকা নরম মাটিতে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ছুটতে থাকল ওরা। কিন্তু ঘাসের গায়ে ঘষা লেগে শব্দ হয়েই যাচ্ছে। ফিরে তাকাল না। তবে কান পেতে রইল লোকগুলোর শিকার দেখতে পাওয়ার উল্লসিত চিৎকার শোনা যায় কিনা।

কোথায় যাব? কোথায় লুকাব? ভাবছে কিশোর।

বুকের মধ্যে পাগল হয়ে উঠেছে হৃৎপিণ্ডটা। ছোটার সময় হাঁপানোর শব্দকে কম করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল সে।

তারার ফ্যাকাসে আলোয় উঁচু খড়ের গাদাটাকে কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ওদের সামনে এক অতিকায় দৈত্যের মত।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না সে। ভাবনা-চিন্তাও করল না বিশেষ। করার সময়ও নেই।

মাথা নিচু করে প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ল গাদাটার ওপর। এক পাশ থেকে ঢুকে পড়ল তার ভেতর।

ভেজা ভেজা। খসখসে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো গা চুলকানো।

এক হাতে চোখ ঢেকে যতটা পারল গভীরে ঢুকে গেল ও। মুখেও খড়ের খোঁচা লাগছে। খোঁচা দিচ্ছে কাপড়ে ঢাকা চামড়াতেও। ধারাল খড়ের ডগা তেরছা ভাবে খোঁচা মেরে আঁচড়ে দিচ্ছে ঘাড়ের চামড়া।

খড়ের গাদার মধ্যে খড়খড় আওয়াজ পিলে চমকে দিল কিশোরের। পরক্ষণে বুঝতে পারল, মুসা আর রবিনও ঢুকেছে ওর পাশেই।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'এ তো এক্কেবারে ভেজা!'

'আমাদের দেখে ফেলল নাকি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কি-ক্কি জানি,' তুত্‌লে বলল মুসা। 'থাক, আর কথা বলার দরকার নেই। শুনে ফেলবে...'

চুপ হয়ে গেল ওরা।

কান পেতে আছে কিশোর। জেকিলদের পায়ের শব্দ শোনার জন্যে।

কানে এল না।

হুপ হুপও করছে না আর।

চলে গেল নাকি?

নাকি খড়ের গাদা থেকে ওদের বেরোনোর অপেক্ষা করছে?

মুখের চামড়ায় খোঁচা মারছে খড়ের ডগা। নাকের ভেতর ঢুকে যাওয়া একটা ভেজা খড় সরিয়ে দিতে চাইল সে। যথেষ্ট বেগ পেতে হলো সরাতে।

'ইস্, এত চুলকান চুলকাচ্ছে,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

কিশোরের নিজেরও কম চুলকাচ্ছে না। কি জবাব দেবে? পিঠ...বুক...গাল...কোথায় চুলকাচ্ছে না!

সেই সঙ্গে ক্রমাগত খোঁচানো।

চামড়ায় জ্বলুনি শুরু হয়ে গেল। শরীর না মুচড়ে আর থাকতে পারল না। গায়ের ওপর চেপে থাকা খড় সরানোর চেষ্টা করল। চুলকানো থামিয়ে দিল। লাভ

নেই। চুলকাতে গেলে কষ্ট আরও বাড়ে।
দাঁতে দাঁত চেপে স্তব্ধ হয়ে রইল। উফ্, এত চুলকানি...এত চুলকানি...
হঠাৎ চাপা একটা গোঙানি যেন জোর করেই বেরিয়ে এল মুখ থেকে।
বেশ বড় বড় লাল রঙের এক ধরনের পোকা। মুখ থেকে টেনে সরাল একটাকে। আরেকটা ঘষা দিয়ে ফেলে দিল হাতের উল্টো পিঠ থেকে।
ঘাড়ের ওপর পোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে সড়সড় করে। শার্টের কলার দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। হেঁটে বেড়াতে শুরু করল পিঠের ওপর।
শত শত লাল পোকায় ছেয়ে আছে খড়ের গাদা। মানুষের গন্ধ পেয়েই যেন এসে হাজির হলো। ঘুরে বেড়াতে শুরু করল ওদের গায়ের ওপর।
'ইয়াক!' করে উঠল কিশোর। একটা লাল পোকা ওর ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটের কোণ দিয়ে মুখে ঢুকে পড়ল।
থু-থু করে ফেলে দিল ওটা। জিভে ঝাঁজাল-টক স্বাদ আটকে থাকল অনেকক্ষণ। দাঁতে দাঁত চেপে ফাঁক বন্ধ করে রাখল এরপর। কোনমতেই যাতে আর পোকা ঢুকতে না পারে।
পোকা ঢুকে থাকার কথা কল্পনা করে আরও একবার থু-থু করে উঠল। গাল চুলকাল। খড়ের গাদায় ঘষে পিঠের চুলকানি বন্ধ করতে চাইল।
কিন্তু কোন কাজই হলো না।
মনে হচ্ছে যেন ভয়াবহ এই চুলকানিতেই মারা যাবে।
চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে। পোকায় ছাওয়া খড়ের গাদা থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে। চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেলতে, কাপড় ছিঁড়তে, খামচে চামড়া তুলে ফেলতে ইচ্ছে করছে।
কোনদিনই এ চুলকানি আর বন্ধ হবে না, নিজেকে বলল সে। বাকি জীবনটা এ ভাবে চুলকে চুলকেই কাটাতে হবে।
'নাহ্, আর সওয়া যায় না!' পাশ থেকে বলতে শুনল রবিনকে। 'আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। মরলে মরব। তা-ও না চুলকে আর পারব না।'
তবে মুসা তুলনামূলকভাবে স্থির রয়েছে। ফিসফিস করে বলল, 'চুপ! জেকিলরা এখনও ধারে কাছেই আছে।'
যন্ত্রণার চোটে গায়ে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল কিশোরের। কমানোর কোন উপায় নেই। গায়ের ওপর চেপে রয়েছে ভয়াবহ খড়।
কান থেকে একটা পোকা বের করে ফেলল সে।
ফেলতে না ফেলতেই আরেকটা উঠে এল নাকের ওপর। ঢুকে গেল নাকের ফুটো দিয়ে।
না না! এ কাজও কোরো না! নিজেকে আদেশ দিল সে।
কিন্তু কথা শুনল না হাঁচি।
প্রচণ্ড জোরে হ্যাচ্চোহ্ করে উঠল সে।

উনিশ

ওর হাঁচির শব্দ মিলাতে না মিলাতেই ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল কয়েকজন। তারপর রাগত চিৎকার-চেঁচামেচি।

বেরিয়ে পালানোর সময় নেই আর। একাধিক পায়ের শব্দ ছুটে আসতে শোনা গেল।

অনেকগুলো হাত একসঙ্গে ঢুকে গেল খড়ের গাদায়। পা চেপে ধরে টেনে টেনে বের করে ফেলল কিশোরকে।

বিজাতীয় একটা ভাষায় অনর্গল কথা বলছে লোকগুলো, যার একটা বর্ণও বুঝতে পারল না সে। রবিন আর মুসাকেও বের করে ওরা আছড়ে ফেলল খড়ের গাদার নিচের শক্ত মাটিতে।

দ্রুত তিনজনকে ঘিরে ফেলল ওরা। কম করে হলেও ডজনখানেক বামন হবে। তীক্ষ্ণধার বল্লমের ফলা তিনজনের গায়ের কাছে কয়েক ইঞ্চি দূরে এসে থেমে গেল। নড়াচড়া করলেই দেবে ঘ্যাচ করে বিঁধিয়ে। ওদের চেহারায় প্রচণ্ড রাগ।

বুক চুলকাল কিশোর। শার্টের নিচ থেকে একটা পোকা বের করে এনে ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে।

পাগলের মত চুলকে চলেছে রবিন আর মুসা। পোকা ফেলছে গা থেকে। দুনিয়ার আর কোনদিকে খেয়াল নেই যেন!

রবিনের চুলে চার-পাঁচটা পোকা ঘুরে বেড়াতে দেখে থাবা দিয়ে ফেলে দিল কিশোর।

অবশেষে, ফিরে তাকাল খুদে মানুষগুলোর দিকে, ওদের যারা বন্দি করেছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কেউ ইংরেজি জানো?'

কলরব বন্ধ হয়ে গেল ওদের। ওদের এলোমেলো, জট বেঁধে যাওয়া লম্বা চুলের নিচের চোখ দুটো পাতা সরু করে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দার দিকে। আরও সতর্ক ভঙ্গিতে চেপে ধরল হাতের বল্লমগুলো।

'ইংরেজি?' লোকগুলোর ওপর দৃষ্টি ঘুরাতে থাকল কিশোর। 'জানো কেউ?'

কৌতূহলী হয়ে গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে রইল লোকগুলো। যেন কল্পনাই করতে পারেনি বন্দিরা কথা বলতে পারে।

'চলো যাই!' মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা। 'এখানে আমরা থাকব কিসের জন্যে?'

নীরবতা।

লোকগুলোর বল্লমের ফলা আরও এগিয়ে এল দু'এক ইঞ্চি। ওদের ঘিরে থাকা চক্রটা আরও ছোট হয়ে এল।

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল মুসা, কিশোর আর রবিন।

খুদে লোকগুলোর মাথার ওপর দিয়ে চক্রটার বাইরে তাকাল কিশোর। পালানোর পথ খুঁজছে তার চোখ। লোকগুলোর ওপাশে সমতল মাঠ ছাড়া আর রয়েছে সারি সারি গোল কুঁড়ে। প্রতিটি কুঁড়ের সামনে জ্বলছে একটা করে ছোট অগ্নিকুণ্ড।

ঢোক গিলল সে। পালানোর পথ নেই। লুকানোর জায়গা চোখে পড়ল না।

পিঠে চোখা ফলার খোঁচা খেয়ে 'আউক' করে উঠল সে।

লাফ দিয়ে সামনে এগোল।

ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করছে জেকিলেরা। পেছন থেকে বল্লম দিয়ে খোঁচা মারতে থাকল। নড়তে বলছে।

'হাই! দাঁড়াও!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। কণ্ঠের আতঙ্ক চাপা দিতে পারল না। 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা আমাদের?'

আবার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ। রাগত হট্টগোল। চাপা গর্জন।

লাফ দিয়ে আগে বাড়তে গেল মুসা। বল্লমের জোরাল খোঁচা এসে লাগল পিঠে।

'নাহ্, বাঁচার কোন আশা নেই!' হাল ছেড়ে দিল রবিন। 'একমাত্র পথ, গায়েব হয়ে যাওয়া।'

'যেটা কোনমতেই হওয়া যাবে না,' যোগ করল মুসা।

'অতএব বাঁচাও যাবে না।'

'এটা কিন্তু খেলা নয়,' কিশোর বলল। 'কঠোর বাস্তব।'

মাঠের ওপর দিয়ে ওদেরকে হেঁটে যেতে বাধ্য করল জেকিলরা। নিচু একটা কুঁড়ের সামনে এনে দাঁড় করাল। অগ্নিকুণ্ডের কাছে। আগুনের নিচে কড়কড় করে কয়লা পুড়ছে। জ্বলন্ত রুবির মত। জোরাল বাতাসের ঝাপটা লাগল। ফুঁসে উঠল আগুন। লেলিহান শিখা লাফ দিয়ে ছুটে এল গোয়েন্দাদের দিকে।

'কি করবে ওরা আমাদের, বলো তো?' করুণ চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'জীবন্ত কাবাব বানাবে?'

'কি জানি!' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'জানি না! তবে একটা কথা বলতে পারি। শিকারকে না মেরে জ্যান্ত ছিঁড়ে খায় না কখনও জেকিলরা।'

এ রকম একটা তথ্যও খুশি করতে পারল না মুসা বা রবিনকে। শিরশির করে কাঁপুনি বয়ে গেল কিশোরের সারা দেহে। পা দুটো আর দেহের ভার রাখতে পারছে না।

ওদের মুখোমুখি বল্লম তুলে সারি দিয়ে দাঁড়াল জেকিলরা। আগুনের দিকে পেছন দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করল

'আমরা কোন ক্ষতি করতে আসিনি তোমাদের!' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'কোন ক্ষতি করব না।'

'আমাদের ছেড়ে দাও!' রবিনের কণ্ঠে কান্নার সুর। 'আমরা এখানে থাকি না। বাস করি না। আমাদেরকে আটকে রাখার কোন অধিকার তোমাদের নেই।'

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করতে লাগল কয়েকজন। গোয়েন্দাদের দিকে নজর নেই। বাকিরা সব বল্লম তাক করে কড়া নজর রাখল

যেন কোনমতেই পালাতে না পারে বন্দিরা।

'ছোট ছোট বামন,' কিশোরের দিকে কাত হয়ে ফিসফিস করে বলল মুসা। 'ওদের এত ভয় পাচ্ছি কেন আমরা? ছুটে পালালেই তো পারি।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'উঁহু। খবরদার। সেই চেষ্টাও কোরো না। দেখতে ছোট হলে কি হবে। ওদের গায়ে অমানুষিক জোর। তা ছাড়া হাতে বল্লম। সাংঘাতিক নিশানা। মিস করে না।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'তাহলে কি করব আমরা?'

জবাব দেয়ার সুযোগই পেল না কিশোর। ঘষার শব্দ কানে এল। কাশি শোনা গেল। সাদা চামড়ার পোশাক পরা একটা জেকিল ছুটে বেরিয়ে এল কুঁড়ের নিচু দরজা দিয়ে।

ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। বোঝার চেষ্টা করছে, কি খবর নিয়ে আসছে লোকটা। গায়ের চামড়ার ফতুয়া আর পাজামা আগুনের আলোয় চকচক করছে। বাকি সবার মত কালো চুল নয় এর। ঝাঁকড়া সোনালি চুলের বোঝা। চওড়া কপাল। জ্বলজ্বলে নীল চোখ।

'মেহ্‌মান,' অদ্ভুত রকম ভারী গলায় বলে উঠল আগন্তুক। 'মেহমান,' আবার একই কণ্ঠে একই শব্দ উচ্চারণ করল লোকটা।

'আপনি···আপনি ইংরেজি জানেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কিশোরের দিকে। 'তোমাকে দেখে তো নাইট বলে মনে হচ্ছে না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল সে। 'ক্রেলের মতও লাগছে না।'

তিন গোয়েন্দার দিকে এগিয়ে এল লোকটা। সরে নেতাকে জায়গা করে দিল দুজন জেকিল। 'তোমরা কি গথ? নাকি জাদুকর?'

আগুনের আলো খেলা করছে তার দু'চোখে। দুই হাত কোমরে রেখে তাকিয়ে আছে সে। জবাবের অপেক্ষা করছে।

'আমরা···আমরা অতি সাধারণ মানুষ,' জবাব দিল কিশোর।

চোখের পাতা সরু করে চোখ প্রায় আধবোজা করে তাকাল লোকটা। 'সাধারণ মানুষ! তোমরা কি শক্তিশালী?'

'না!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই। আমাদের যেতে দিন। প্লীজ!'

'আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি,' শান্তকণ্ঠে লোকটাকে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। 'আমরা সৈনিক নই। আমরা···আমরা ছাত্র। আমরা ছেলেমানুষ।'

মসৃণ চোয়াল ডলল লোকটা। 'তাহলে ছেলেমানুষ-ছাত্র তোমরা এলে কেন এখানে?'

'এক দুষ্ট জাদুকর আমাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা ইচ্ছে করে আসিনি···'

'জাদুকর' শুনেই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল জেকিলরা। বল্লম তুলে নাচাতে শুরু করল।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওদের নেতার। 'জাদুকরে পাঠিয়েছে? তারমানে

তোমরাও জাদুকর।'

'না!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। 'আমাদের কোন ক্ষমতা নেই। কোন ক্ষমতাই নেই। যা ঘটেছে, পুরোটাই একটা ভুলের কারণে। ভুল বোঝাবুঝির কারণে।'

এক এক করে তিন গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকাতে থাকল লোকটা। বিড়বিড় করে বলল, 'তাই, না? বেশ, দেখা যাক।'

দলের লোকের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠে কি আদেশ দিল নেতা। সঙ্গে সঙ্গে দুজন জেকিল দৌড় দিল একটা কুঁড়ে ঘরের দিকে। ভেতরে ঢুকে গেল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বেরিয়ে এল সে। একজনের হাতে একটা রূপার বড় পানপাত্র। দুই হাতে শক্ত করে ধরে আছে সেটা। যেন মহামূল্যবান বস্তু রয়েছে ভেতরে।

লোকটা কাছে এলে পাত্রটা তার হাত থেকে নিয়ে নিল নেতা। তিন গোয়েন্দার সামনে নিচু করল, যাতে ভেতরে কি আছে দেখতে পায় ওরা। রূপার পাত্রে কালচে রঙের কি যেন রয়েছে। পাক খাচ্ছে। বুদবুদ উঠছে। ফোটার সময় হয়েছে তরল পদার্থটার।

'এঁহ্!' একবার তাকিয়েই মুখ চোখ বিকৃত করে ফেলল কিশোর। পচা মাংসের গন্ধ বেরোচ্ছে জিনিসটা থেকে।

'নাও, এটা তোমাকে খেতে হবে,' পাত্রটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল নেতা।

'উঁহু! খেতে পারব না!' পেটের মধ্যে গোলানো শুরু হয়ে গেছে তার। দুই হাতে নাক টিপে ধরে রাখল।

তারপরেও কি করে যেন নাকে ঢুকে যাচ্ছে ভয়ানক দুর্গন্ধ। এত খারাপ গন্ধের কথা কল্পনাই করা যায় না। পচা মাংস, পচা মাছ আর খটাশের গন্ধ একসঙ্গে করলে যা হয়, তা-ই হয়েছে।

ঘন কালো তরল পদার্থ পাত্রের কিনার বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

'খাও খাও, জলদি খাও,' ধমকে উঠল জেকিল-নেতা। 'তাড়াহুড়া করে গিলতে পারলে আর অত খারাপ লাগবে না।'

'কিন্তু···জিনিসটা কি?' নাক থেকে হাত না সরিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। বিকৃত শোনাল কথাটা।

'বিষ,' অকপটে জবাব দিল লোকটা। 'মারাত্মক বিষ।'

দম আটকে ফেলল কিশোর। 'কিন্তু···কেন?'

'এটা আমাদের সত্য-পরীক্ষা,' বুঝিয়ে দিল লোকটা। 'এটা খাওয়ার পরেও যদি তুমি বেঁচে থাকো, তাহলে বুঝতে হবে তুমি সত্যি কথা বলছ।'

ফুটতে থাকা কালো তরলটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'কিন্তু,' চিৎকার করে উঠল সে, 'কেউ কি এ জিনিস খেয়ে বাঁচতে পেরেছে?'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'না। এখনও কেউ পারেনি।'

কতক্ষণ আর নাক ধরে থাকা যায়। হাত সরালেই দুর্গন্ধে পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠছে। বমি আসতে চাইছে। এত ভয়াবহ দুর্গন্ধ, শুধু গন্ধেই অসুস্থ হয়ে

যাচ্ছে সে।

'খাও,' আদেশ দিল আবার নেতা। 'সত্য-পরীক্ষা তোমাকে খেতেই হবে। নাও, ধরো। খাও।'

এক হাতে ওর মাথা চেপে ধরল লোকটা। অন্য হাতে পাত্রটা চেপে ধরল ঠোঁটের সঙ্গে।

বিশ

গরম, আলকাতরার মত ঘন তরলের স্পর্শ পেল মুখের বাইরে কিশোর।

দুর্গন্ধে ভরা বাষ্প আটকে যাচ্ছে সারা মুখে।

কানফাটা একটা গর্জন কানের পর্দা কাঁপিয়ে দিল হঠাৎ।

পাত্রটা জেকিলের হাত থেকে পড়ে গেল। ঘন তরল পদার্থ ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

আবার গর্জন। মাটি কেঁপে উঠল।

পিছিয়ে গেল জেকিল-নেতা। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ।

ভুলে জিভ দিয়ে চেটে ঠোঁট পরিষ্কার করতে গেল কিশোর। জিভে লাগল বিষের স্বাদ।

পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল।

কিন্তু সব কিছু ভুলে গেল বিশাল ড্রাগনটাকে দেখে।

আবার গর্জন।

আরেকটা ড্রাগন দেখা গেল। শরীর দোলাতে দোলাতে দৌড়ে আসছে ঘাসে ঢাকা মাঠের ওপর দিয়ে। তারপর আরও একটা ড্রাগনকে দেখা গেল।

ড্রাগনে সওয়ার আরোহীদেরকেও চোখে পড়ল তার। ড্রাগনের লম্বা, ওপরের দিকে বাঁকানো ঘাড়ে বসে আছে সারা দেহ বর্মে আবৃত যোদ্ধারা। ড্রাগনের পিঠের কাঁটা ওদের বিশেষ অসুবিধে করছে বলে মনে হচ্ছে না।

ওরা নাইট। হাতের তরোয়াল আর ঢাল আগুনের আলোয় চকচক করছে।

ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করছে ড্রাগনগুলো। খুলছে আর বন্ধ করছে ধারাল দাঁতওয়ালা চোয়াল। মাড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল খড়ের গাদা। নেতার কুঁড়ের দিকে দৌড়ে গেল একটা ড্রাগন। ম্যাচ বাক্সের মত ভর্তা করে ফেলল ওটাকে।

হেলমেট আর বর্ম পরা ড্রাগনের লম্বা ঘাড়ে ঝুলে থেকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে নিচের দিকে। তরোয়াল ঘুরিয়ে কোপ মারছে হতবাক জেকিলদের।

হট্টগোল আর আর্তনাদে ভরে গেল মাঠটা। উল্লসিত নাইটদের যুদ্ধ চিৎকার। ড্রাগনের তীক্ষ্ণ, কর্কশ ডাক। আতঙ্কিত জেকিলদের গোঙানি আর আর্তনাদ।

শয়তান খুদে মানবের দল তাদের বল্লম ফেলে দিল দৌড়। ওদের নেতা পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে দলের লোকদের ফেরানোর চেষ্টা করতে

লাগল। ফিরে এসে যুদ্ধ চালাতে বলল।

হাসতে হাসতে মুসার বুকে আলতো ধাক্কা দিয়ে কিশোর বলল, 'বাপরে! কি একখান লড়াই। তোমার খেলা গেমটার মত।'

এতে হাসির কি আছে বুঝতে পারল না মুসা। বলল, 'চলো, সময় থাকতে পালাই!'

উল্টো দিকে ঘুরে দৌড়ানো শুরু করল গোয়েন্দারা। সরে যেতে লাগল জেকিল, নাইট আর তাদের ড্রাগনদের কাছ থেকে। জেকিলদের অগ্নিকুণ্ড আর কুঁড়ের কাছ থেকে।

নরম মাটিতে থ্যাপ থ্যাপ পায়ের শব্দ হতে লাগল ওদের। প্রাণপণে ছুটছে। ঘাস বন পেরিয়ে চওড়া একটা মেটে ঢেলার খেত। সেটার ওপর দিয়ে ছুটল। যুদ্ধ থেকে দূরে। শয়তান জেকিলদের কাছ থেকে দূরে।

জোরে জোরে হাঁপাতে হাঁপাতে বুকের মধ্যে ব্যথা শুরু হয়েছে কিশোরের। ফিরে তাকাল সে।

কুঁড়েগুলো এখন জ্বলছে। কমলা আগুনের লকলকে শিখা উঠে যাচ্ছে আকাশপানে। রাতের বেগুনী আকাশ। মনে হচ্ছে ঘাসে ঢাকা সমস্ত সমভূমিটাতেই আগুন ধরে গেছে। দাবানলের মত।

জেকিলেরা সব গায়েব। ড্রাগনের পিঠে চড়ে মাঠময় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে নাইটেরা। উল্লাসে মাথার ওপর তরোয়াল উঁচু করে ধরে নাচাচ্ছে আর চিৎকার করছে।

'ছুটতে থাকো,' কিশোর বলল তার দুই সঙ্গীকে। ছুটতে ছুটতেই শার্টের হাতা গুটিয়ে নিল। 'থেমো না। এই নাইটগুলোকেও বিশ্বাস নেই। ওরাও আমাদের শত্রু।'

'আমাদের দেখে ফেললেই এখন সর্বনাশ,' রবিন বলল। 'তেড়ে আসবে। ড্রাগনের সঙ্গে দৌড়ে পারব না আমরা।'

'ধরা পড়লে কাম শেষ,' মুসা বলল।

আবার ফিরে তাকাল কিশোর। জ্বলন্ত কুঁড়ের আগুনের আলোয় এখনও উল্লাস করতে দেখা যাচ্ছে ড্রাগনারোহী নাইটদের। বিজয়ের আনন্দে মেতে আছে।

'লড়াইটা মোটেও ন্যায্য হলো না,' মুসা বলল। 'আমি বলতে চাইছি, একটা অসম লড়াই হলো।' বড় বড় টানে তাজা ঠাণ্ডা বাতাস যেন বুক ভরে গিলে নিল মুসা।

'মরুক না ব্যাটারা,' ক্ষোভ চাপা দিতে পারল না কিশোর। 'তাতে আমাদের কি? আমাদের তো বিষ খেতে বাধ্য করছিল ওরা।'

মনে করতেই পচা দুর্গন্ধটা যেন নাকে এসে লাগল কিশোরের।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল আবার।

কাছিমের পিঠের মত বাঁকা হয়ে নেমে গেছে এখানে সমভূমিটা।

নিচে জঙ্গল। ওখানে আবার কোন্ ভয়ঙ্কর প্রাণীরা লুকিয়ে আছে কে জানে! কিন্তু ড্রাগন আর নাইটদের হাত থেকে পালাতে হলে এখন ওদিকেই যেতে হবে।

আর কোন পথ নেই।

নেমে চলল ওরা।

'আচ্ছা, কোথায় রয়েছি আমরা, বলো তো?' চলতে চলতে রবিন বলল। 'কোন জায়গায়? কি ভাবে ঘটল এ সব? আমাদের বাড়িঘরগুলোই বা কোথায়?'

কিশোর বা মুসা কথা বলার আগেই ভারী পায়ের শব্দ হলো।

পায়ের চাপে মাটি কাঁপছে।

গুম! গুম! গুম! গুম!

রবিনের হাত ধরে টান মারল কিশোর। 'ড্রাগন আসছে! জলদি পালাও!'

গুম! গুম! গুম! গুম!

চাঁদের আলোয় দেখা গেল ড্রাগনটাকে। ওপরে কাছিমের পিঠের মত বাঁকা জায়গাটার কিনার ধরে চলেছে। হাঁটার তালে তালে দুলছে বিশাল বপু। ডানা দুটো কাঁটা বসানো কাঁধের কাছে আধখোলা, উঁচু করে রেখেছে।

ছোট ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে রইল ওরা।

লম্বা, বর্ম বসানো গলাটা বাড়িয়ে সামনে তাকিয়ে আছে ড্রাগনটা। চোয়াল বন্ধ। হাঁটার সময় ওপরে নিচে দুলছে মস্ত মাথাটা। ওটার ঘাড়ে কোন নাইটকে দেখা গেল না।

কিশোরের হাত ধরে চাপ দিল রবিন। মুসা তার গা ঘেঁষে রয়েছে। নীরবে ড্রাগনটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিনজনে। বুক কাঁপছে। সবার মনে একই প্রশ্ন।

ড্রাগনটা কি দেখে ফেলেছে ওদের?

গন্ধ পেয়েছে?

খুঁজছে ওদেরকে?

না। একই ভঙ্গিতে হেঁটে সরে যেতে লাগল ওটা। এক সময় চাঁদের আলো থেকে মুছে গেল। হারিয়ে গেল অন্ধকার দিগন্তে।

পুরো একটা মিনিট আরও চুপচাপ বসে রইল ওরা। বুকের কাঁপুনি কমার অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর নীরবতা ভাঙল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'ওটা বুনো। নাইটদের হাতে পড়েনি এখনও। পোষ মানানো হয়নি।'

'কিন্তু আমরা আছি কোথায়?' একটু আগে রবিনের করা প্রশ্নটাই মুসাও করল। 'দুঃস্বপ্নে?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'আমরা রয়েছি তাসের জগতে। তাসের খেলায়। আমাদের চরিত্র বানিয়ে খেলছে জাদুকর।'

'কাকু-কাকু তারমানে সত্যিই জাদুকর,' মুসা বলল।

'তাতে আর কোন সন্দেহ আছে এখন?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মুসা বলল, 'কিন্তু আমরা এখন কি করব? আমাদের বাড়ি ফিরে যাবার উপায় কি? আলীবাবার পাহাড়ের গুহা খোলার মত কোন জাদুই শব্দ ব্যবহার করব নাকি? সিসেম ফাঁক! সিসেম ফাঁক!'

'সিসেম ফাঁক!' মুসার দিকে তাকাল কিশোর। চিন্তিত মনে হচ্ছে ওকে। 'উঁহু। ওরকম মন্ত্রে কাজ হবে না...'

'তাহলে কিসে হবে?' অস্থির হয়ে উঠেছে মুসা। 'কিশোর, কিছু একটা করো।

ইস্, কোন কুক্ষণে যে সেদিন কাকু-কাকুর বাড়িতে জিনিস বিক্রি করা দেখতে গিয়েছিলাম…'

'ফিরে যেতে হলে আবার তাসগুলো প্রয়োজন হবে আমাদের,' মুসার কথায় কান নেই কিশোরের। 'ওগুলো সব একসাথে করে বাক্সে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই আবার তাসের জগৎ থেকে বেরিয়ে যাব আমরা।'

'কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তাসগুলো?' মুসার প্রশ্ন।

চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে ঘাসের মাঠটা। বাতাস বাড়ছে। ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা।

'জাদুকরের বাড়ির মেঝেতে নিশ্চয় পড়ে আছে এখন,' শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

দমে গেল মুসা। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'তাহলে আর পাব কি করে!'

'চলো, হাঁটা শুরু করি,' রবিন বলল। 'কোন না কোন শহর পেয়েই যাব। কোথাও না কোথাও একটা ফোনও পাওয়া যাবে।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'ব্যাপারটা দেখছি এখনও পুরোপুরি বোধের মধ্যেই যায়নি তোমাদের। ফোন নেই এখানে। শহরও পাবে না। মধ্যযুগীয় কোন একটা সময়ে প্রবেশ করেছি আমরা। কিংবা রূপকথার জগতে। যেখানে ড্রাগন, নাইট আর এলফের মত প্রাণীদের রাজত্ব।'

চাঁদের আলোয় মুসা আর রবিন দুজনের চোখেই অস্বস্তি দেখতে পেল সে।

'তবে,' কিশোর বলল, 'এ থেকে বেরোতে আমাদের হবেই। কোন না কোন উপায় একটা বের করতে হবে। তাসের এই গেমের মধ্যে থেকে গেলে মৃত্যু অবধারিত।'

'কিন্তু সেই উপায়টা কি?' মুসা বলল, 'এখানে এ ভাবে বসে বসে ভাবতে থাকলেই কি চলবে? বাড়ি আর কোনদিন পৌছানো হবে না তাহলে।'

'তা বটে,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ে কাঁটা দিল তার। মাটিতে কাঁপুনি তুলে থপ্ থপ্ করে হেঁটে যাওয়া ড্রাগনটার কথা ভাবল সে। কেঁপে উঠল আরেকবার।

'একটাকে যখন দেখলাম, নিশ্চয় বুনো ড্রাগন আরও আছে। রাতের বেলা এ পথে চলাফেরা করে ওরা।'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, বুনো এই দৈত্যগুলোকে পোষ মানাল কি করে নাইটেরা?' রবিনের প্রশ্ন।

'হাতিকে ধরে আমরাও তো পোষ মানাই,' জবাব দিল কিশোর। 'নিশ্চয় আছে কোন কায়দা।'

নিচের উপত্যকার বনটার দিকে তাকাল সে। 'বনেই ঢুকে পড়ব না-কি?' নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন। 'হয়তো বনের মধ্যেটা এখানকার চেয়ে নিরাপদ। হয়তো রাস্তাটাস্তাও পেয়ে যেতে পারি। তাহলে লোকালয়ে পৌছানো সম্ভব হতে পারে। স্বাভাবিক মানুষদের গ্রামে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। কিছু বলল না। মুসা চুপ করে রইল।

হাঁটতে শুরু করল ওরা। আগে আগে চলেছে কিশোর।

ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে। পায়ের নিচের মাটি এত নরম, জুতো দেবে যায়। পিছলে যায়। দ্রুত এগোনো তাই কঠিন।

থামল না ওরা। এগিয়ে চলল।

কয়েক মিনিট হাঁটার পর মাটিতে কিসের ওপর যেন পা পড়ল মুসার। নিচে তাকাল। গাছের ডালের মত কি যেন।

মট করে কিছু একটা ভাঙল।

গাছের ওপর থেকে নেমে এল ভারী একটা জাল। মাথার ওপর পড়ল তিনজনের।

'ফাঁদ! ফাঁদ!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ধরা পড়ে গেলাম আমরা!'

একুশ

এত ভারী জাল যে, ভারের চোটে বসে পড়তে হলো ওদের।

ধস্তাধস্তি করে গায়ের ওপর থেকে সরানোর চেষ্টা করল। দুই হাতে অনেক কষ্টে মাথার ওপর জালটা উঁচু করে ধরল মুসা। আবার উঠে দাঁড়াতে চাইল।

কিন্তু সাংঘাতিক মোটা দড়ি। খসখসে। ধারাল শন জাতীয় কোন কিছু দিয়ে তৈরি। হাতে কেটে বসে যায়। সুবিধে করতে পারল না সে।

তিনজনে মিলে নড়ানোর চেষ্টা করেও নড়াতে পারল না।

'বাপরে বাপ!' বলে উঠল মুসা। 'কি জিনিস দিয়ে তৈরি?'

'যেটা দিয়েই হোক,' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'বেরোতে তো হবে আমাদের।'

'হ্যাঁ, চেষ্টা চালিয়ে যাও,' কিশোর বলল। 'থেমো না।'

কিন্তু বহু চেষ্টা করেও গায়ের ওপর থেকে জালটা ফেলতে পারল না ওরা। ভারী তো বটেই, তৈরিও করা হয়েছে এমন করে, যাতে নিচে পড়লে কোনমতেই ছুটতে না পারে শিকার। জালে আটকা পড়লে পাখির কেমন কষ্ট লাগে, হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল ওরা এখন।

এরপর কি ঘটবে?

ভয়ঙ্কর সব ভাবনা খেলে যাচ্ছে কিশোরের মগজে। এতই ভয়ানক, সেগুলো মুসা আর রবিনকে বলে ওদের ভয় পাওয়াতে ইচ্ছে করল না ওর।

যদি এমন হয়, জালটা পাতা হয়েছে বহুকাল আগে? কেউ আর এখন দেখতে আসে না জালে শিকার পড়ল কিনা, কি ঘটবে তাহলে?

কেউ ওদের উদ্ধার করতে আসবে না। এই জালের নিচে আটকা পড়ে থেকে না খেতে পেয়ে তিলে তিলে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় মৃত্যু ঘটবে ওদের।

আর যদি নতুন পাতা হয়ে থাকে, কে পাতল? কি ধরার জন্যে পাতল? মানুষ?

জেকিলদের আচরণের কথা মনে করে গায়ে কাঁটা দিল ওর।

পায়ের শব্দ শোনা গেল। বনতলে বিছিয়ে থাকা পাতার পুরু আস্তরণের ওপর

দিয়ে কে যেন হেঁটে আসছে। শুকনো পাতায় পা পড়ে মচমচ শব্দ হচ্ছে। বরফের মত জমে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল ওরা।

'আসছে কে যেন!' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'শত্রু না হলেই হয়,' জবাব দিল মুসা।

অদ্ভুত একটা জন্তু এসে দাঁড়াল জালটার কাছে। পুরো চেহারাটা নজরে এল। আত্মা শুকিয়ে গেল তিন গোয়েন্দার।

পরনে রোমশ চামড়ার পোশাক। মানুষের মতই দুই পায়ে হাঁটে। কালো চুলের দুই পাশে শুয়োরের কানের মত দুটো কান। ডগাটা ছুঁচাল। ওপর দিকে তোলা। মানুষের চোখ। শুয়োরের নাক। প্রায়-ঠোঁটহীন-মুখের দুই কোণ থেকে বেরিয়ে আছে ওয়ালরাসের মত লম্বা দাঁত।

'হাল্লো!' খাতির করার চেষ্টা করল মুসা। 'জাল থেকে আমাদের ছুটাতে এসেছেন?'

জালের দিকে চুপ করে তাকিয়ে আছে জীবটা। লম্বা তিন আঙুলের ডগায় বসানো জানোয়ারের মত বাঁকা নখ। লম্বা চুলের মধ্যে সেগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে মাথা চুলকাল।

'হাল্লো! ইংরেজি জানেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল আবার মুসা।

জবাবে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল জীবটা। শুয়োরের মতই। বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে এল চাপা সে-শব্দ।

'প্লীজ...' বলতে গেল আবার মুসা।

কিন্তু তীক্ষ্ণ একটা লম্বিত হেউপ হেউপ হেউপ ডাকে থেমে গেল সে।

বনের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল চার পাওয়ালা ছোট একটা জানোয়ার। বড় জীবটার পাশে এসে দাঁড়াল। বন্দিদের দেখে উত্তেজিত হয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল। জালের চারপাশ ঘিরে নেচে বেড়াতে লাগল। কালো কালো ছোট খুর দিয়ে খোঁচা মারছে জালের দড়িতে। পারলে ওপরে উঠে এসে বন্দিদের গায়েই খোঁচা মারে।

জানোয়ারটা দেখতে অনেকটা ছোট জাতের কুকুরের মত। গায়ের চামড়া লোমহীন। মানুষের চামড়ার মত। তবে অনেক বেশি মসৃণ আর চকচকে। হলুদ রঙের। কুকুরের মতই হেক্ হেক্ করে ডাকছে। হাই তোলার ভঙ্গিতে হাঁ করে এক সময় দুই সারি চিকন ধারাল দাঁত দেখিয়ে দিল।

বড় জন্তুটা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে ছোটটার মাথা চাপড়ে দিল। বোধহয় শান্ত হতে বলল। ছোট কুকুরের মত জন্তুটা চিৎকার থামিয়ে দিয়ে আদর পাওয়া বিড়ালের মত গরগর করতে লাগল।

জাল ধরে টানতে শুরু করল শুয়োর-মানব।

'আমাদের ছেড়ে দিচ্ছে!' খুশিতে চিৎকার করে উঠল মুসা।

কিন্তু ভুল করেছে সে।

বন্দিদের ছাড়ল না শুয়োর-মানব। বরং জালের মধ্যেই আটকে রেখে জাল সহ ওদের টেনে নিয়ে চলল বনের মধ্যে দিয়ে।

কোনমতেই বেরোতে পারল না গোয়েন্দারা। সাংঘাতিক শক্তি জন্তুটার

গায়ে। গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে অবলীলায় টেনে নিয়ে চলল তিন তিনজন মানুষ সহ এ রকম একটা ভারী জাল। অসহায় হয়ে জালের মধ্যে চিত হয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।

শিকার ধরা পড়লে কুকুর যা করে, ঠিক সে-রকমই করতে লাগল ছোট আকারের কুকুরে-শুয়োর কিংবা শুয়োরে-কুকুরটা। চিৎকার-চেঁচামেচি, হাঁক-ডাক লাফালাফি সবই করছে। একবার ছুটে সামনে চলে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে। জাল ঘিরে চক্কর দিতে দিতে নাচানাচি করছে।

চলার সময় ক্রমাগত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করছে শুয়োর-মানব। তার ওয়ালরাস-দাঁতের গা বেয়ে জানোয়ারের মত লালা গড়াচ্ছে। লম্বা নীল জিভ বের করে জানোয়ারের মতই চেটে নিচ্ছে সেগুলো।

জালের মধ্যে বড়ই কষ্ট হচ্ছে গোয়েন্দাদের। চিত হয়ে থেকেও আরাম পাচ্ছে না। টানার সময় প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগছে। গায়ে গায়ে বাড়ি খাচ্ছে। ব্যথা লাগছে রীতিমত।

অবশেষে থামল জন্তুটা। জাল টানা বন্ধ হলো।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। হাঁটু ডলছে মুসা। নীরবে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন।

জন্তুটা কোথায় নিয়ে এল ওদের?

লম্বা, নিচু, ধূসর রঙের একটা পাথরের বাড়ি দেখা গেল। এক মাথায় একটা দরজা। জানালা-টানালা নেই।

শুয়োর-মানবের বাড়ি?

জোরাল ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে, লম্বা দাঁত চাটতে চাটতে, বড় বাড়িটার পাশের ছোট একটা ঘরের দিকে এগিয়ে গেল জন্তুটা। সামনের একটা পাথরের দরজা খুলল।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেরিয়ে এল আগুনের শিখা।

একটা বেলচা তুলে নিল জন্তুটা। আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। খোঁচানো শুরু করল। তারপর আরও কিছু কয়লা ফেলল আগুনে।

'কিশোর, ওটা কি?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

ঢোক গিলল কিশোর। 'চুলাই তো মনে হচ্ছে।'

'খাইছে!' চমকে গেল মুসা। 'ওর মধ্যে ফেলে কাবাব বানাবে আমাদের? এ তো রাক্ষস মনে হচ্ছে! রূপকথার রাক্ষস!'

জবাব দিল না কিশোর। তাকিয়ে আছে জন্তুটার দিকে। ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে দাঁত চাটছে। চুলার কয়লা খুঁচিয়েই চলেছে। পাগল হয়ে যেন লাফালাফি করছে আগুনের শিখা।

'কি করব আমরা, কিশোর?' প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে রবিন। 'কোন একটা বুদ্ধি বের করো। জলদি! পারবে বের করতে?'

আবার ঢোক গিলল কিশোর।

'নাহ্,' শুকনো স্বরে জবাব দিল সে। 'কোন বুদ্ধিই আসছে না মাথায়।'

বাইশ

চুলায় আরও দু'তিন বেলচা কয়লা ফেলল রাক্ষসটা। লাল টকটকে কয়লার তাপ বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে বেলচাটা ছুঁড়ে ফেলল একদিকে। গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে থপ্থপ্ করে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

ওর শুয়োরের মত মুখে ক্ষুধার্ত হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। হলুদ রঙের কুকুরের মত প্রাণীটাও উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাঁপাচ্ছে। রাক্ষসটাকে ঘিরে চক্কর দিতে দিতে এগোতে লাগল জালের দিকে।

চাঁদি দপদপ করছে কিশোরের। বুকের মধ্যে ধুড়ুস ধুড়ুস করছে হৃৎপিণ্ডটা। হাজার রকম ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে মগজে। মরিয়া হয়ে বাঁচার উপায় খুঁজছে।

'জালটা এখন তুলবে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'তোলার সঙ্গে সঙ্গে দৌড় মারবে। একসঙ্গে তিনজনকে ধরতে পারবে না রাক্ষসটা।'

কিন্তু ভুল করেছে কিশোর। জন্তুটাকে এতটা বোকা ভাবা ঠিক হয়নি। জাল থেকে ওদের বের করল না সে। জাল সহই ওদের নিয়ে চলল চুলার কাছে। প্রচণ্ড আগুনের হলকা এসে লাগল চোখে মুখে। পুড়ে যাবে মনে হলো চামড়া। আগুনের তপ্ত উজ্জ্বলতা সইতে না পেরে চোখ বন্ধ করে ফেলল কিশোর।

টের পেল ধীরে ধীরে মাথার ওপর থেকে সরে যাচ্ছে জাল। চোখ মেলল সে। প্রায় বেরিয়ে পড়েছে রবিন আর মুসা। আরেকটু সরল জাল। কিশোরও বেরিয়ে পড়ল। খপ করে ওকে আর মুসাকে চেপে ধরল রাক্ষসটা। ভাবল বোধহয়, সবচেয়ে বড় শরীরের দুটোকেই আটকে রাখবে। অন্যটা পালালে পালাক।

ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করতে লাগল মুসা। কিন্তু সাংঘাতিক শক্তিশালী রাক্ষসের হাত থেকে মুক্ত করতে পারল না নিজেকে।

'না না, প্লীজ!' চেঁচানো শুরু করল মুসা। 'দোহাই তোমার, শুয়োর-রাক্ষস, আমাদের ছেড়ে দাও। আমাদের মাংস ভাল না। মোটেও পছন্দ হবে না তোমার।'

হ্যাঁচকা টান মেরে চুলার আরও কাছে ওদেরকে নিয়ে গেল রাক্ষসটা।

'থামো! থামো!' চেঁচিয়েই চলেছে মুসা।

জবাবে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে লাগল রাক্ষসটা। শুয়োরের চেহারার মুখটায় কোন রকম আবেগ লক্ষ করা গেল না।

চুলার মুখ দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেরোচ্ছে আগুনের শিখা। চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে আঁচ। তবে রাক্ষসটার কিছু হচ্ছে বলে মনে হলো না।

অবলীলায় দুই হাতে দুজনকে ধরে উঁচু করে ফেলল রাক্ষসটা। নিয়ে চলল চুলার মুখের কাছে।

প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে নাচানাচি ও চিৎকারের পরিমাণ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে কুকুরে প্রাণীটা। একবার আগে যাচ্ছে, একবার পেছনে, আবার আগে।

পেছন থেকে হঠাৎ কঁই কুঁই করে উঠল ওটা। স্বর বদলে গেছে। ভীত

কণ্ঠস্বর।

রাক্ষসের হাতে ঝুলতে ঝুলতেই ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর। দেখল, ঘাড় ধরে কুকুরটাকে উঁচু করে ফেলেছে রবিন। সোজা নিয়ে গেল চুলার মুখের কাছে। আগুনে ফেলে দেয়ার ভঙ্গি করল।

থমকে গেল রাক্ষসটা। গোটা দুই খাটোমত ঘোঁৎ-ঘোঁতানি বেরোল মুখ দিয়ে।

প্রথমে কিশোরকে মাটিতে নামাল রাক্ষসটা। তারপর মুসাকেও নামাল। কিন্তু হাত ছাড়ল না।

উত্তেজনা চলে গেছে কুকুরটার। আতঙ্কে কোঁ-কোঁ করছে। বুঝে গেছে রবিনের উদ্দেশ্য।

'ছাড়ো ওদের, রাক্ষস কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'নইলে দিলাম এটাকে আগুনে ফেলে!'

দাঁড়িয়েই রইল রাক্ষসটা। ইতস্তত করছে।

ওর দুর্বলতাটা বুঝে গিয়ে আরও জোরে চিৎকার করে উঠল রবিন, 'ছাড়লে না এখনও!' কুকুরটাকে চুলার একেবারে মুখের কাছে নিয়ে গেল সে। তার নিজের দেহেও যে ভয়াবহ আঁচ লাগছে, কেয়ারই করল না সেটাকে।

আতঙ্কে ত্রাহি চিৎকার শুরু করেছে কুকুরটা। খানিক আগে মুসা যে ভাবে শরীর মুচড়ে রাক্ষসের হাত থেকে ছুটতে চাইছিল, কুকুরটা করছে এখন সেরকম।

'ভাল চাও তো ছাড়ো!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

রাক্ষসটা ওর ভাষা বুঝল কিনা বোঝা গেল না। তবে উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। অবশেষে ছেড়ে দিল কিশোর আর মুসাকে। ওর কালো চোখে ভয় মেশানো আক্রোশ।

'সরো এখন!' বলার সঙ্গে হাত দিয়েও ইশারা করল রবিন। কুকুরটাকে ধরে রেখেছে চুলার মুখের কাছে।

বোঝা গেল, খাবারের চেয়ে কুকুরটার প্রাণ রাক্ষসটার কাছে বেশি প্রিয়। পিছিয়ে যেতে শুরু করল সে।

'কিশোর, দৌড় মারো!' রবিন বলল। 'কুকুরটাকে আগুনে ফেলে দেয়ার ভয়ে আমাদের কিছু করবে না সে।'

দ্বিধা করছে কিশোর।

'দেরি করছ কেন? যাও। কুকুরটাকে ছাড়ব না আমি, যতক্ষণ না নিরাপদ হতে পারছি।...দৌড়াও।'

আর দেরি করল না কিশোর। মুসাকে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। হতাশ ভঙ্গিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে রাক্ষসটা।

কুকুরটাকে শক্ত হাতে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল রবিন। রাক্ষসটাকে হুমকি দিল, 'নড়বে না, খবরদার! নড়লেই আগুনে ফেলব!' যা বলল, সেটা ইশারাতে বুঝিয়ে দিল সে।

নড়ল না রাক্ষসটা। জোরে হতাশার নিঃশ্বাস ফেলল। পরাজিত ভঙ্গিতে ঝুলে পড়ল তার কাঁধ।

পিছাতে শুরু করল রবিন। সরে যেতে লাগল চুলার কাছ থেকে।

এগিয়ে আসার জন্যে পা বাড়াতে গেল রাক্ষসটা।

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটার গলায় হাত রেখে গলা টিপে মারার ভয় দেখাল রবিন। থেমে গেল রাক্ষসটা।

কুকুরটাকে নিয়েই দৌড় মারল রবিন। বনের কিনারে এসে ফিরে তাকিয়ে দেখল, অসহায় ভঙ্গিতে আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে রাক্ষসটা। পোষা প্রাণীটাকে সাংঘাতিক ভালবাসে সে। ক্ষতির আশংকায় সামান্যতম নড়াচড়া করছে না।

বনের কিনারে এনে কুকুরটাকে মাটিতে নামিয়ে রাখল রবিন। তারপর এক ছুটে ঢুকে গেল বনের মধ্যে। কিশোর আর মুসাকে দেখতে পেল। তার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

রবিনকে দেখার পর একটা সেকেন্ডও আর দেরি করল না ওরা। ছুটতে শুরু করল বনের মধ্যে দিয়ে।

পেছন ফিরে তাকাল না আর কেউ। রাক্ষসটা আসছে কিনা, সেটাও দেখতে চাইল না। এত জোরে জীবনে দৌড়ায়নি ওরা।

ছুটতে ছুটতে দম আটকে আসতে চাইল ওদের। পা ব্যথা করছে। দৃষ্টি ঘোলা হয়ে আসছে। কিন্তু তার পরেও থামল না। ছোটা…ছোটা…ছোটা…

বনের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। সামনে পাহাড়ের ঢাল। ঢালে জন্মে আছে ভুট্টা গাছের মত এক ধরনের গাছ। চাঁদের আলোয় বেড়ার মত লাগছে সামনের সারির গাছগুলোকে।

'ওর মধ্যে লুকাতে পারব আমরা!' আশা হলো রবিনের।

মাথা নিচু করে প্রায় ডাইভ দিয়ে গাছগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা। শুকনো খড়খড়ে গাছ। কখনও দু'হাতে ফাঁক করে, কখনও কাঁধ দিয়ে ঠেলা মেরে সরিয়ে সরিয়ে এগিয়ে চলল। শুকনো পাতা জুতোর চাপে মচমচ করছে।

গাছগুলো অনেক উঁচু। মাথা ঢেকে দিচ্ছে। তবে খচমচ, খসখস নানা রকম শব্দ করেই চলেছে। এগোনোর সময় ঠেলা লেগে বাঁকা হয়ে গিয়ে আগা নুইয়ে ফেলছে।

মিনিটখানেক পর থেমে গেল কিশোর। এত জোরে হাঁপাচ্ছে, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। দম নেয়ার জন্যে।

চারপাশে লম্বা গাছগুলো বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। পাতা খসখস করছে।

'এখানে আমরা নিরাপদ,' মৃদু স্বরে বলল রবিন। 'অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও। কি বলো, কিশোর?'

'হ্যাঁ,' ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল কিশোর। 'কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।'

'কিন্তু এত লম্বা ভুট্টা গাছ আমি আর দেখিনি,' মুসা বলল। 'এত মোটা আর…'

কথা শেষ না করেই থেমে গেল সে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওর সামনের একটা গাছের বাকল খুলে যেতে শুরু করেছে।

দ্রুত নড়াচড়া চোখে পড়ল তার।

একটা হাত!

বাকলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা লিকলিকে হাত। কার্টুন ছবির মত।

আশপাশের অন্য গাছগুলোও খড়মড় ক্যাঁচক্যাঁচ করে বিচিত্র শব্দ করছে। জ্যান্ত প্রাণীর মত দুলতে শুরু করেছে।

তারপর সেগুলোরও বাকল খুলে যেতে লাগল। লম্বা কাঠির মত চকচকে মসৃণ দেহগুলো বেরোতে থাকল গাছের ভেতর থেকে।

ডজন ডজন সরু সরু নীরব প্রাণী। সবুজ মসৃণ মাথা। কোন চেহারা নেই। মুখ নেই। পাতায় মোড়া সবুজ সবুজ মাথা। ভুট্টার মোচার মত।

ডজন ডজন!

ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে করে খুলতেই আছে গাছের দল। বেদম দুলছে আর ঝাঁকি খাচ্ছে ভেতরের কাঠি-প্রাণীগুলো বেরিয়ে আসার সময়।

মসৃণ হাতগুলো বাড়িয়ে দিচ্ছে। রবারের মত লম্বা হচ্ছে। ওদেরকে পেঁচিয়ে ধরতে শুরু করল সে-সব হাত। শক্ত হতে লাগল চাপ···

শক্ত···

'স্টেল্ক্!' আচমকা চিৎকার করে উঠল রবিন। তাসের গায়ে আঁকা দেখেছিল এগুলোর ছবি। তাসের পিঠে নাম লেখা ছিল।

'আমি···আমি মনে করতে পারছি না,' মুসা বলল। কথা বেরোতে চাইছে না ঠিকমত। গলা চিপে ধরা হয়েছে যেন তার।

কিশোরেরও বুক পেঁচিয়ে ধরছে হাতগুলো। জীবন্ত আঙুর লতার মত। গলা পেঁচাচ্ছে। শক্ত হচ্ছে চাপ।

'দম নিতে পারছি না আমি···' হাঁসফাঁস শুরু করল কিশোর। 'দম নিতে পারছি না···'

শরীর মুচড়ে মুচড়ে ছাড়ানোর চেষ্টা শুরু করল মুসা। লাথি মারতে লাগল।

কিন্তু শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখল ওদেরকে অদ্ভুত প্রাণীগুলো।

অনেক বেশি। সংখ্যায় অনেক বেশি ওগুলো।

আরও, আরও গাছ খুলতেই আছে। শ'য়ে শ'য়ে! হাজারে হাজারে! বেরিয়ে আসছে একের পর এক লতানো কাঠি-প্রাণী, স্টেল্ক্।

'কি করব আমরা এখন?' কোনমতে বলল রবিন। শ্বাস নিতে পারছে না। গলার মধ্যে ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে। 'কি করব···!'

'ঝাড়া মারো! ঝাড়া মারো!' চিৎকার করে বলল মুসা। ঝাড়া, খামচি, লাথি, চড়-থাপ্পড় যখন যেটা পারছে মেরে চলেছে সে। স্টেল্ক্রা মাংসাশী, বুঝে গেছে সেটা। বেরোতে না পারলে শ্বাসরোধ করে মারবে ওদের।

বহু কষ্টে স্টেল্ক্দের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করে ভুট্টা খেতের কিনারে বেরিয়ে এল ওরা। পাথরের মত স্থির হয়ে গেল মুহূর্তে।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা সেনাবাহিনী। ক্রেল। শত শত। ঘোড়ার পিঠে আসীন। কারও হাতে বল্লম। কারও তরোয়াল।

তেইশ

সবার আগে নড়ে উঠল কিশোর। ঘুরে আবার দৌড় দিতে গেল ভুট্টা খেতের দিকে। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে।

চোখের পলকে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল ডজনখানেক ক্রেল। সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। তরোয়াল ধরল বুকের ওপর।

'নাহ্, আর পারা গেল না!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল মুসা। 'কোন জাদুকরের বাপও এসে এখন আর বাঁচাতে পারবে না আমাদের!'

একটা মাঠের ওপর দিয়ে ওদেরকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ক্রেলেরা। ডজনখানেক সৈন্য ঘিরে রেখে এগোচ্ছে। কারও হাতে তরোয়াল, কারও হাতে বল্লম। বাকি সৈন্যরা ঘোড়ার পিঠে চেপে পেছন পেছন আসছে।

ধূসর মেঘের চাদরের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। আরও ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে রাতের বাতাস। আরও ভেজা। কাদামাটিতে পিছলে যাচ্ছে বন্দিদের জুতো।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে হেঁটেই চলল ওরা। পা আর চলছে না। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ। কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে নেমে ঢুকে যাচ্ছে চোখের ভেতর।

হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা আমাদের? এবার কি করবে? কেটেকুটে শিক কাবাব বানাবে?'

'জানি না,' জবাব দিতেও আর ইচ্ছে করছে না কিশোরের।

'অনন্তকাল ধরে যেন কেবল হাঁটতেই থাকব আমরা!' মুসা বলল।

শেষ হলো মাঠ। বনে ঢুকল ওরা। লতানো উদ্ভিদে ভরা ঘন জঙ্গল। কাঁটা ঝোপেরও অভাব নেই। সরু, আঁকাবাঁকা একটা রাস্তা চলে গেছে কাঁটা ঝোপগুলোর মাঝখান দিয়ে। হাঁটতে গেলে খোঁচা লাগে। ওদেরকে সেই পথ ধরে হাঁটতে বাধ্য করল ক্রেলেরা।

বন থেকে বেরোল এক সময়। সরু সেই পথ ধরে কাদায় ভরা একটা ঢালু জায়গা দিয়ে ওদের নিয়ে চলল ক্রেলেরা।

পেছন পেছন আসতে আসতে সুর করে গেয়ে উঠল, 'মুক্তি নেই...মুক্তি নেই...মুক্তি নেই...'

ঢোক গিলল কিশোর। পানির অভাবে খসখসে হয়ে যাওয়া কণ্ঠনালী ব্যথা করে উঠল। এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পিঠে এসে লাগল বল্লমের খোঁচা।

সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করেও আবার পা ফেলতে বাধ্য হলো সে।

'মুক্তি নেই...মুক্তি নেই...মুক্তি নেই...' কুৎসিত সুরে জঘন্য গানটা গেয়েই চলল ক্রেলেরা। শুধু এই দুটো শব্দই।

উপত্যকা পেরিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে আবার ওপরে উঠতে শুরু করল ঢাল।

খাড়াই বেয়ে ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে অবশেষে চূড়ায় এসে শেষ হলো।

উঁচু চূড়াটায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। অনেক নিচে মাঠটা চোখে পড়ছে।

তরোয়াল তুলল ক্রেলেরা। এগিয়ে যেতে ইশারা করল বন্দিদের।

'আমাদেরকে চূড়া থেকে ফেলে দিতে চায়!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ফিরে তাকাল ক্রেলদের দিকে। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'কেন আমাদের ফেলতে চাইছেন? কি করেছি আমরা? ছেড়ে দিন আমাদেরকে। লড়াই করতে আসিনি আমরা।'

'মুক্তি নেই...মুক্তি নেই...মুক্তি নেই...'

তরোয়াল তুলে এগিয়ে এল কয়েকজন ক্রেল।

এগোতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা।

চলে এল একেবারে চূড়ার কিনারে।

কিশোর আর রবিনের হাত চেপে ধরল মুসা। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'গুড বাই, বন্ধুরা। অনেক কাল একসঙ্গে কাটিয়েছি আমরা। কত আনন্দ করেছি। সব শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন। গুড বাই!'

দুই হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে লাফ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো সে।

স্থির হয়ে গেল হঠাৎ।

ধীরে ধীরে এক পকেট থেকে বের করে আনল হাতটা।

একটা তাস।

মনে পড়ল, তাসটা বাক্স থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেলে তুলে নিয়েছিল সে। মনের ভুলে পকেটে রেখে দিয়েছিল।

চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'থামো থামো! একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়!'

চব্বিশ

ফিরে তাকাল মুসা। অবাক। 'মানে!'

হাত বাড়াল কিশোর। 'দেখি, তাসটা দাও আমার হাতে।'

'কি করবে?'

'তর্ক কোরো না! আহ্, জলদি করো!' মুসা দেয়ার আগেই সেটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল কিশোর।

'মুক্তি নেই...মুক্তি নেই...মুক্তি নেই...'

ঘোড়ার পিঠে বসা ক্রেলেরা গান গাইছে।

মাটিতে দাঁড়ানো ক্রেলেরা চলে এল বন্দিদের কয়েক ইঞ্চির মধ্যে। শীতল, নিষ্ঠুর দৃষ্টি। তরোয়াল তুলে খোঁচা মারার ভঙ্গি করল।

তাসটা নিয়ে নিল কিশোর। পিঠে আঁকা জাদুকরের ছবিটা দেখল।

কাকু-কাকুর ছবি।

'কি করবে ওটা দিয়ে?' রবিনের প্রশ্ন। 'ওটা কি ভাবে বাঁচাবে আমাদের?'

'দাও ছুঁড়ে ফেলে!' জাদুকরের ওপর প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসে উঠল মুসা। কাকু-কাকুকে সামনে পেলে এখন ওকেই ছুঁড়ে ফেলত পাহাড় থেকে।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ছুঁড়ে ফেললে লাভ হবে না। ছিঁড়ে ফেলতে হবে। জাদুর মায়া কাটবে হয়তো তাতে।'

তাসটা সোজা করে ধরল কিশোর। ছিঁড়তে যাবে, আচমকা দমকা বাতাসে তাসটা টান দিয়ে কেড়ে নিল ওর হাত থেকে। ছুঁড়ে ফেলল চূড়ার কিনার দিয়ে।

নিজের অজান্তেই প্রচণ্ড চিৎকার বেরিয়ে এল কিশোরের কণ্ঠ চিরে।

ওদের আশা···একমাত্র আশা···বাতাসে ভাসতে ভাসতে পড়ে যাচ্ছে নিচে। চূড়ার কিনার দিয়ে।

কোন রকম ভাবনা চিন্তা না করে ঝাঁপ দিল কিশোর।

থাবা মারল তাসটাকে ধরার জন্যে।

মিস করল।

মাথা নিচু করে পড়তে শুরু করেছে সে।

ওপরে মুসা আর রবিনের হাহাকার শোনা গেল। ক্রেলেরাও চেঁচাচ্ছে। আনন্দে। উত্তেজনায়।

উড়ে চলেছে যেন কিশোর।

মরিয়া হয়ে থাবা মারল আবার।

ধরে ফেলল তাসটা।

ফড়াৎ করে এক টান মেরে ছিঁড়ে ফেলল।

মাথা নিচু করে তীব্র গতিতে উপত্যকার দিকে উড়ে চলেছে তখন সে।

প্রচণ্ড আক্রোশে তাসটাকে টুকরো টুকরো করতে লাগল।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল, ভয়ঙ্কর গতিতে মাটি ছুটে আসছে তার দিকে।

তারপর হঠাৎ করেই সব অন্ধকার।

এত অন্ধকার···

গম্ভীর নীরবতা···

সেই সাথে ঠাণ্ডা।

কাজ কি হলো! ভাবল সে।

তাস ছিঁড়ে ফেলাতে কি কাটল জাদুর মোহ?

বাড়ি ফিরতে পারল?

নাকি সত্যি সত্যি মৃত্যু ঘটেছে এবার?

পঁচিশ

ধীরে ধীরে কেটে গেল অন্ধকার।

গাড়ির শব্দ কানে এল।

স্পষ্ট হয়ে উঠল দিনের আলো।
বার কয়েক চোখ মিটমিট করে ফিরে তাকাল সে।
তার দুই পাশে একই রকম ভাবে বিমূঢ় ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখল মুসা আর রবিনকে।
আস্তে আস্তে কেটে গেল ঘোর।
দেখল, কাকু-কাকুর বাড়ির সামনের লনে পড়ে আছে ওরা।
বোঝার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। দৌড় দিল গেটের দিকে।
'আরে কোথায় যাচ্ছ? শোনো! শোনো!' পেছন থেকে ডাক দিল কিশোর।
ফিরেও তাকাল না মুসা। ছুটতে ছুটতেই জবাব দিল, 'আর একটা সেকেন্ডও আমি এখানে থাকব না। বাপরে বাপ! এবার নিশ্চয় ডাইনোসরের রাজত্বে পাঠাবে!'
কথাটা সাবধান করে দিল কিশোর আর রবিনকেও। ওরাও উঠে দৌড় দিল মুসার পেছন পেছন। জাদুকরের সীমানা থেকে পালিয়ে যেতে চায়।
গেটের কাছে গিয়ে কি ভেবে ফিরে তাকাল কিশোর।
কাকু-কাকুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সামনের দরজায়।
মিটিমিটি হাসছে।
প্রচণ্ড রাগ হলো কিশোরের। দাঁড়িয়ে গেল যেন হোঁচট খেয়ে।
তার গায়ে ধাক্কা খেল রবিন। 'কি হলো?'
'ওই লোকটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আছে আমার!' শীতল কণ্ঠে বলল কিশোর।
'পাগল হয়েছ!'
জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। কাকু-কাকুর সঙ্গে কথা বলতে যাবেই।
খপ করে তার হাত চেপে ধরল রবিন। হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, 'পরে। এখন বাড়ি চলো। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে শান্ত হই। তারপর আমিও আসব তোমার সঙ্গে। আসলেই। এত সহজে ছেড়ে দেয়া যায় না ওকে।'
একটু দূরে দাঁড়িয়ে গেছে মুসাও। 'রবিন ঠিকই বলেছে। চলো, আগে বাড়ি চলো। আরও একজনেরও হিসেব নিতে হবে আমাদের। লীলা রেডরোজ। ওকেও ছাড়ব না আমি। খুঁজে বের করবই। ওর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করাটা বাকি রয়ে গেছে।'
ঢিল হয়ে এল কিশোরের দেহ। মাথা ঝাঁকাল। 'বেশ। চলো। আগে বাড়িতেই যাই।'

***

খেলনা ভালুক

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

গোবেল বীচ গাঁয়ের পথ ধরে সাইকেল চালাচ্ছে জিনা। পাশে তার বন্ধুরা, কিশোর, মুসা আর রবিন। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ডিসেম্বরের ২৩ তারিখে এ রকম হবেই। চকচক করছে তার চোখ। ঠাণ্ডা আবহাওয়া খারাপ লাগে না তার, যদি দিনটা হয় মেঘমুক্ত, উজ্জ্বল। অন্যদেরও খারাপ লাগছে না। গান গাইছে চারজনেই। কেউ গলা ফাটিয়ে, কেউ গুনগুন করে।

চারটে সাইকেলের পাশে দৌড়াচ্ছে রাফি, গা আর পায়ের পাতা গরম করার চেষ্টা করছে। পাঁচজনের মধ্যে এই একটি চরিত্র, যার ভাল লাগছে না এই আবহাওয়া। কান চেপে রেখেছে মাথার সঙ্গে। কারণ মাথা গরম রাখার আর কোন ব্যবস্থা নেই তার। উলের গরম টুপি নেই মানুষের মত। ঘরে থাকলে অবশ্য এই কষ্টটা করতে হত না, তবে সেটা চায় না সে। জিনাকে ফেলে একলা থাকতে ভাল লাগে না তার। মাঝে মাঝে হেঁড়ে গলায় ডেকে উঠছে ঘাউ ঘাউ করে। তাতে গানের সঙ্গে সঙ্গত হচ্ছে না, বরং বেসুরো বেতাল করে দিচ্ছে।

রাস্তার শেষ মোড়টা পেরোতেই চোখে পড়ল সামনে গোবেল বীচ গির্জার উঁচু স্তম্ভ।

'এসে গেছি,' খুশি খুশি গলায় বলল জিনা। 'দেখো, গ্রামটাকে কি রকম বদলে দিয়েছে বড় দিনের উৎসব।'

গাঁয়ের সবচেয়ে বড় দোকান গোবেল বীচ স্টোর। সেটার সামনে আসার আগে সাইকেল থেকে নামল না ওরা। নানা রকম জিনিস বিক্রি হয় দোকানটায়। জানালার কাছে শো-কেসে অসংখ্য খেলনা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আর রয়েছে উপহারের বিভিন্ন সামগ্রী। থাকবেই। কারণ আজ হলোগে ক্রিসমাস ইভের আগের দিন।

ইস্কুল ছুটি। গোবেল বীচে, জিনাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। জিনার আব্বা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জনাথন পারকার আর জিনার আম্মা মিসেস ক্যারোলিন, তিন গোয়েন্দার কেরিআন্টি, ভীষণ আদর করেন ওদের। এখানে এলে একেবারে ঘরোয়া পরিবেশ পেয়ে যায় ওরা। তার ওপর লেখাপড়ার চাপ না থাকলে তো কথাই নেই। তাই ছুটি কাটানোর কথা ভাবলে প্রথমেই মনে চলে আসে 'গোবেল ভিলা'র কথা। এটা হলো জিনাদের বাড়ির নাম। সত্যিই যেন চিরবসন্ত বিরাজ করে এই বাড়িটাতে। এখানে যেন শুধুই সুখ, দুঃখ নেই। বাড়িটা অনেক বড়। বহু বছরের পুরানো। কিনে সংস্কার করে নিয়েছেন জিনার আব্বা।

সেদিন সকালে ছেলেমেয়েদেরকে ডেকে বাজার করে আনতে বললেন কেরিআন্টি। সে-জন্যেই বেরিয়েছে ওরা।

'এই দেখো!' প্রায় চিৎকার করে উঠল রবিন। জানালার কাঁচে নাক ঠেসে ধরেছে। 'দারুণ সুন্দর, না? ওই যে ওই জেট প্লেনটা? আর ওই যে ওই ইলেকট্রিক

ট্রেন, কি বিশাল! আর…কিন্তু আন্টিকে তো এগুলো উপহার দিতে পারব না…'

জিনা আর মুসাও জানালার কাঁচে নাক চেপে ধরে খেলনা দেখছে।

'হ্যাঁ, ভাল ভাল খেলনা আছে,' একমত হলো মুসা। 'আর ওই যে সাইকেলগুলো দেখো। কি সুন্দর! কোন্ কোম্পানির বুঝতে পারছি না। ওরকম একটা সাইকেল পেলে চুটিয়ে চালাতে পারতাম, যেখানে খুশি যেতে পারতাম। ভাড়া করা সাইকেল দিয়ে কি আর মজা হয়।'

'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলনা আর সাইকেল দেখলে কাজ হবে না,' তাগাদা দিল কিশোর। 'জিনিসপত্রগুলো কিনে ফেলা দরকার। আন্টি নিশ্চয় বসে আছেন। তাড়াতাড়ি যেতে বলে দিয়েছেন মনে নেই?'

ঠেলে দোকানের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে। পেছনে ঢুকল অন্য তিনজন। ভেতরে উজ্জ্বল আলো। আর বেশ গরম। সব কিছুতেই কেমন যেন একটা উৎসব উৎসব গন্ধ। বাজারের তালিকা নিয়ে কাউন্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

জিনিসপত্র বের করে সাজিয়ে গুছিয়ে প্যাকেট করে ব্যাগে ভরে দিল সেলসম্যান। হিসেব মিলিয়ে দাম মিটিয়ে দিল কিশোর। বেরোনোর আগে আরেকবার ঘুরে ঘুরে দেখল রবিন আর জিনা। অনেক চমৎকার জিনিস রয়েছে, দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে।

দোকানের একজন কর্মচারী এককোণে একটা মলাটের বড় বাক্স খুলছে। বয়েসে তরুণ। নাম ডিক, তাকে চেনে জিনা। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন?'

মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল লোকটা। বলল, 'আরে, তুমি। ওরা কারা? বন্ধু বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'তা বন্ধুদের নিয়ে চলে এসো না আমাদের বাড়িতে। বড়দিনের দাওয়াত।'

'আরও অনেক দাওয়াত পেয়েছি,' হেসে বলল জিনা। 'দেখি, চেষ্টা করব যাওয়ার। থ্যাংক ইউ।'

বাক্সটা খোলা শেষ করল ডিক। ইতিমধ্যে মুসা আর কিশোরও এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। 'এ-হপ্তায় সাংঘাতিক বিক্রি হচ্ছে,' তরুণ কর্মচারী জানাল। 'বিশেষ করে ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর জিনিসপত্র। লোকের কাণ্ড! কিনতেই যখন হবে আগে কিনলেই হয়ে যায়। অনেক ঝামেলা বেঁচে যায়। দামেও সস্তা পায়। তা না। কিনবে তো কিনবে, একেবারে শেষ মুহূর্তে। তবে লোকের দোষও একতরফা ভাবে দেয়া যায় না। কোম্পানিগুলোরও দোষ আছে, যারা বানায়। আরে বাবা আরেকটু আগে বানিয়ে দিলে কি এমন ক্ষতি হয়? দিলি তো দিলি, সেই পনেরো দিন পর। পনেরো দিন ধরে বসে আছি এই ভালুকগুলোর জন্যে।'

বড় বাক্সের ভেতর থেকে ছোট একটা বাক্স বের করল সে। ভেতরে আরও দুটো ওরকম বাক্স রয়েছে। একটা বাক্সের ডালা খুলে দেখাল ছেলেমেয়েদেরকে। ভেতরে অনেকগুলো ছোট ছোট খেলনা ভালুক সাজানো রয়েছে। বিভিন্ন রঙের। গাঢ় লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, সাদা, বেগুনি আর কমলা।

'আরে, দারুণ তো!' রবিন বলল। 'এগুলো অবশ্য উপহার দেয়া যায়।

কেরিআন্টি সাজিয়ে রাখতে পারবেন।'

'ক্রিসমাস ট্রি ভালুক দিয়ে সাজাতে দেখিনি আর কখনও!' অবাক হয়ে বলল কিশোর।

'আসলে,' ডিক বলল। 'ট্রি সাজানোর জন্যে নয় এগুলো। ম্যাসকট হিসেবে ব্যবহার হয়। গাড়ির মধ্যে ঝুলিয়ে রাখে না লোকে, ওরকম। এই কিছুদিন আগেও এ রকম খেলনা ঝোলানোর ধুম পড়ে গিয়েছিল। এখন একটু কমে এসেছে। তবে এ রকম ভালুক জনপ্রিয় হয়ে গেছে বেশ, বিশেষ করে এদিকটায়। তাই আমার বস্ মিস্টার ফোকসন বেশি করে অর্ডার দিয়েছেন এবার। মনে করছেন বড়দিনের সময় বেশি বিক্রি হবে। লোকের তো ঠিকঠিকানা নেই, হয়তো ট্রিতেও নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দিতে পারে।'

'কিন্তু দিল তো অনেক দেরি করে,' জিনা বলল। 'লোকের কি আর কেনার সময় আছে? কেনাকাটা যা করার করে ফেলেছে। কালকের আগে বেচে শেষ করতে পারবেন বলে মনে হয় না। অনেক আছে।'

'তিন ডজন। একেক বাক্সে এক ডজন করে,' জানাল ডিক। 'অত ভাবনা নেই। আগে না হলেও পরে হবে। সুন্দর জিনিস। লোকে কিনবেই। বারোটার অর্ডার ইতিমধ্যেই এসে গেছে,' হাসল সে। 'মিস্টার মরিস দিয়েছেন। তার মানে বারোটা বিক্রি হয়ে গেছে ধরে রাখা যায়। তাঁর মেয়ে পলি বন্ধুদের নিয়ে একটা পার্টি দেবে। সে-জন্যেই কিনছে। ক্রিসমাস পার্টি। ক্রিসমাস ট্রিতে লাগাবে এই ভালুক। যাই, ফোন করিগে তাঁকে। এসেছে যে খবরটা দিই।'

জিনা হাসল। 'হ্যাঁ, পলি যে পার্টি দিচ্ছে জানি। আমাদেরকেও দাওয়াত করেছে। যাই বলেন, ভালুকগুলো কিন্তু সুন্দর। ট্রিতে ঝোলালে ভালই লাগবে। অন্যান্য সাজ আর আলোতে একেবারে ঝলমল করবে, যা সুন্দর রঙ!'

নীল রঙের একটা ভালুক হাতে নিয়ে দেখতে লাগল রবিন। বাদামী কাঁচের চোখ যেন জ্যান্ত হয়ে আছে ওটার। ঝিক্ করে উঠছে আলো লাগলেই। নরম মখমলের শরীর। আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'বাহ্, খুব মিষ্টি!'

তার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। বলল, 'নিয়ে নাও। কেরিআন্টির পছন্দ হবে।'

ভালুকটার দাম মিটিয়ে দিচ্ছে রবিন, এই সময় দোকানের একধারে ডন নামে একজনকে ডাকল কেউ।

'কমে গেল একটা,' হাতের বাক্সটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল ডিক। 'মিস্টার মরিসকে বারোটা পুরো করে দিতে হলে আরেকটা বাক্স খুলতে হবে। থাক এখন। খোলার সময় নেই। পরে।'

'আমরা খুলে দেব?' সাহায্য করতে চাইল জিনা।

'না, না, লাগবে না। থ্যাংক ইউ। অসুবিধে হবে না। কিছু জরুরী কাজ আছে, সেগুলো সেরে নিই আগে। কয়েকটা ভালুককে শো-কেসেও সাজাতে হবে, লোকের নজর কাড়ার জন্যে। অনেক সময় আছে। কাল বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখব। গুডবাই।'

তার পরদিন বিকেল চারটে। জমজমাট হয়ে উঠেছে ডক্টর মরিসের বাড়ির পার্টি। তাঁর মেয়ে পলি, জিনার বয়েসী, খুব খাতির যত্ন করছে মেহমানদের। ক্রিসমাস ট্রি'র চারপাশে জড়ো হয়েছে তার বন্ধুরা। অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়ে সাজানো হয়েছে গাছটা। চকচকে রঙিন কাগজের মোড়ক, সিল্কের ফিতে, কাগজের ফুল, ছোট ছোট রঙিন বাল্‌ব, আর সাজানোর আরও নানা জিনিস যা যা পেরেছে, সব লাগিয়েছে ওতে। এমনকি বারোটা রঙিন ভালুকও ঝুলছে গাছের ডালে।

বিরাট ঘরের এককোণে বিশাল এক টেবিল বোঝাই নানা রকম লোভনীয় খাবার। কোন কিছুর কমতি রাখেনি পলি। বন্ধুদেরকে খুশি করার জন্যে সব রকম চেষ্টা করেছে সে।

প্লেটে করে হাতে হাতে খাবার দেয়া হলো। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল পলি। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরছে, তদারকি করছে। এটা সেটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আরও খাবার নেয়ার জন্যে চাপাচাপি করছে। কেউ নিতে না চাইলে জোর করে তুলে দিচ্ছে তার প্লেটে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে খেলার আয়োজন করল পলি। চমৎকার জমল মিউজিক্যাল চেয়ার। হৈ-হুল্লোড় আর হাসাহাসি চলল একনাগাড়ে।

'তুমি ঠকিয়েছ, বব!'

'কে বলে রে! তুমি যে রবিনকে ধাক্কা মারলে সেটা কি?'

'না, আমি মারিনি! সে-ই বসতে পারেনি ঠিকমত!'

বাইরে রাত নামছে। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে গেল। পরীর রাজ্যের পরীরানীর বাগান থেকে যেন তুলে আনা হয়েছে ক্রিসমাস ট্রিটা। এতই সুন্দর, এতই ঝলমলে।

'এবার পুরস্কার দেয়া হবে,' ঘোষণা করল পলি। ক্রিসমাস ট্রিতে ঝোলানো রয়েছে উপহার সামগ্রী, সেগুলো খুলে আনল সে। আরও নানা রকম জিনিস রয়েছে বাক্সে, টেবিলে স্তূপ করে রাখা। এক এক করে নাম ধরে ডাকতে শুরু করল পলি, 'ডায়না, এসো। এই দেখো, কি সুন্দর একটা পোশাক। নার্সের ইউনিফর্মের মত লাগে দেখতে, না?'

'খুব সুন্দর! এ রকমই একটা জিনিস চাইছিলাম,' খুশি হয়ে বলল ডায়না।

মুসা আর জিনা পেল রোলার-স্কেট।

'গুড!' হেসে বলল জিনা। 'দু'জনে এক জিনিস পেয়ে ভাল হলো। পাল্লা দিয়ে স্কেট করতে পারব।'

কিশোর পেল বহু ফলাওয়ালা একটা ছুরি। রবিনকে দেয়া হলো চামড়ার একটা চমৎকার নোটবুক। রাফিকে পর্যন্ত দেয়া হলো একটা পুরস্কার। রবারের একটা হাড়, গলায় ঝোলানোর জন্যে, দেখতে একেবারে আসল হাড়ের মতই লাগে। কামড় বসিয়ে দিল রাফি। যখন দেখল রবার, ফেলে দিল মুখ থেকে।

তারপর হঠাৎই দপ করে নিভে গেল সমস্ত বাতি। আলোয় ঝলমল ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল একটা ছোট মেয়ে। তার পর পরই আরও কয়েকজন চেঁচাল।

'ভয় পেও না,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'ভয়ের কিছু নেই নিশ্চয় ফিউজ কেটে গেছে। ছোটাছুটি কোরো না। গায়ের ওপর পড়বে জিনিসপত্র ফেলে দেবে। ফিউজটা লাগিয়ে দিলেই আলো জ্বলে যাবে আবার

কিশোরের পরামর্শ কেউ শুনল, কেউ শুনল না তবে চেঁচামেচি কমে এল অনেকখানি। শোনা গেল ডক্টর মরিসের ভারী গমগমে কণ্ঠ, সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে, 'শোনো, গোলমাল কোরো না কেউ। চুপ করে থাকো আমি সেলারে যাচ্ছি, ফিউজটা লাগিয়ে দেব।'

তাঁর কথাও অনেকেই শুনল না। কথা বলতে লাগল কেউ কেউ নড়তে শুরু করল অন্ধকারের মধ্যেই। দরজার কাছে রয়েছে মুসা। বাতাস লাগল গায়ে। ফিরে তাকিয়ে দেখে, কে যেন বেরিয়ে যাচ্ছে। কাপড়ের ঘষা লাগল তার মুখে। এক পা বাড়াল সে, কে দেখার জন্যে। জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিল আবার তাকে মূর্তিটা।

'এই, শুনুন, শুনুন!' চিৎকার করে বলল মুসা। 'কি করছেন?'

তার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর আর রাফি ছুটে বেরিয়ে গেল কুকুরটা একটু পরেই বাগানে শোনা গেল তার উত্তেজিত চিৎকার।

'ব্যাপার কি?' অবাক হলো কিশোর। 'কে বেরোল? দরজা খোলা ফেলে রেখে?'

কাঁউ করে উঠল রাফি ব্যথায়। কেউ মেরেছে মনে হয় তাকে।

'রাফি!' ডাকল কিশোর। 'কি করছিস ওখানে?'

বেরোতে যাবে সে, এই সময় আলো জ্বলে উঠল। হাসিমুখে ফিরে এলেন ডক্টর মরিস। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েই থমকে গেলেন ছেলেমেয়েদের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন। চোখে বিস্ময়। তাঁর এই অবস্থা ওদেরকেও অবাক করল। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে। বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল ওরাও।

'আরে, ক্রিসমাস ট্রিটা কই!'

'নেই তো!'

'হলো কি!'

'চুরি করেছে!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চুরি করে নিয়ে গেল কে যেন!'

দুই

অবাক কাণ্ড! ক্রিসমাস ট্রি চুরি করার কথা কে কবে শুনেছে? তবে সেটা মেনে না নিয়েও উপায় নেই জায়গামত নেই ওটা। ঘরের কোথাও নেই ডক্টর মরিস আর মিসেস মরিস স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে চুরিই হয়েছে ওটা আর কোন ব্যাখ্যা নেই বাতাসে তো মিলিয়ে যেতে পারে না

আরেকটা ব্যাপার দেখে এসেছেন ডক্টর মরিস। ফিউজ কাটেনি। মেইন সুইচ অফ করে দেয়া হয়েছিল। তারমানে ওটা অফ করে আলো নিভিয়েছে চোর গাছটা চুরি করার জন্যে। কিন্তু কে করল?

'শুনছেন, আংকেল?' কিশোর বলল। 'আমার কুকুরটা এখনও ঘেউ ঘেউ করছে। বাগানে। নিশ্চয় চোরের পিছু নিয়েছিল।'

দরজার দিকে দৌড় দিল সবাই। হুড়াহুড়ি শুরু করে দিল। আগে গেছেন ডক্টর মরিস। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে চলেছে রাফি। বাগানের গেট বন্ধ থাকায় বেরোতেও পারছে না, ফলে রেগে গেছে আরও। রাস্তায় একটা গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো, একটা ভ্যান। চাঁদ উঠেছে। সেই আলোয় মুসা আর কিশোর দেখতে পেল গাড়িটার পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে ক্রিসমাস ট্রির দুটো ডাল।

'ওই যে যাচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'চোর! চোর!'

মুসার মনে পড়ল, অন্ধকারে ঘষা লেগেছিল তার মুখে। অবশ্যই গাছের ডালের, কোন ভুল নেই তাতে। কিন্তু কে এই কাজটা করল? একটা ক্রিসমাস ট্রি চুরি করে কি লাভ? এমন কোন দামী বস্তু নয় ওটা, অবশ্যই টাকার হিসেবে। বিক্রি করতে পারবে না। তাহলে এত কষ্ট করে এ রকম একটা জিনিস চুরি করতে এল কেন?

ডক্টর মরিস আর তাঁর স্ত্রীও একই কথা বলাবলি করতে লাগলেন, 'কে চুরি করল? কেন? পাগল-টাগল নাকি?'

ছেলেমেয়েদেরকে আবার ঘরে যেতে বললেন তাঁরা। বাইরে থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। ঘরে এসে পুলিশকে ফোন করলেন ডক্টর মরিস, চুরির খবর দিলেন। দেরি হলো না। খানিক পরেই দুজন পুলিশম্যান এসে হাজির। সবাইকে অনেক অনেক প্রশ্ন করল তারা। নোটবুকে লিখে নিয়ে চলে গেল। ওরাও অবাক হয়েছে। কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছে না কেউ, এ রকম জিনিস চুরির জন্যে এতটা ঝামেলা কেন করতে গেল চোর!

জিনাদের বাড়িতে ফিরে এল জিনা আর তার বন্ধুরা। চারজনের মুখে কেবল একই কথা, ক্রিসমাস ট্রি চুরি। ভাবছে, আলোচনা করছে। যতই করছে, ততই অবাক হচ্ছে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না।

'চোরেরা গাছটা নয়,' অনুমানে বলল রবিন, 'উপহারগুলোই চেয়েছে। খুলে নিতে অনেক সময় লাগত। তাই গাছটাই তুলে নিয়ে গেছে।'

'আমার তা মনে হয় না,' জিনা বলল। 'উপহারগুলো ভাল, সন্দেহ নেই। তবে তেমন দামী নয় যে চুরি করতে আসবে। না, গাছটাই ওদের দরকার ছিল। প্ল্যানট্যান করেই এসেছে।'

'কিন্তু ক্রিসমাস ট্রি একটা সাধারণ ফার গাছ,' মুসা বলল। 'এটা দিয়ে কার কি কাজ হবে? ক্রিসমাসের পরে এটার কোন প্রয়োজনই নেই।'

'কি জানি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'এই বিশেষ গাছটা দিয়ে হয়তো হবে। কি হবে সেটা যদি বুঝতে পারতাম!'

রাত হলে শুতে গেল সবাই। চারজনেরই মাথায় ঘুরছে শুধু গাছটার ভাবনা।

অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসছে মনে। জবাব মিলছে না কোনটারই।

কিশোর ভাবছে আরেকটা কথা। ক্রিসমাস ট্রি চুরি হয়েছে যখন, নিশ্চয় এর পেছনে কোন রহস্য রয়েছে। তবে কি আরেকটা রহস্য এসে হাজির হয়েছে ওদের কাছে? সমাধানের জন্যে? এলে ভালই হত। রহস্য পেলে ভাল লাগে। আর এ রকম জটিল আর আশ্চর্য হলে তো কথাই নেই।

*

পরদিন সকালে আরেকটা রহস্য পাওয়া গেল। রাতে ঘুমাতে দেরি করে ফেলেছে, পরদিন তাই ঘুম ভাঙতেও বেলা হয়ে গেল। নাস্তার টেবিলে এসে বসল গোয়েন্দারা। খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে বাজারে গিয়েছিলেন কেরিআন্টি। ওরাও বসল, তিনিও ফিরলেন। সাথে করে নিয়ে এসেছেন কিছু চমৎকার কেক, আর একটা দারুণ খবর। আগের দিন রাত দুটোয় নাকি গোবেল বীচ স্টোরে চোর ঢুকেছিল।

'তাজ্জব ব্যাপার, বুঝলি জিনা,' আন্টি বললেন। 'এত কষ্ট করে ঢুকল চোর। কিন্তু কিছুই নিল না। শুধু কিছু খেলনা ভালুক ছাড়া। বাক্সে ভরা ছিল, নিয়ে চলে গেছে। শো-কেসে ছিল একটা না দুটো, তা-ও নিয়ে গেছে। মিস্টার ফোকসন বললেন, পুলিশও নাকি অবাক হয়েছে। কি ব্যাপার, বুঝতে পারছে না। ওদের ধারণা হয় চোরটা পাগল, নয়তো বড়দিনে রসিকতা করেছে।'

'আজব ব্যাপার!' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। সে-রকমই লাগছে,' বলল মুসা।

'কয়েকটা খেলনা ভালুক শুধু?' জিনা বলল। 'আর কিছুই নেয়নি? কোন মানেই হয় না এর।'

'নাহ্!' মাথা নাড়ল মুসা।

'পলির গাছ চুরির চেয়ে আজব কিন্তু নয় ব্যাপারটা,' বলল কিশোর।

কি যেন ভাবছে রবিন। মোলায়েম গলায় বলল, 'মনে আছে, গাছটা থেকে সমস্ত উপহার খুলে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ভালুকগুলো সব রয়ে গিয়েছিল। গাছের সঙ্গে ওগুলোও নিয়ে গেছে চোর।'

রবিনের মত একই খাতে বইতে শুরু করল মুসা, জিনা আর কিশোরের ভাবনাও।

'ঠিকই বলেছ,' কিশোর বলল। 'লোকটা পাগলই হবে। খেলনা ভালুকের ওপর তার লোভ। যেখানেই দেখেছে, লোভ সামলাতে না পেরে তুলে নিয়ে গেছে।'

তবে আইডিয়াটা এতই হাস্যকর মনে হলো, হাসির পাত্র হওয়ার ভয়ে কারও কাছে কথাটা বলল না ওরা। বলার মত আর কেউ তখন অবশ্য নেইও ওখানে। আন্টি চলে গেছেন রান্নাঘরে। হাঁড়িপাতিলের খুটখাট শব্দ হচ্ছে। লোভনীয় গন্ধ আসছে। কোথায় কার গাছ চুরি হলো, ভালুক চুরি হলো, পারকার আংকেলের এ সব ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা নেই। তিনি গিয়ে ঢুকেছেন তাঁর পড়ার ঘরে। নিশ্চয় জটিল কোন বৈজ্ঞানিক থিউরি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এখন।

কি আলোচনা হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছে না রাফি। যেন সেটাই জিজ্ঞেস করল, 'ঘাউ!' অর্থাৎ ব্যাপার কি? কি নিয়ে অমন মাথা গরম করছ তোমরা?

'রাফি, তুই কি ভাবছিস বল তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, আসলে নিজেকেই করল প্রশ্নটা। 'বলছি বটে পাগল, কিন্তু সে-রকম ভাবতে পারছি না লোকটাকে। এর অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে...'

'খেলনা ভালুক সংগ্রহ করে না তো?' বাধা দিয়ে বলল মুসা।

'না,' মাথা নাড়ল জিনা। 'সংগ্রাহক হলে একজন হত। ভেবে দেখো, ক্রিসমাস ট্রিটা যথেষ্ট ভারী। সেটাকে নিয়ে ভ্যানে তুলে ওরকম তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া একজনের পক্ষে সম্ভব না। কমপক্ষে দু'জন। পাগল হলেও একজন হত। তারমানে সংগ্রহ কিংবা পাগলামি কোনটাই নয়।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো কিশোর। 'কয়েকটা খেলনা ভালুক জোগাড়ের জন্যে শুধু এতসব করেনি লোকগুলো।'

'কি মনে হয় তোমার? ওই ভালুকগুলোর কোন বিশেষত্ব আছে?'

'থাকতে পারে। সে-কথাই ভাবছি আমি।'

'সে-কারণেই যেখানে যত ভালুক পেয়েছে সব তুলে নিয়ে গেছে ওরা। গাছটা নিয়েছে, দোকানের বাক্সগুলো নিয়েছে, এমনকি শো-কেসে একটা যে ছিল, সেটাও নিয়ে গেছে। তার মানে জানত কোথায় ওগুলো পাওয়া যাবে।'

'হ্যাঁ, একেবারে ঝেড়েপুছে নিয়ে গেছে,' কিশোর বলল। 'একটাও রাখেনি।'

'এখন কি করবে ওরা?' মুসার প্রশ্ন। 'সব তো নিল...'

'না, সব নিতে পারেনি,' হাত নাড়ল রবিন। 'একটা রয়ে গেছে আমার কাছে। যেটা আন্টিকে উপহার দিতে কিনেছি।'

'তাই তো!'

'রবিন,' উত্তেজিত কণ্ঠে কিশোর বলল। 'জলদি যাও! নিয়ে এসো!'

ছুটে ওপরতলায় চলে গেল রবিন। একটু পরেই ফিরে এল নীল ভালুকটা নিয়ে।

কৌতূহলে ফেটে পড়ছে চারজনেই। গাঁ ঘেঁষাঘেঁষি করে এল দেখার জন্যে। কিছুই অস্বাভাবিক লাগছে না খেলনাটার। সাধারণ, ছোট, নরম একটা জিনিস, যেটার কোন বিশেষত্বই চোখে পড়ল না।

'নাহ্!' মাথা নাড়তে লাগল মুসা। 'কিছু নেই। বাকিগুলোও, যেগুলো দেখেছিলাম, একই রকম দেখতে। ছোট ছোট, সুন্দর। তবে অস্বাভাবিক কিছুই নেই।'

'ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়,' কিশোর বলল। 'আমার মনে হচ্ছে দুটো চুরিরই কোন একটা সম্পর্ক আছে। আচ্ছা, রহস্যটা কি তা বের করলেই তো পারি আমরা? অন্তত করার চেষ্টা তো করতে পারি?'

অন্য তিনজনও ভেবে দেখতে লাগল কথাটা।

'হ্যাঁ, তা করতে পারি,' মাথা দোলাল মুসা। 'শুরুটা করা যায় গোবেল বীচ স্টোর থেকেই। ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি আমরা। কিভাবে কি হয়েছে তদন্ত করে আসতে পারি।'

'হ্যাঁ, তা পারি,' জিনা বলল। 'এখন নিশ্চয় খোলাই আছে দোকান। এ সময়ে থাকে।'

'ওঠো তাহলে,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'চলো, যাই।'

যত তাড়াতাড়ি পারল বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। মিনিটখানেক পরেই গোবেল বীচ কটেজের দিকে চলল চারটে সাইকেল আর একটা কুকুরের মিছিল।

তিন

দোকানে পৌঁছে দেখল আরও অনেক লোক রয়েছে ভেতরে। কেউ কেউ সত্যি এসেছে জিনিস কিনতে, কেউ এসেছে কৌতূহল মেটাতে। কাউন্টারে কাউন্টারে লোক ঘুরছে। যারা কিনতে এসেছে তারাও কম কৌতূহলী নয়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে। তাদের মাল প্যাকেট করতে আর প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে দোকানের তিনজন কর্মচারী। প্রসঙ্গ একটাই, গতরাতের চুরি।

কিশোর দেখল, বেঁটে, গাট্টাগোট্টা এক লোকের সঙ্গে কথা বলছে ডিক। লোকটার বয়েস চল্লিশ-টল্লিশ হবে। চোখে কালো কাঁচের সানগ্লাস। সাংবাদিক বলে পরিচয় দিয়েছে। এক কোণে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আর ডিক যা বলছে সব লিখে নিচ্ছে নোটবুকে। কাছে গিয়ে দাঁড়াল ছেলেমেয়েরা। ওদেরকে একটা আন্তরিক হাসি উপহার দিল ডিক।

'হাল্লো,' বলল সে। 'কি চাই? আরও খেলনা?'

'না, এমনি এলাম,' হেসে বলল জিনা। 'জাস্ট কৌতূহল।'

'মেটাতে,' হেসে যোগ করল কিশোর।

বাধা পড়ায় বিরক্ত হলো চশমাওয়ালা লোকটা। ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরেও তাকাল না। ডিককে বলল, 'ওদেরকে বাদ দিন না। হ্যাঁ, কোথায় যেন এসেছিলাম?'

'নতুন আর কি বলব, যা বলার তো বলেই দিয়েছি,' ডিক বলল। 'চোরেরা আর কিছুই নেয়নি, শুধু...'

'হ্যাঁ, জানি, শুধু রঙিন খেলনা ভালুকগুলো নিয়েছে,' অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল লোকটা। 'আমার কথার জবাব কিন্তু এখনও পাইনি। আমি জানতে চাইছি সবই কি নিয়ে গেছে? দোকানে যা ছিল...মানে, এসেছিল? ক'টা এসেছিল?'

'এসেছিল ছত্রিশটা,' ডিক বলল। চশমাওয়ালা লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। তার মনে হলো, সেলসম্যানের জবাব শুনে সামান্য যেন চমকে গেল লোকটা। তবে মুহূর্তে সামলে নিল সেটা। দ্রুত লিখে নিল নোটবুকে। 'বারোটা নিয়ে গেছেন ডক্টর মরিস। আর চব্বিশটা...' রবিনের ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল সে। 'না না, তেইশটা ছিল দোকানে। কারণ এই ছেলেটা একটা নিয়ে গিয়েছিল,' রবিনকে দেখাল সে।

এতক্ষণ এমন ভাব করছিল লোকটা যে ছেলেমেয়েগুলো চলে গেলেই বাঁচে। হঠাৎ করেই তার আচরণ বদলে গেল। এখন যেন ওদের প্রতিই বেশি মনোযোগ। আন্তরিক হওয়ার জন্যে হাসল। 'তাই নাকি?' রবিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে। 'তাহলে তুমিও একটা নিয়েছ? আমি শুনলাম, চোরেরা নাকি সব চুরি করেছে,

যতগুলো ভালুক এসেছিল।'

'হ্যাঁ, সবই নিয়েছে,' আরেকবার বলল ডিক। 'ডক্টর মরিসের বারোটা, আর এই ছেলেটার একটা বাদে। তার মানে দোকান থেকে চুরি হয়েছে তেইশটা।'

কিশোর বুঝল, পলিদের ভালুকগুলো চুরি হওয়ার খবরটা জানে না সেলসম্যান।

রবিনের দিকে তাকিয়েই রয়েছে চশমাওয়ালা। 'একটা তাহলে আছে তোমার কাছে? কেন জিজ্ঞেস করছি জানো? পত্রিকায় লেখার জন্যে।'

'অ,' পকেটে হাত ঢোকাল রবিন। নীল ভালুকটা সঙ্গেই রয়েছে। সেটা বের করে দেখিয়ে বলল, 'এই যে এটাই। খুব মিষ্টি, না?'

রবিনের হাত থেকে ভালুকটা নিয়ে দেখতে লাগল সাংবাদিক। বলল, 'হ্যাঁ, মিষ্টি!' ফিরিয়ে দিল আবার। 'শোনো, খবরের কাগজে নাম আর ছবি ছাপা দেখতে কেমন লাগবে? আমার প্রতিবেদনে তোমার নাম আমি উল্লেখ করতে পারি। হেডলাইনটাও বলে দিতে পারি এখনি। বড়দিনের অপরাধ: নীল ভালুকের রহস্য। খুব আকর্ষণীয় হবে, তাই না?'

লোকটার হাবভাব একটুও ভাল লাগল না কিশোরের। রবিনের হাত ধরে টান দিল, 'এসো। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বেরোই।' কিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে বুঝল না রবিন। তবে জিজ্ঞেসও করল না। যা বলছে করার জন্যে ঘুরতে গেল।

'এক মিনিট,' হাত তুলল লোকটা। 'আর দু'একটা কথার জবাব দিয়ে যাও, কাগজের জন্যে। আমার কলামটা পুরো করতে হবে তো...' রবিনের নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করল সে।

'বাড়ি তো এখানে না,' জবাব দিল রবিন। 'বেড়াতে এসেছি। ওদের বাড়িতে,' জিনাকে দেখাল সে। 'বাড়ির নাম গোবেল ভিলা। আর আমার আংকেলের নাম জনাথন পারকার। তিনি বিজ্ঞানী।'

পুরোপুরি অধৈর্য হয়ে গেছে কিশোর। লোকটা এখন রবিনকে ছেড়ে দিলেই খুশি হয় সে। চশমাওলাকে প্রথম থেকেই খারাপ লাগছে তার। আর এখন সন্দেহ ঢুকে গেছে মনে। লোকটার প্রশ্নগুলো বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না, খটকা লাগছে। কি করে চুরি হয়েছে, সেটা নিয়ে মোটেও আগ্রহ নেই, যত আগ্রহ ক'টা চুরি হয়েছে সেটা নিয়ে। কেন?

'কোন্ কাগজে কাজ করেন আপনি?' আচমকা জিজ্ঞেস করে বসল কিশোর।

হঠাৎ করে নোটবুক বন্ধ করল লোকটা। 'দা নিউজ! যাই এখন। তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রতিবেদনটা লিখে ছাপতে দিতে হবে...গুডবাই!'

বেরিয়ে গেল সে। ব্যাপারটা মুসারও অবাক লাগল। ভুরু কুঁচকে বিড়বিড় করতে লাগল সে, 'দা নিউজ তো বুঝলাম, কিন্তু কোন্ নিউজ? ডেইলি নিউজ? ইভনিং নিউজ? গোবেল বীচ নিউজ? কাগজের পুরো নাম বলেনি লোকটা। ওর কথাবার্তা হাবভাব কিছুই ভাল লাগেনি আমার।'

'আমারও না,' জিনা বলল।

এতক্ষণে সুযোগ পেয়েছে কিশোর। দেরি করল না আর। প্রশ্ন শুরু করল ডিককে। তবে নতুন কিছু তেমন জানতে পারল না। আগেই জেনেছে এ সব। গত রাতে দুটোর দিকে চোর ঢুকেছিল দোকানে। ওদের জানা ছিল কোথায় রয়েছে

বার্গলার অ্যালার্ম। তারগুলো কেটে দিয়েছে ঢোকার আগে, যাতে ঘণ্টা বেজে ওদেরকে ধরিয়ে দিতে না পারে। বাক্সে যতগুলো ভালুক ছিল, সব নিয়েছে। শো-কেসেরটাও নিয়ে গেছে। অন্য কোন জিনিসে হাত দেয়নি।

'এটাই অবাক লাগে,' ডিক বলছে। 'এত দামী দামী জিনিস থাকতেও কিছুই নিল না। নিল কিনা শুধু কয়েকটা সাধারণ খেলনা ভালুক! আরও আশ্চর্য, শো-কেসেরটা পর্যন্ত বের করে নিয়ে গেছে। এতে পরিষ্কারই বোঝা যায়, ওরা এসেছিলই শুধু ওগুলো নিতে। আর কোন কিছুতে ইন্টারেস্টেড নয়। এই কাজ করতে ভেতরের কারও সাহায্য নিয়েছে। এই দোকানেরই কেউ! পুলিশের তাই ধারণা।'

'কেমন যেন লাগে!' দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'স্বাভাবিক মনে হয় না।' মাথা নাড়ল সে। বিড়বিড় করল, 'পলিদের বাড়ি থেকে গাছ নিয়ে যাওয়াটাও অদ্ভুত। ভাবছি, কি আছে এ সব চুরির পেছনে? কারণটা কি?'

একজন খরিদ্দার এগিয়ে এল ডিকের দিকে। জিনিস চাইল। ব্যস্ত হয়ে পড়ল সেলসম্যান। আর কথা বলা যাবে না, বুঝতে পারল ছেলেমেয়েরা। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

আপাতত আর কিছু করার নেই। কাজেই ভালুক চুরির ব্যাপারটা মন থেকে দূর করে দিয়ে লোকের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ায় মন দিল। জিনাকে দাওয়াত করে গেছে তার অনেক বন্ধু। একলা গেল না কোথাও সে, মুসা, কিশোর আর রবিনকে নিয়েই গেল।

উড়ে যেতে লাগল যেন সময়। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হলো। সেই সাথে পেল অনেক সুন্দর সুন্দর উপহার। খুব খুশি ওরা। একে অন্যের উপহারের প্রশংসা করল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। তারপর সাগরের ধারে বেড়াতে বেরোল।

সারাদিনে এত খেয়েছে, সাগরের তীরে খোলা বাতাসে ঘুরে আসার পরেও খিদে পেল না তেমন। কাজেই হালকা কিছু খেয়ে খেলতে বসে গেল। তারপর ক্লান্ত হয়ে বিছানায় গেল।

ঘুমানোর আগে মুসার শেষ কথা, 'কাল আমার কিচ্ছু খাওয়া লাগবে না, বুঝলে।'

শুধু 'হুঁ' বলতে পারল কিশোর। তার পরেই ঘুম।

কথাটা একেবারেই ভুল বলেছে মুসা। সকালে উঠেই ভীষণ খিদে। প্রচুর খেতে পারল। অন্য তিনজনও কম গেল না। খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাগানে ঘোরাঘুরি করল খানিকক্ষণ। শেষে চলল সৈকতে। দুপুরের খাওয়ার সময় আবার যে খিদে সেই খিদে।

সেদিনটাও কেটে গেল খুব দ্রুত। নতুন কিছু ঘটল না।

তার পর দিন সকালে উঠে কেরিআন্টি দেখলেন খাবারে টান পড়েছে। দোকান থেকে আনতে হবে। তালিকা লিখে ছেলেমেয়েদের ডেকে বললেন বাজার থেকে নিয়ে আসতে।

'এই যে এগুলো দরকার,' বললেন তিনি। 'ডিম, ফল, সবজি···সব লিখে দিয়েছি। দুটো ঝুড়ি নিয়ে যাও। সাইকেলের স্যাডল ব্যাগে এত কিছু ধরবে না।'

সাইকেল নিয়ে রওনা হলো ওরা। সাথে চলল রাফি। আকাশ মেঘলা নয়, বৃষ্টি পড়ছে না, পথঘাটও খটখটে শুকনো। এমন দিনে সাইকেল চালাতে ভাল লাগে ওদের। বাজারে পৌঁছে কেনাকাটাগুলো জিনাই করতে লাগল, আর ছেলেরা বোঝা বইতে লাগল।

রবিন পকেটে হাত দিতেই হাতে ঠেকল খেলনা ভালুকটা। আন্টিকে দিতে ভুলে গেছে। হাতের কাছে পেল যখন বের করে হাতে নিয়ে দেখতে লাগল নেড়েচেড়ে। বোঝার চেষ্টা করল কি এমন মাহাত্ম্য আছে? রাফিকে দেখাল।

'রাফি, দেখ। সুন্দরই জিনিসটা, কি বলিস? কি নাম রাখা যায়, বল তো? এক কাজ করি। নীল রঙ যখন, নীল ভালুকই নাম রেখে দিই।'

শান্তকণ্ঠে পেছনে বলে উঠল কেউ, 'বাহ্, খুব সুন্দর ভালুক তো। হাতে নিয়ে দেখতে দেবে?'

ফিরে তাকিয়ে রবিন দেখল এক তরুণী মহিলা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে হাসিমুখে। চোখগুলো কেমন বিষণ্ন। হাত বাড়িয়ে রেখেছে ভালুকটার জন্যে।

দিল রবিন। চকচক করে উঠল মহিলার চোখ। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ভালুকটার শরীর টিপে টিপে দেখছে।

'আমাকে দেবে এটা?' অনুনয় শুরু করল মহিলা। 'দাম আমি দিয়ে দেব। যত চাও, দেব। খেলনাটা আমাকে দিয়ে দাও। আমার ছেলের জন্যে। তার খুব অসুখ। বিছানায় পড়ে আছে। এটা পেলে খুব খুশি হবে।'

মহিলার এই অনুনয় অবাক করল রবিনকে। মনটা হঠাৎ নরম হয়ে গেল। খেলনাই তো একটা, এতে যদি মহিলার ছেলে খুশি হয়, হোক না। 'হ্যাঁ' বলতে যাবে সে, এই সময় একটা হাত এগিয়ে এল তার কাঁধের ওপর দিয়ে। মহিলার হাত থেকে প্রায় থাবা মেরে কেড়ে নিল ভালুকটা।

চার

'খুবই দুঃখিত আমি,' কিশোর বলল ভদ্র কণ্ঠে। 'কিন্তু এটা অন্য একজনের জন্যে কেনা হয়েছে, ক্রিসমাস প্রেজেন্ট। এই উপহারের মূল্য আপনার জানা আছে। এটা আর কাউকে দেয়া যাবে না। আপনি চাইলে এ রকম ভালুক অনেক কিনতে পারেন, গোবেল বীচ স্টোরে পাওয়া যায়। ওদের কাছে এখন না থাকলেও অর্ডার দিয়ে আনিয়ে নিতে পারবেন।'

প্রতিবাদ করার জন্যে মুখ খুলল মহিলা। কিন্তু শোনার অপেক্ষায় থাকল না কিশোর। রবিনকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল ক্রেতার ভিড়ে।

'কাজটা কি ঠিক হলো?' রবিন বলল। 'কি আর এমন জিনিস? মহিলাকে দিয়ে দিলেই হত। তার ছেলেটার খুব অসুখ।'

'অসুখ না ছাই! বানিয়ে বলেছে। জিনাদের বাড়ি থেকেই আমাদের পিছে লেগেছে। তুমি খেয়াল করোনি। অবাকই লাগছে আমার এখন! আর কত লোক

ওই খেলনা ভালুকের ব্যাপারে আগ্রহী!'

'মানে?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে জিনার। 'ওই মহিলা আমাদের বাড়ি থেকে পিছে লেগেছে?'

'হ্যাঁ। বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখলাম ছোট একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার পাশে। আমাদেরকে দেখে স্টার্ট নিল। খুব ধীরে ধীরে আসতে লাগল আমাদের সাইকেলের পিছে। পুরো রাস্তাটা সেকেন্ড গীয়ারে এসেছে। অথচ ইচ্ছে করলেই আমাদের পাশ কাটিয়ে অনেক আগে চলে আসতে পারত। আসেনি। কেন? আমাদেরকে অনুসরণ করছিল বলে। বাজারের কাছাকাছি পৌঁছে তারপর পাশ কাটাল। ওই মহিলাই গাড়িটা চালাচ্ছিল, আমি দেখেছি।'

'কিন্তু কেন?' মুসার প্রশ্ন। 'তোমার কি মনে হয় এই মহিলাও ভালুক শিকারীদের একজন?'

'তাই তো মনে হচ্ছে এখন। আরও একটা ব্যাপার, যে চশমাওয়ালা লোকটা সেদিন ডিককে প্রশ্ন করছিল, খবরের কাগজের লোক বলে পরিচয় দিয়েছিল, তাকেও এখন চোরের দলের লোক বলেই মনে হচ্ছে। একটা ব্যাপার খেয়াল করোনি, ক'টা ভালুক ছিল, ক'টা চুরি হয়েছে, খালি সে-কথা জিজ্ঞেস করছিল বার বার লোকটা। রবিনের কাছে একটা আছে শুনে কেমন চমকে গিয়েছিল।'

কিশোরের কথা শুনে রবিনও অবাক। 'তাই তো! হ্যাঁ হ্যাঁ, এই একটা ভালুকই নিতে পারেনি চোরেরা। সে-জন্যেই এটা নিয়ে যেতে চেয়েছিল মহিলা!'

'দিয়ে তো দিয়েছিলে আরেকটু হলেই,' মুসা বলল। 'আরেকটা বোকামি করেছ চশমাওয়ালাকে বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে। উচিত হয়নি। ওই ব্যাটা সাংবাদিক না কচু। মহিলাকে বলেছে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। আমাদের পিছু নিতে। কোনভাবে ভালুকটা জোগাড় করে নিয়ে যেতে। হয়তো এর জন্যে টাকাও দিয়েছে মহিলাকে।'

'নিয়ে গিয়েছিল আরেকটু হলেই!' জিনা বলল। 'কিশোর বাধা না দিলে তো যেতই।'

চিন্তিত লাগছে কিশোরকে। বলল, 'এবার পারল না বটে, তবে আমার বিশ্বাস, আবার চেষ্টা করবে ওরা।'

'অতি কল্পনা হয়ে যাচ্ছে না তো?' মুসা বলল। 'হয়তো বেশি বেশিই ভেবে ফেলছি আমরা। দোকানে চুরি হয়েছে, ঠিক। পলিদের বাড়িতেও হয়েছে। কিন্তু তাতেই কি মনে হয় ঘটনাগুলোর মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে? খেলনা ভালুকগুলোর পিছেই লেগেছে চোর, এমন তো না-ও হতে পারে। আর ওই মহিলা সত্যি কথাও বলে থাকতে পারে। হয়তো তার বাচ্চার সত্যিই অসুখ।'

তার দিকে তাকিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিশোর। 'দূর! একেবারেই মিছে কথা...বাড়ি চলো। ভালুকটা খুলে দেখব ভেতরে কি আছে।'

'ভেতরে?' ভুরু কুঁচকে ফেলল রবিন।

'হ্যাঁ। আমি কি ভাবছি বলছি। আমার ধারণা, ওই ভালুকগুলোর কোনটার মধ্যে রয়েছে মূল্যবান কিছু। চোরেরা ছত্রিশটার মধ্যে পঁয়তিরিশটাই নিয়ে গেছে। ওগুলোতে যদি থাকত এই একটা নেয়ার জন্যে আর অত চেষ্টা করত না। তারমানে

রবিনের ভালুকটার মধ্যেই রয়েছে সেই জিনিস,' তুড়ি বাজাল সে। 'গোপন কথা বলতে আমরা বাধ্য করব নীল ভালুককে!'

তাড়াতাড়ি বাজার শেষ করল ওরা। তারপর বাড়ির পথ ধরল। অস্বস্তি বোধ করছে। বার বার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। কেউ অনুসরণ করছে কিনা দেখছে। কিন্তু সন্দেহজনক কোন গাড়িকে পিছু নিতে দেখল না।

দুশ্চিন্তা গেল না তবুও। গোবেল ভিলার বাগানে ঢোকার আগে আর নিশ্চিন্ত হতে পারল না। ঢুকে, তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক! এবারে শান্তি!

জিনিসপত্রগুলো রান্নাঘরে নিয়ে এল ওরা। সেখানে ওগুলো রেখে রওনা হলো একটা পুরানো স্টোর রুমে। পারকার আংকেলের স্টাডি থেকে দূরে ঘরটা। ওখানে চেঁচামেচি করলেও তাঁর কানে পৌঁছবে না। বিরক্ত হবেন না তিনি। কাজে বিঘ্ন ঘটবে না। গোলমাল একেবারেই সইতে পারেন না তিনি।

স্টোর রুমে ঢুকে পকেট থেকে ভালুকটা বের করল কিশোর।

'ঘাউ!' আগ্রহী মনে হলো রাফিকে।

'দেখি তো,' কিশোরের হাত থেকে ভালুকটা নিল মুসা। 'ছোট। খেলনা। এর ভেতরে কি থাকতে পারে বুঝতে পারছি না।'

'হীরাটীরা কিছু?' রবিনের অনুমান।

'কিংবা হয়তো এক টুকরো কাগজ,' আবার মুসার হাত থেকে ভালুকটা নিয়ে ওটার পেট টিপেটুপে দেখতে শুরু করল কিশোর। 'দাঁড়াও! জোরে টিপলে কি যেন লাগছে!'

'কেটে ফেলো,' মুসা বলল।

'ঠিক।' পকেট থেকে বহু ফলাওয়ালা ছুরিটা বের করল কিশোর, যেটা পলির কাছ থেকে উপহার পেয়েছে।

'আমার কাছে দাও!' উত্তেজনায় কাঁপছে মুসা।

বন্ধুর দিকে তাকাল কিশোর। কি ভাবল। তারপর হেসে ভালুক আর ছুরিটা বাড়িয়ে দিল। 'নাও, কাটো।'

হাত কাঁপছে মুসার। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে দিল ছেড়ে। একসাথে ধরতে গেল জিনা আর কিশোর। ঠোকাঠুকি হয়ে গেল হাতে হাতে। ভালুকটার গায়ে লেগে লাফ দিয়ে ওপরে উঠে গেল ওটা। পড়তে লাগল আবার। রাফি ভাবল, এটা এক ধরনের মজার লোফালুফি খেলা। সে-ও অংশ নিল তাতে। ভালুকটা মাটিতে পড়ার আগেই লুফে নিল, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল জোরে, যাতে না ফসকাতে পারে।

'এই, এই!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'ফেল! ছাড়, জলদি!' রাফির কলার ধরে ঝাঁকি দিল কিশোর।

কুকুরটার মুখ থেকে ভালুকটা বের করে নিতে গেল মুসা। কিন্তু এটাও খেলা ভেবে ছাড়ল না রাফি। আরও জোরে কামড়ে ধরল। গরগর শব্দ বেরোচ্ছে গলার ভেতর থেকে। যেন চ্যালেঞ্জ করছে, দেখি বের করো তো, কেমন পারো!

'হয়েছে, রাফি!' ধমক দিয়ে বলল কিশোর। 'ফেল ওটা! ছাড়! দেখি, দে আমাকে!'

মুসাও হাত বাড়িয়েছে। দু'জনে দু'দিকে ধরে টান মারল। প্রচণ্ড টান, সইতে

পারল না সামান্য একটা খেলনা। ছিঁড়ে গেল ওটা।

অবাক হয়ে অবশেষে কামড় ছেড়ে দিল রাফি। ছেঁড়া ভালুকটা তুলে নিল মুসা। দেখার জন্যে এত দ্রুত ঝুঁকে এল চারজনে, ঠোকাঠুকি হয়ে গেল মাথায়। ভেতরে আর কিছুই চোখে পড়ল না, তুলা ছাড়া। শেষে ফুটোর ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে দিল রবিন।

'এই, আছে তো! কি যেন রয়েছে!'

ভালুকটা নিয়ে ফুটোটা টেনে আরও বড় করল জিনা। কিছু তুলা টেনে টেনে বের করে ফেলল। তারপর ফুটোটা নিচের দিকে করে ঝাঁকি দিল জোরে। নিচে বাড়িয়ে রাখল আরেক হাত। শক্ত করে পাকানো এক টুকরো কাগজ পড়ল তার ছড়ানো তালুতে।

একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল সকলেই। নীরবে তাকিয়ে রয়েছে জিনার হাতের কাগজটার দিকে। তাহলে নীল ভালুক মুখ খুলল অবশেষে, বলতে যাচ্ছে তার গোপন কথা!

'ভাল,' কথা বলল কিশোর। 'লুকানোর চমৎকার জায়গা! এখন দেখা যাক কাগজে কি রয়েছে!'

খুলতে আরম্ভ করে দিয়েছে জিনা। চুপ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল অন্য তিনজনে। উত্তেজনায় এখন সবাই কাঁপছে। ভাঁজ খুলে হাতের তালুতে বিছিয়ে ডলে কাগজটা সমান করল জিনা। কি আছে পড়ার জন্যে ঝুঁকে এল সকলেই।

কালো কালিতে নিখুঁত করে আঁকা রয়েছে কতগুলো আয়তাকার চিহ্ন। তার মধ্যে থেকে গজিয়ে উঠেছে কিছু নকশা, কিংবা জ্যামিতিক চিহ্ন। আর কিছু লেখা রয়েছে ভেতরে।

'নকশা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জিনা। 'তাহলে এর পেছনেই লেগেছিল ওরা!'

'কারা' সে-কথাটা জিজ্ঞেস করল না কেউ। জানাই তো আছে। চোরের কথা বলছে জিনা। ক্রিসমাস ট্রি আর দোকানে ঢুকে খেলনা ভালুক চুরির রহস্যের একটা জবাব এখন পরিষ্কার।

'আমাদের অনুমানই ঠিক!' বেশ সন্তুষ্ট লাগছে কিশোরকে। 'মুসা, এখন তো বিশ্বাস করবে? নীল ভালুকটার পেছনেই লেগেছিল চোরেরা।'

'হায়রে আমার নীল ভালুক!' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'কি নিষ্ঠুর ভাবেই না খুন করা হলো তোকে!'

কিশোর বলল, 'ঠিক করে ফেলা যাবে। নষ্ট হয়নি। ভাল করে দেখো, শুধু জোড়াটা ছুটেছে। তুলা ভরে আবার সেলাই করে নিলেই হয়ে যাবে।'

কাজে বসে গেল রবিন। ও যখন খেলনা মেরামতে ব্যস্ত, অন্য তিনজন তখন নকশাটা নিয়ে বসল। মানে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল।

'নকশা, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' মুসা বলল। 'কিন্তু কিসের নকশা? হাতামাথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

'এত সহজে হাল ছাড়ছি না,' জিনা বলল। 'হয়তো কোন বাড়ির নকশা...'

'কিংবা গুপ্তধনের!' বলে উঠল কিশোর। 'কোন নির্জন দ্বীপে লুকানো থাকলেও অবাক হব না।' সব সময়েই কল্পনার বল্গা ছেড়ে দেয় সে। তাতে ক্ষতি বিশেষ হয় না। রহস্য সমাধানের ক্ষেত্রে বরং লাভই হয়েছে এতে, বহুবার দেখেছে।

রান্নাঘর থেকে কেরিআন্টির ডাক শোনা গেল। 'এই জিনা, তোরা কোথায় গেলি? খাবার রেডি।'

দাঁত দিয়ে কামড়ে সুতো কাটল রবিন। 'হয়েছে!' ভালুকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাতের কাজ দেখতে দেখতে বলল, 'একেবারে নতুনের মত। হ্যাঁ রে নীল ভালুক, আর কোন দুঃখ নেই তো তোর?'

'এটা আর আন্টিকে দেয়া যাবে না,' মুসা বলল।

'খাওয়ার পর আবার নকশাটা নিয়ে বসব,' বলল কিশোর। 'এখন লুকিয়ে রাখি। কোথায় রাখব?'

'ঘাউ!' জবাব দিল রাফি।

'বাহ্, ভাল জায়গার কথা বলেছিস তো,' হেসে বলল কিশোর। 'ও বলছে, কুকুরের ঘরে রেখে দিতে। তারমানে ওর ঘুমানোর জায়গায়। ভালই হবে, কি বলো?'

রাফির কথা বললেও তার বন্ধুরা জানে বুদ্ধিটা কিশোরের মাথা থেকেই বেরিয়েছে। একটা খাম খুঁজে বের করল সে। ভাঁজ করে কাগজটা তাতে ভরে টেপ দিয়ে মুখ আটকে দিল। খামটা নিয়ে গিয়ে আটকাল কুকুরের ঘরে ছাতের ভেতর দিকটায়।

'চলো, জলদি চলো,' জিনা বলল। 'টেবিলে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখলে রেগে যায় আব্বা।'

বকা খেতেই হবে, ধরে নিল সে। তবে খেতে হলো না। একটা জরুরী কাজে এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন পারকার আংকেল, কয়েকবার করে ডেকে তারপর বের করে আনতে হলো তাঁকে। টেবিলে আসতে বরং তিনিই দেরি করে ফেললেন।

খুশি মনে খেতে বসল ছেলেমেয়েরা। একটা রহস্যের কিনারা করতে না করতেই এসে হাজির হয়েছে আরেকটা রহস্য।

নকশা!

পাঁচ

সেদিন বিকেলেও আবহাওয়া ভাল রইল। তুষার পড়লেও অবশ্য ক্ষতি ছিল না। এই সময়টায় ভালই লাগে তুষার। ঘরে বসে লুডু-কেরম খেলা যায়। তবে পড়ল না। পরিষ্কার দিন। শুকনো। উজ্জ্বল। বাইরে বেরোনোর সুযোগটা হাতছাড়া করল না ওরা।

'চলো, সাইকেল নিয়ে বেরোই,' প্রস্তাব দিল জিনা।

'চলো,' রাজি হলো কিশোর। 'নকশা নিয়ে বিকেলেও বসা যাবে। এত

তাড়াহুড়ো নেই।'

কিশোরের পরামর্শে নীল ভালুকটা সাইকেলের স্যাডল ব্যাগে ভরে নিল রবিন।

'নিচ্ছ যে,' মুসা হাসল। 'ভয় লাগছে না? কেড়ে নিতে পারে ওরা...'

'খুব ভাল হয় তাহলে,' কথাটা ধরল কিশোর। 'ব্যাটাদের ওপর নজর রাখার একটা ব্যবস্থা হয় নিতে এলে। চোরাই মাল সহ হাতেনাতে ধরেও ফেলা যেতে পারে। জানা যাবে ওরা কারা।'

'ঠিক,' জিনা বলল। 'কড়া নজর রাখব আমরা। তবে রাখছি যে সেটা বুঝতে দেয়া চলবে না।'

'টোপ একবার গিললেই হয়,' মুসা বলল। 'চোরগুলোর পিছু নিয়ে গিয়ে ব্যাটাদের গোপন আস্তানা বের করে ফেলব। গিয়ে বলব পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে ধরবে...'

'হয়েছে, বক্‌বক্‌ থামাও এখন,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে সোজা করল, উঠে বসার জন্যে। 'কোথায় যাওয়া যায়? চলো, বনের দিকেই চলে যাই।'

কেউ অরাজি নয়।

গোবেল বীচের একধারে ছোট বন। সেখানে পৌঁছে সাইকেল রেখে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে জিরাতে লাগল কিশোর। দেখাদেখি অন্যেরাও তাই করল। তবে এ সময়টায় ঠাণ্ডা এত বেশি, বনের ভেতর ভাল লাগে না। বেশিক্ষণ থাকল না ওখানে ওরা। আবার সাইকেলে চেপে বসল।

ফেরার পথে ছোট একটা দোকান দেখে কিছু কেনাকাটার ইচ্ছে হলো রবিনের। দোকানটা নতুন খুলেছে। কাঠ কুঁদে নানা রকম খেলনা আর ঘর সাজানোর জিনিস বানিয়ে বিক্রি করে দোকানদার। চালাক-চতুর লোক।

দোকানের দেয়ালে সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকল ছেলেমেয়েরা। রাফিও ঢুকল। লোকটার তৈরি জিনিসপত্র দেখতে লাগল প্রশংসার দৃষ্টিতে। সালাদের বাটি, চামচ, কাঁটাচামচ, খেলনা, জীবজন্তুর মডেল, সবই কাঠের তৈরি। পুঁতির মালাও আছে অনেক রকমের। কেরিআন্টিকে উপহার দেয়ার জন্যে একটা সালাদের বাটি কিনল কিশোর।

রবিনের কিছু পছন্দ হলো না। কেনার মত জিনিস পেল না।

উপহার দেয়ার জন্যে মুসা কিনল একটা কাঠের অ্যান্টিক।

ঠাট্টা করে রবিন বলল, 'দেখো, এর ভেতর থেকে আবার কি বেরোয়।'

দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। বেরোতেই রবিনের চোখে পড়ল, সাইকেলের স্যাডল ব্যাগ খোলা। দৌড়ে গেল কাছে।

'হায় হায়,' চিৎকার করে উঠল সে। 'আমার ভালুক!'

তন্ন তন্ন করে খুঁজল ব্যাগটা, যদিও এত খোঁজার প্রয়োজন ছিল না। নেই তো নেইই। গায়েব হয়ে গেছে খেলনাটা।

ঠোঁট কামড়াল রবিন। 'আ-আমারই দোষ! আগেই তো আলোচনা হয়েছে, চুরি হতে পারে। তার পরেও মনে রাখলাম না কেন? ভুলে গেলাম কেন? নিশ্চয় কেউ নজর রেখেছে আমাদের ওপর। হয়তো বাড়ি থেকেই অনুসরণ করে এসেছে।

তারপর যেই সুযোগ পেয়েছে, নিয়ে চলে গেছে। ইস্, রাফিকে পাহারায় রাখলেও হত।'

'তোমার একার দোষ না,' জিনা বলল। 'দোষ আমাদের সবারই। এতটা পথ আমাদের অনুসরণ করে আসবে, কে ভাবতে পেরেছিল? তবে আমি তেমন কাউকে কিন্তু দেখিনি পথে, যাকে সন্দেহ করা যায়।'

'আমিও না,' মুসা বলল।

কিশোর কিছু বলছে না। চুপ করে ভাবছে। তার মনে পড়ছে এখন, মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ শুনেছিল, যখন সাইকেল রেখে দোকানে ঢুকছে ওরা, তখন। না না, ওরা যখন দোকানের ভেতরে ঢুকে গেছে, তখন।

'নিশ্চয় চোরটা,' চিন্তিত ভঙ্গিতে যেন নিজেকেই কথাটা বলল সে। 'একটা গাধা আমি! ছাগল! কেন পাত্তা দিলাম না!'

গালাগাল করার কারণ আছে। সব সময় এতটা বেখেয়াল হয় না। সে-জন্যেই এতগুলো জটিল রহস্যের সমাধান করতে পেরেছে। ভালুকটা চুরি যাওয়ায় একটা মূল্যবান সূত্র হারাল। চোরকে কাছে পাওয়ার জন্যে এটা একটা টোপ ছিল।

'এবার কি করব?' জিনার জিজ্ঞাসা।

'কি আর। পুলিশের কাছে যাব,' রবিন বলল। 'জিনিসটা তো চুরিই হয়েছে, নাকি? জিনিস চুরি গেলে পুলিশের কাছেই যেতে হয়।'

'পুলিশের কাছে?' মুসা যুক্তি দেখাল। 'গিয়ে কি বলব ওদেরকে? পঞ্চাশ পেন্স দামের একটা খেলনা চুরি গেছে? হেসে খুন হয়ে যাবে না।'

'হবে না,' গম্ভীর হয়ে বলল রবিন। 'যদি ওদেরকে বোঝাতে পারি, ভালুকটা কত দামী। আর নকশাটা দেখাই ওদের।'

'কিন্তু এখনই নকশাটার কথা পুলিশকে বলতে যাব না আমরা,' কিশোর বলল। 'একবার দিলে আবার কবে ফেরত পাব, কোনদিন পাব কিনা, ঠিকঠিকানা নেই। ব্যাপারটাকে ওরা সিরিয়াসলি নিলে অবশ্য আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু নেবে তো না।'

গ্রহণযোগ্য তেমন কোন যুক্তি অবশ্য দেখাতে পারল না সে। তবে সেজন্যে চাপাচাপিও করল না কেউ। ওদেরও তেমন ইচ্ছে নেই পুলিশকে দেয়ার। হাজার হোক, রহস্যটা ওদের। ওরাই এটা খুঁচিয়ে বের করেছে। নিজে নিজে সমাধান করতে পারলে মজাটা ষোলো আনা। তবে সেটা করার কোন উপায় আপাতত দেখতে পাচ্ছে না।

পথের ওপর দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা নিয়ে কয়েক মিনিট আলোচনা করল ওরা। তারপর সাইকেল নিয়ে আবার রওনা হলো।

চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল কিশোর। বলল, 'এই, শোনো, একটা বুদ্ধি করেছি! আমাদের সাথে চোরের সম্পর্ক এখনও কাটেনি। ভালুকটা নিয়ে গেছে একটা বিশেষ কারণে। নিশ্চয় এখন পেট কাটা হচ্ছে ওটার। ভেতরের জিনিসটা বের করার জন্যে। সকালে আমরা যা করেছিলাম।'

'তাতে কি?' বুঝতে পারছে না মুসা।

'কেটে কিছু পাবে না ওর ভেতরে, তুলা ছাড়া। অবাক হবে। পরীক্ষা করতে

বসবে তখন। নতুন করে সেলাই করা হয়েছে যে, দেখতে পাবে।'

'তাতেই বা কি?'

'কেন, বুঝতে পারছ না?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর। 'নকশাটা পাবে না! বুঝে ফেলবে, ওটা আমাদের হাতে পড়েছে!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'আবার আমাদের পিছে লাগবে তখন। ভালুকের ভেতরে যে জিনিসটা পেয়েছি, সেটা কেড়ে নেয়ার জন্যে। কিংবা চুরি করার জন্যে। এইবার আর চোখের আড়াল করব না আমরা ওকে। কড়া নজর রাখব।'

তবে কিশোরকে এতটা খুশি লাগল না। ভুরু কুঁচকে ফেলেছে। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'টোপটা কোথায় কিভাবে পাতব? ও জানছে না কোথায় রেখেছি আমরা নকশাটা। পেতে হলে পুরো গোবেল ভিলা আতিপাতি করে খুঁজতে হবে তাকে। সেটা করতে যাবে বলে মনে হয় না। সহজ উপায় একটাই আছে...'

'ঠিক!' বুঝে ফেলেছে জিনা। 'আমাদের একজনকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে! জোর করে কথা বের করবে মুখ থেকে!'

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল মুসার। 'কাছছাড়া হব না আমরা। কোনমতেই আলাদা হব না। আর রাফির মত একটা কুকুর পাহারায় রয়েছে আমাদের। তুলে নিয়ে যাওয়া কি মুখের কথা? অত সহজ না।'

'এমনও হতে পারে,' রবিন বলল। 'শুরুতে ওসব কিছুই না করে অন্যভাবে যোগাযোগের চেষ্টা করবে আমাদের সঙ্গে। এই যেমন টেলিফোন, কিংবা চিঠি।'

'তা না হয় করল,' কিশোর বলল। 'কিন্তু আমরা তো দিতে চাইব না। তখন বাধ্য করবে কিভাবে? তবে একটা কথা ঠিক, কোন না কোনভাবে যোগাযোগের চেষ্টা করবেই। তখন আমাদের কাজ হবে, বুদ্ধির খেলায় তাকে পরাজিত করা।'

সেই চেষ্টাই করা হবে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল চারজনে। তারপর অনেকটা হালকা মন নিয়ে ফিরে চলল গোবেল ভিলায়।

*

দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে ওরা কিছু একটা ঘটার। ঘটল না। সেদিন তো নয়ই, পরের দিনও না। নকশারও সমাধান হলো না। অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারল না কিছু।

তার পরদিন এত উজ্জ্বল রোদ উঠল, সৈকতে খেলতে বেরিয়ে পড়ল ওরা। সাগর শান্ত। বালি বেশ গরম। গায়ের কোটও খুলে ফেলতে হলো এক সময়।

সৈকতে আর কেউ নেই। যত খুশি চেঁচাতে পারল ওরা, যে ভাবে খুশি ছোটাছুটি করতে পারল। বিরক্ত হওয়ার কেউ নেই, ফলে ওদেরকেও অস্বস্তিতে থাকতে হলো না। সবচেয়ে বেশি লাফাচ্ছে রাফি, চেঁচামেচি করছে। এমন সব অঙ্গভঙ্গি করছে, হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে ছেলেমেয়েরা।

খেলায় এতই ব্যস্ত রয়েছে ওরা, মোটর সাইকেলটা আসার শব্দও শুনল না। সৈকতের ওপরের পথে এসে থেমে গেল ওটা।

টের পেল প্রথমে রাফি। পেয়েই খেলা থামিয়ে দিল আচমকা। ওপরের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে চাপা গরগর শুরু করল।

অবাক হলো কিশোর। ঘুরে তাকাল। অপরিচিত লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মাত্র কয়েক ফুট দূরে।

ছয়

এগিয়ে আসতে লাগল লোকটা। তরুণ বয়েসী। উঁচু গোড়ালি ঢাকা বুট পায়ে। মাথায় হেলমেট, মুখে টেনে দেয়া সামনের স্বচ্ছ অংশ, ফলে চেহারা দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট। গলায় জড়ানো একটা স্কার্ফ।

লোকটাকে অদ্ভুত লাগছে, বোধহয় মুখ ঠিকমত দেখা না যাওয়াতেই লাগছে ওরকম। লোকটাকে পছন্দ হয়নি রাফির। ভাল লোক হলে এমন রেগে যেত না সে। তাতে সবাই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। জিনা আর রবিন কাছাকাছি হয়ে গেল, যেন পরস্পরকে রক্ষা করার জন্যে। মুসার হাতে বল। ছোঁড়ার জন্যে নিয়েছিল। ধীরে ধীরে নামিয়ে নিল হাতটা। কি করবে বুঝতে পারছে না।

'এই যে,' এগিয়ে আসছে লোকটা। 'খেলছ বুঝি? রোদটাও ভাল উঠেছে, না? খেলার মতই।'

আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরই ফাঁস করে দিল সব মেকি। তার কথা একটুও ভাল লাগল না ছেলেমেয়েদের।

'হ্যাঁ,' মুখ গোমড়া করে রেখে জবাব দিল মুসা। 'ভালই দিন। কিন্তু তাতে কি?'

মিষ্টি কথা বলে সুবিধে হবে না বুঝে গেল লোকটা। তাই আর ওসবের মধ্যে গেল না। তার আসল চেহারায় ফিরে এল। কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তাতে? কাগজটা কই?'

চুপ হয়ে গেল মুসা। জিনা বলল, 'কিসের কাগজ?'

'দেখো, ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা কোরো না। ভাল করেই জানো কিসের কাগজ। নীল খেলনা ভালুকটার মধ্যে ছিল।'

কিশোর বলল, 'কি বলছেন কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আর ভালুকটাও নেই। কোন্ শয়তান লোক জানি সাইকেলের স্যাডল ব্যাগ থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। বিশ্বাস না হলে ওকে জিজ্ঞেস করুন,' রবিনকে দেখাল সে। 'ওর ছিল। হারিয়ে খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। বেচারি।'

কিশোরের কথার সমর্থনে মাথা ঝাঁকাল রবিন। দুঃখ দুঃখ ভাব ফুটিয়ে তুলল চেহারায়।

কঠিন দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল লোকটা, 'মিথ্যে কথা তো ভালই বলতে পারো। তবে ওসব কেচ্ছা গেলাতে পারবে না আমাকে। খেলনাটা চুরি হয়েছে, বিশ্বাস করছি, কিন্তু নকশাটা নেই ওর মধ্যে। তারমানে তোমাদের হাতেই পড়েছে।'

চট্ করে পরস্পরের দিকে তাকাল মুসা আর কিশোর। বেশি কথা বলে

ফেলেছে লোকটা। নিজের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছে। সে জানে নকশাটা নেই খেলনার ভেতরে। তার অর্থ হয় সে-ই চুরি করেছে, কিংবা তার কোনও দোস্ত। 'নকশা' বলেছে, শুধু কাগজ বলেনি, সুতরাং ওটা নকশাই। কিশোরেরা আন্দাজ করেছিল বটে ওরকম কিছুই হবে, কিন্তু নিশ্চিত ছিল না। এখন হলো।

যাক, এক চোরের দেখা পাওয়া গেল। এখন খুব বুদ্ধি করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে চাল চালতে হবে, যাতে ওদের ফাঁদে ফেলা যায়।

কিন্তু গোলমাল করে দিল রাফি। সে খুব বুদ্ধিমান কুকুর, সন্দেহ নেই, তবে কুকুরের তুলনায় বুদ্ধিমান। মানুষের তুলনায় কিছুই না। মানুষের মত মাথা খাটিয়ে, চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করতে পারে না। যা করার সহজাত প্রবৃত্তির বশেই করে ফেলে। এখন তার প্রবৃত্তি বলল, লোকটা খারাপ, তার বন্ধুদেরকে হুমকি দিচ্ছে, ক্ষতি করতে চায়, তার মত একটা কুকুরের উচিত তাকে তাড়ানো।

কাজেই সেই কাজই করে বসল রাফি। আক্রমণ করে বসল লোকটাকে। লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার পা কামড়ে ধরল সে। পায়ে মোটা চামড়ার ভারী বুট থাকায় কামড়টা মাংসে বসল না, বেঁচে গেল লোকটা। তবে ভয় যেমন পেল, রেগে গেল তেমনি।

'শয়তান! কুত্তা!' চেঁচিয়ে উঠল সে। পকেট থেকে একটা কশ (সীসা ভরা পাইপ) টেনে বের করে জোরে এক বাড়ি মারল রাফির মাথায়। টুঁ শব্দটিও আর করতে পারল না কুকুরটা। বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। নড়লও না আর।

'রাফি!' চিৎকার করে উঠল জিনা। হাঁটু গেড়ে বালিতে বসে পড়ল কুকুরটার পাশে। 'আপনি···আপনি আমার রাফিকে মেরেছেন! পস্তাতে হবে! এর জন্যে পস্তাতে হবে আপনাকে! আমরা আপনাকে ছাড়ব না···' ফুঁসতে থাকল সে।

'চুপ!' ধমক লাগাল লোকটা। 'তুমিও যদি ওরকম একটা বাড়ি খেতে না চাও, চুপ করে থাকো!'

রাগে ফেটে পড়বে যেন মুসা আর জিনা। আগে বাড়ল। লোকটার ওপরে ঝাঁপিয়েই পড়বে বুঝি।

খেঁকিয়ে উঠল লোকটা, 'এই, থামো! ভাল চাইলে আর এক পা এগোবে না!' কশটা মাথার ওপর তুলল সে, বাড়ি মারার ভঙ্গিতে। 'এখানে খেলতে আসিনি আমি। আবার জিজ্ঞেস করছি। ভালুকের ভেতরে যে নকশাটা পেয়েছ সেটা কোথায়?'

একটা কথাও বলল না মুসা, জিনা আর রবিন। কিশোর তো যেন শুনতেই পায়নি। এক জায়গায় পাথরের খাঁজে জমে রয়েছে পানি। বোধহয় তুষার গলেই হয়েছে। আঁজলা ভরে তুলে এনে ছিটিয়ে দিতে লাগল রাফির নাকেমুখে।

জোরে জোরে নাক টানছে রবিন। তার দিকে ফিরল লোকটা। বলল, 'এরা তো মুখ খুলবে না। তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি। সত্যি সত্যি বলবে। নকশাটা কোথায়?'

রাস্তার দিকে তাকাল রবিন। যদি কেউ আসে? কিন্তু কেউ আসছে না। ওদেরকে বাঁচানোর মত কেউ নেই কোথাও। কাঁপা গলায় বলল, 'আমি···আমি···মানে আমার কাছে নেই।···এখানে নেই আরকি। ওটা রয়েছে আমার আংকেলের বাড়িতে লুকানো!' মনের সমস্ত সাহস এক করে জোর গলায়

বলল, 'কোথায় আছে বললাম, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না আপনার। গোবেল ভিলাকে টুকরো টুকরো করে ফেললেও বের করতে পারবেন না। পাবেন না ওটা। এমন জায়গায় লুকানো হয়েছে।'

রবিন ভেবেছে এ রকম করে বললেই লোকটা নিরাশ হয়ে চলে যাবে। গেল তো না-ই, তাকে আতঙ্কিত করে দিয়ে হা হা করে হেসে উঠল সে।

'হাহ্ হাহ্ হাহ্! হোহ্ হোহ্ হোহ্! বোকা ছেলে! তুমি কি ভেবেছ আমি আনতে যাব ওটা? এত কষ্ট করব? কক্ষনো না। সেধে গিয়ে ধরা দেব ভেবেছ?'

হাসি থামিয়ে দিল হঠাৎ। 'হ্যাঁ, এখন লক্ষ্মী হয়ে যাও সবাই। ভালয় ভালয় দিয়ে দাও ওটা। কাল পর্যন্ত সময় দিলাম। কাল দুপুর বারোটার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। ওই পাথরটার তলায় চাপা দিয়ে রাখবে।'

কশটা দোলাল আরেকবার, ওদেরকে দেখিয়ে। হুমকি দিল। 'এ সম্পর্কে পুলিশকে কিংবা আর কাউকে যদি একটা বর্ণ বলো, ভাল হবে না মনে রেখো। আর নকশাটা না দিলেও খারাপ হবে। খুব খারাপ, শুধু এটুকুই বললাম, হ্যাঁ!'

ওরকম করে সিনেমায় হুমকি দেয় খারাপ চরিত্রের লোকেরা দেখেছে ওরা। কেমন হাস্যকর লাগে ওখানে। তবে বাস্তবে সেটা মোটেও হাস্যকর লাগল না ওদের কাছে। যা বলছে, করবে লোকটা। মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না।

'কি, বুঝেছ?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মুসা। 'পাবেন আপনার নকশা।' নিচু স্বরে লোকটা যেন বুঝতে না পারে এমন ভাবে অভিশাপ দিল, 'সেটা তোমার গলায় ঢুকে গিয়ে যেন দম বন্ধ করে মারে!'

কশটা পকেটে রেখে দিল লোকটা। 'কাল দুপুর বারোটা। মনে থাকে যেন।'

ঘুরে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সে। উঠে গেল সৈকতের ওপরের রাস্তায়। নীরবে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েন্দারা। তখনও রাফির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে কিশোর। হুঁশ ফিরছে কুকুরটার।

'হ্যাঁ, নকশা তুমি পাবে,' রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'ঠিক সময়েই। তবে সেটা দিয়ে কোন লাভ হবে না তোমার।'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল মুসা। 'কি বললে?'

'নকশা একটা দেব তাকে, তবে নকল। আসলটা দিয়ে দেব, এত বোকা নাকি আমি।'

'ওই, যাচ্ছে,' রবিন বলল।

রাস্তায় মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন স্টার্ট নিল।

খেলা আর জমবে না। রাফি দুর্বল হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে গিয়ে এখন খেতে দেয়া দরকার। তারপর লম্বা একটা ঘুম।

'ওঠ, রাফি, ওঠ,' ডাকল কিশোর। 'লক্ষ্মী ছেলে, ওঠ। তোর আর কি দোষ? পেছন থেকে মেরে তো অনেক বাহাদুরকেও চিৎ করে ফেলা যায়। নইলে কি আর ছাড়তি? এতক্ষণে কামড়ে হয়তো কিমাই বানিয়ে ফেলতি।'

'তারপর সেই কিমাগুলো পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে চুলায় চাপিয়ে দিত,' হেসে বলল মুসা।

দুর্বল কণ্ঠে রাফি বলল, 'ঘাউ!' কিমার চেয়ে হাড়ই তার বেশি পছন্দ।

*

বাড়ি ফিরে নিজের বিছানার পায়ের নিচে কার্পেটে রাফিকে আরাম করে শুইয়ে দিল জিনা। তারপর সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসল। উঠে চলে গেল মুসা। নকশাটা আনতে। কুকুরের ঘর থেকে ওটা খুলে এনে টেবিলে বিছাল।

'তুমি তো বললে, একটা নকল নকশা দেবে,' কিশোরকে বলল মুসা। 'পাবে কোথায়?'

'আঁকব,' জবাব দিল কিশোর। 'বানিয়ে বানিয়ে দেব একটা এঁকে। দেখতে যাতে এটার মতই লাগে। তাহলে প্রথমে ধোঁকা খাবে মোটর সাইকেলওয়ালা লোকটা। নিয়ে চলে যাবে। বুঝবে, আসল নয়। আবার লাগবে তখন আমাদের পেছনে।'

'তাহলে কাগজও একই ধরনের ব্যবহার করতে হবে,' রবিন বলল।

'আগেই ভেবেছি সেটা,' হেসে বলল কিশোর। 'সাধারণ কাগজ। সাদা খাতা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে ওরা। ইস্কুলে যেগুলো ব্যবহার করি আমরা। আমরাও ওরকমই একটা পাতা নেব...'

'খুব সাবধানে আঁকতে হবে,' মুসা বলল। 'দেখতে যেন একেবারে আসলের মত লাগে।'

'তা লাগবে। শোনো, আরও সহজেই কাজটা করা যায়। এটার ওপরেই ছাপ দিয়ে আঁকতে পারি। কিছু কিছু জায়গা সামান্য বদলে দিলেই হবে।'

প্রশংসার দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'ভাল বুদ্ধি বের করেছ।'

নকশাটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। নিজেকেই যেন বলল, 'হ্যাঁ, হবে।' জিনার কাছ থেকে একটা খাতা চেয়ে নিয়ে একটা পাতা ছিঁড়ে নিল। তারপর গিয়ে বসল জানালার কাছে, আলো বেশি পাওয়ার জন্যে। ছাপ দিয়ে আঁকতে সুবিধে হবে। একটা ট্রেসিং পেপার আর বলপেন নিয়ে কাজ শুরু করল। 'আঁকাটা খুব সহজ। কঠিন হলোগে আসল নকশাটার মানে বোঝা। ঘোড়ার ডিম কিছুই বোঝা যায় না।'

কয়েক মিনিট পর ট্রেসিং পেপারে আঁকা হয়ে গেল। সেটাকে তখন সাদা কাগজের ওপর রেখে জোরে চাপ দিয়ে রেখাগুলোর ওপর কলম বোলাতে লাগল কিশোর। নিচের কাগজে দাগ পড়ে যাবে। তখন তার ওপর কলম বুলিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে নকশা। বদলাতে হলে ট্রেসিং পেপারেই বদলাতে হবে। যাতে নিচে ভুল চাপ পড়ে। তা-ই করতে লাগল সে।

'হয়েছে!' কিছুক্ষণ পর সন্তুষ্ট হয়ে মুখ তুলল কিশোর। 'চমৎকার! সামনে রেখে দুটো মিলিয়ে দেখেও সহজে ধরা যায় না।'

'হ্যাঁ, খুব ভাল,' উত্তেজিত হয়ে বলল মুসা। 'দারুণ এঁকেছ। চোরেরা বুঝতেই পারবে না কিছু। আর যখন বুঝবে, দেরি হয়ে যাবে তখন। আমরা সময় পেয়ে যাব কিছু করার।'

'সংখ্যা আর লেখাগুলোর ব্যাপারে কি হবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'সংখ্যা আর লেখা?' ভুরু কোঁচকাল মুসা।

'দেখছ না, লেখা রয়েছে এন এস ই ডব্লিউ। এর মানে নিশ্চয় নর্থ সাউথ ঈস্ট ওয়েস্ট বোঝাতে চেয়েছে। তারপর রয়েছে সংখ্যা।'

'লেখাও লিখব,' কিশোর বলল। কিছু নকশা দেখে, কিছু বানিয়ে বানিয়ে লিখতে শুরু করল সে। যা মাথায় এল।

অবশেষে শেষ হলো কাজ।

'ব্যস,' বলল সে। 'এখন শুধু এটা তুলে নেয়ার অপেক্ষা। কাল গিয়ে বসে থাকব। মোটর সাইকেলওলা নিতে এলে সাইকেল নিয়ে অবশ্যই তার পিছু নিতে পারব না। তবে ভাল একটা সূত্র পেয়ে যাব। মোটর সাইকেলের নম্বর। কে জানে, ওই একটা সূত্রই হয়তো ওর দোস্তদের কাছে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে আমাদের। হয়তো দলবল সহ ধরিয়ে দিতেও। সমাধান হবে নীল ভালুক রহস্যের।'

সাত

পরদিন সকাল দশটায়ই সৈকতে চলে এল গোয়েন্দারা। লোকটা বলে গেছে বারোটায় আসবে। এর আগে ওর আসার আশা করেও লাভ নেই। কিন্তু বলা যায় না। অতি উত্তেজনায় চলেও আসতে পারে। তাই আগেভাগেই চলে এসেছে ওরা।

লুকোছাপার ধার দিয়েও গেল না সে। সহকারীদের নিয়ে সোজা নেমে এল সৈকতে। কেউ যদি ওদের ওপর নজর রেখে থাকে, রাখুকগে।

প্লাস্টিকের একটা ব্যাগে ভরে নকল নকশাটা নিয়ে এসেছে কিশোর। নির্জন সৈকত। কাউকে চোখে পড়ল না। আগের দিনের মতই। যে পাথরের নিচে ওটা রাখতে বলেছে, সেটার নিচেই রেখে দিল সে। তারপর সবাইকে নিয়ে ফিরে চলল গোবেল ভিলায়।

কিন্তু বাগানের ভেতরে ঢুকে গেটটাও বন্ধ করতে পারল না মুসা, 'জলদি চলো!' বলে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। শুরু হলো তার পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ। দৌড়ে বাগান পেরিয়ে, বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে চলে এল পেছনের গেটের কাছে। সেটা দিয়ে বেরোলে আরেকটা সরু গলিপথ পড়ে, দু'পাশে উঁচু বালির পাড়। পথটা দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে একেবারে পাড়ের কিনারে এসে না দাঁড়ালে দেখা যায় না।

বেশ ঘুরে গেছে পথটা। তবু ওটা দিয়ে সৈকতে যাওয়ার রাস্তায় উঠতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না।

'লুকাব কোথায়?' জানতে চাইল রবিন।

বাস স্টপেজের পাশে ছোট একটা ছাউনি আছে, রাস্তা দিয়ে কিছুদূর গেলেই পড়ে। সেটা দেখাল কিশোর। 'ওটার পেছনে। কাল এখানটাতেই কোথাও মোটর সাইকেল ফেলে গিয়েছিল লোকটা।'

রাফিকে শান্ত থাকতে বলল সে। বুঝতে পারল কুকুরটা। নীরবে চলল ওদের সাথে সাথে। এ রকম খেলা তার জন্যে নতুন নয়, আগেও বহুবার খেলেছে। ব্যাপারটা ভালই লাগে তার। শিক্ষিত কুকুর সে। কিশোরের আদেশ একটুও অমান্য

করল না।

অনেকক্ষণ কিছুই ঘটল না। বারোটার বাস এল। থামল না। সোজা চলে গেল গোবেল বীচের দিকে। এই ছাউনিটায় এমনিতে থামে না বাস। কেউ যদি নামতে চায়, তাহলে শুধু থামে। আজ এখানকার কোন যাত্রী নেই। ফলে থামল না।

'এবার সতর্ক থাকতে হবে,' মুসা বলল। 'বারোটা বাজে। যে কোন সময় এসে হাজির হতে পারে লোকটা।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল জিনা।

'ওই যে,' হাত তুলল মুসা। 'একটা মোটর সাইকেল আসছে।'

কিন্তু থামল না মোটর সাইকেলটা। চলে গেল। কয়েক মিনিট পর গেল একটা কোচ। তারপর একটা লারি। এবং তারপর···

'চুপ! নোড়ো না!' একটানে জিনাকে ছাউনির আড়ালে নিয়ে এল কিশোর। 'ওই লোকই!'

ছাউনির পেছনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে ওরা। পারলে দেয়ালের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে ফেলতে চায়। শোনা যাচ্ছে মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ। বাড়ছে··· বাড়ছে···থেমে গেল। উঁকি দিতে ভয় পাচ্ছে গোয়েন্দারা। যদি লোকটা দেখে ফেলে? শেষে আর থাকতে পারল না মুসা, মাথা বের করে দিল একপাশ দিয়ে।

'হ্যাঁ, মোটর সাইকেল!' ফিসফিসিয়ে বলল সে। 'পথের অন্যপাশে রেখেছে। সৈকতের কিনারে। ওপরে। চলো, দেখি কি করে।'

সাবধানে রাস্তা পেরোল ওরা। কোন শব্দ করছে না। রাস্তাটা পেরিয়েই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে চলে এল ঢালের কিনারে।

গলা বাড়িয়ে তাকাতেই দেখল, নেমে গেছে লোকটা। পাথরের দিকে এগোচ্ছে।

'নকশাটা তুলতে যাচ্ছে,' জানাল কিশোর। 'জলদি করতে হবে। সময় নেই।'

সরে চলে এল চারজনেই। দ্রুত হাতে মোটর সাইকেলের নম্বর লিখতে শুরু করল রবিন। মুসা আর রাফি চুপ করে দেখছে। ক্যারিয়ার বক্স খুঁজছে কিশোর আর জিনা। আশা করছে এমন কোন কিছু পেয়ে যাবে, যেটা চোরকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবে।

ভাগ্য ওদের পক্ষে। একটা চিঠি পেল জিনা। তাতে নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে। 'কে পাঠিয়েছে সেটা লেখা থাকলে ভাল হত!' বিড়বিড় করল কিশোর। ঠিকানাটা পড়ে ফেলেছে। মিস্টার ডন হারভে। মিডলটন। জায়গাটা গোবেল বীচের কাছেই।

যেখানে পেয়েছিল খামটা আবার সেখানে রেখে দিল জিনা। একেবারে সময়মত।

চাপা ঘাউ করে উঠেছে রাফি। লোক আসছে, বুঝিয়ে দিল।

'আসছে!' রাফির পর পরই বলে উঠল রবিন। সৈকতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'ফিরে আসছে লোকটা!'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখান থেকে সরে এল ওরা। এমন কিছু করল না যেটা

অস্বাভাবিক লাগে।

গোবেল ভিলায় ফিরে এসে আবার মাথা ঘামাতে বসল।

'তেমন কিছুই পেলাম না,' জিনা বলল। মাঝে মাঝে হতাশার কথা শোনানো তার স্বভাব। তবে ঠিকই করে। সব সময় আশার কথা শোনালে অনেক সময় খারাপ হয়।

'কে বলল!' কথাটা পছন্দ হলো না কিশোরের। 'অনেক পেয়েছি। এত যে পাব সেটাই আশা করিনি। মোটর সাইকেলের নম্বর বড়জোর ওটার মালিকের সন্ধান দিত আমাদের। কিন্তু এখন ওই খামের ঠিকানা তার নাম-ধামও জানিয়ে দিল।'

খুশি হতে পারল না জিনা। মাথা নাড়ল। 'কি করে জানছি ওটা ওরই নাম? সে ডন হারভে না-ও হতে পারে। হয়তো চুরি করেছে মোটর সাইকেলটা। কিংবা চেয়ে এনেছে। চিঠিটা হয়তো মোটর সাইকেলের আসল মালিকের।'

অযৌক্তিক কথা বলেনি জিনা। তবু মানতে পারল না কিশোর। 'জিনা, এত হতাশার কথা বলো কেন! তোমার বরং বলা উচিত মোটর সাইকেল আর ওই খামের নাম-ঠিকানা লোকটারই।'

'বেশ, না হয় বললাম। তাতে কি?'

'তাতে আলোচনাটা চালিয়ে যেতে পারি আমরা। অনুমান করে। ভুল হতেই পারে। হলে হবে। তখন আবার নতুন উপায় বের করব। আগেই না না করে সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে বসে থাকলে তো আর কাজ হবে না।'

'কিশোর ঠিকই বলেছে,' জিনার দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।

'হ্যাঁ, আলোচনা চালানোই উচিত,' রবিন বলল। 'দেখাই যাক না কিছু বেরোয় কিনা।'

কিন্তু সেটা আর হলো না। খাবারের ডাক পড়ল। ডাকতে এলেন কেরিআন্টি। ডাইনিং রুমে যেতে হলো ওদের।

যাবার আগে কিশোর বলল, 'আজ বিকেলে মিডলটনে যাব আমরা। গোবেল বীচের কাছে হয়ে থাকলে বেশি সময় লাগবে না যেতে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে। ওতে কিছু হবে না। অল্পস্বল্প বৃষ্টিতে ভিজে অভ্যেস আছে আমাদের, কি বলো?'

অল্পস্বল্প কেন, মুষলধারে নামলেও অ্যাডভেঞ্চারের এই পর্যায়ে গোয়েন্দাদেরকে থামাতে পারত না বৃষ্টি। সেটা বুঝেই যেন বিকেলের শুরুতেই থেমে গেল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ততক্ষণে মিডলটনের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। রাফি খুশি হলো বৃষ্টি থেমে যাওয়ায়। শরীর ভেজাতে ভাল লাগে না তার, বিশেষ করে এই আবহাওয়ায়। সাঁতার কাটাটা অবশ্য আরেক রকম মজা, তাতে কিছু মনে করে না সে।

মিডলটনের বাইরে সাইকেল রেখে হেঁটে গাঁয়ের ভেতর ঢুকল ওরা। ঢোকার মুখেই বিশাল এক অ্যালসেশিয়ানের সঙ্গে দেখা, এদিকেই আসছে। কাছে এসে বেশ গুরুগম্ভীর চালে রাফির শরীর শুঁকল কুকুরটা। মুরুব্বিয়ানা দেখিয়ে বলল, 'গার্‌র্‌র্‌র্!'

রাফি বুঝতে পারল তার ভাষা। কুকুরটা বলেছে, 'এই আজব কুত্তাটা আমাদের গাঁয়ে কি করছে?' সে একই সুরে জবাব দিল, 'ঘাউ! ঘাউ! ঘাউ!' অর্থাৎ, 'আমাকে পছন্দ না করতে পারলে শুনে রাখো, তোমাকেও আমি পারছি না!'

'গার্‌র্‌!' খেঁকিয়ে উঠল অ্যালসেশিয়ান। 'শয়তান কোথাকার!'

রাফিও কম যায় না। রেগে গিয়ে কুকুরের ভাষায় গালাগাল শুরু করে দিল। হাবভাবে মনে হলো চ্যালেঞ্জ করে বসেছে বড় অ্যালসেশিয়ানটাকে।

'গার্‌র্‌র্‌!' ধাড়িটাও কি আর কম যায়।

কেউ বাধা দেয়ার আগেই বেধে গেল ঝগড়া। ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা আরেকটার ওপর। রাস্তার কাদার ওপরই গড়াগড়ি শুরু করল দুটো কুকুর। কামড়াকামড়ি, চেঁচামেচি, খামচা-খামচি এবং এই জাতীয় যত রকম ব্যাপার আছে কোনটাই বাদ রাখছে না।

শোরগোল শুনে বেশ কিছু গ্রামবাসী বেরিয়ে এল ঘরের দরজায়। জিনা লজ্জায় পড়ে গেছে। রাফিকে এখানে আনতে চাপাচাপি করায়। যতটা ভদ্রভাবে আর নীরবে সম্ভব গ্রামে ঢুকে খোঁজখবর করে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তা আর হলো না।

রাফিকে সরে আসার জন্যে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে কিশোর। কে শোনে কার কথা। লড়াইয়ে মশগুল এখন দুই কুত্তা। কে কাকে পরাজিত করবে, সেই চেষ্টা। এখন কি আর শোনার সময় আছে নাকি। লোকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। হাসাহাসি করছে। কথা বলছে জোরে জোরে। এ রকম একটা লড়াই দেখতে পেয়ে যেন খুশিই হয়েছে। বাজি ধরতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

'পঞ্চাশ পেন্স,' বলল একজন। 'বড় কুত্তাটার ওপর। ওটা ভারী বেশি। জোরও বেশি।'

'ছোটটাও কম না,' আরেকজন বলল। 'বয়েস আরেকটু বাড়লে বাঘের বাচ্চা হবে!'

'এখন তো ছোট। পারবে না,' বলল তৃতীয় আরেকজন। 'আর ওটা টাইগার। ডেভির কুকুর। ছোটটাকে খুনই করে ফেলবে।'

'না না!' চিৎকার করে উঠল জিনা। লোকগুলোর কথা শুনে ভয় পেয়ে গেছে।

'আমি ছোটটার ওপর পঞ্চাশ পেন্স!' বলল অন্য আরেকজন লোক। 'করছে কি দেখো! এত মার খেয়েও গলার কামড় ছাড়ছে না! এ রকম কিছুক্ষণ থাকতে পারলেই টাইগারের বারোটা বাজবে!'

'ওই যে, ডেভি আসছে,' একটা ছেলে বলল।

লম্বা, শক্তিশালী একজন মানুষ এগিয়ে এল। 'করছেটা কি দেখো!' চিৎকার করে বলল সে। 'এ রকম কাণ্ড তো করেনি কখনও! এই টাইগার! টাইগার! ছাড়, ছাড় বলছি!' সামান্যতম দ্বিধা করল না লোকটা। উন্মত্ত লড়াইয়ের একেবারে মধ্যিখানে গিয়ে দাঁড়াল। দু'হাতে দুটো কুকুরের ঘাড় চেপে ধরে জোর করে টেনে ছাড়াল।

ঝাঁকি দিয়ে তার হাত থেকে ছোটার চেষ্টা করছে কুকুর দুটো। আবার গিয়ে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। ছাড়ল না লোকটা। রেগে উঠে বলল, 'রক্ত বেশি গরম হয়েছে? পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলব। সর্‌, যা!'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল জিনা। রাফির কলার ধরে টেনে সরিয়ে নিল। বড় কুকুরটাকে নিয়ে চলে যেতে লাগল ডেভি। টাইগারের যাবার ইচ্ছে নেই। বার বার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে, আর রাফিকে ধমক মারছে।

রাফির কতটা ক্ষতি হয়েছে দেখতে বসল জিনা। যতটা ভয় পেয়েছিল ততটা জখম হয়নি। একটা কান থেকে রক্ত পড়ছে। গলার কাছে কিছু আঁচড়, রোম উঠে গেছে। আরও কয়েক জায়গায় নখের আর দাঁতের দাগ রয়েছে। কোন কোনটা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে।

'ভেবো না,' মুসা বলল জিনাকে। 'ঠিক হয়ে যাবে। কিছু হয়নি।'

'কানটা তো ছিঁড়েছে!' দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে জিনা। মুসার মত কিছু হয়নি বলে উড়িয়ে দিতে পারছে না।

'ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে,' কিশোরও চিন্তিত। 'অষুধ-টষুধ লাগানো দরকার। এ গাঁয়ে ওষুধের দোকান আছে?' জিনার দিকে তাকাল সে।

কুকুরের লড়াই দেখার জন্যে দুটো ছেলে বেরিয়ে এসেছিল। তারা এগিয়ে এল গোয়েন্দাদের দিকে। আন্তরিক হাসি হেসে দু'জনের মাঝে বড়টা জিজ্ঞেস করল, 'কিছু দরকার? দারুণ একটা কুত্তা তোমাদের! এত বড় অ্যালসেশিয়ানটাকে যে মার মারল! বয়েসকালে সত্যিই বাঘের বাচ্চা হবে! অ, আমার নাম রবি। এ আমার ভাই টেড। কাছেই আমাদের বাড়ি।' রাফির ছেঁড়া কানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এক কাজ করো না। চলে এসো আমাদের বাড়িতে। স্পিরিট-টিরিট দিয়ে মুছে ওষুধ লাগিয়ে দেব।'

কথাটা মন্দ না। ভেবে দেখল কিশোর। রাজি হয়ে গেল সে।

রবি আর টেডের বাবা-মা বাড়িতে নেই। তবে যা যা দরকার সেগুলো পেতে বাবা-মাকে দরকার হলো না। বাথরুমের ওষুধ রাখার বাক্সেই পাওয়া গেল সব। লড়াইয়ের সময় যে রাফি এতটা সাহসের পরিচয় দিয়েছে, ওষুধ লাগানোর সময় সে-ই একেবারে ভীতুর ডিম হয়ে গেল। কিছুতেই জখমে স্পিরিট লাগাতে দেয় না।

অনেক কায়দা-কসরৎ করে তারপর লাগাতে হলো। সময় লেগে গেল বেশি।

আসল কাজের সুযোগ মিলল এতক্ষণে, যা করতে এসেছিল ওরা। তদন্তটা ওবাড়ি থেকেই শুরু করল। নব পরিচিত বন্ধুদের জিজ্ঞেস করল মোটর সাইকেলওয়ালা লোকটার কথা। প্রশ্ন করল বেশ চালাকির সঙ্গে, যাতে ছেলে দুটো কিছু সন্দেহ করতে না পারে।

'গ্রামটা কিন্তু খুব সুন্দর,' মুসা বলল। 'লোকজনও ভালই মনে হচ্ছে।'

'ঠিক,' তার সঙ্গে সুর মেলাল কিশোর। 'মনটন বেশ ভাল। ডেভি রাগ করল না। নিজের কুকুরটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।'

'এখানকার একটা লোককে অবশ্য পছন্দ হয়নি আমার,' জিনা বলল। ছেলে দুটোর দিকে তাকাল। 'চেনো নাকি তাকে? মোটর সাইকেল আছে। আরেকটু হলেই চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিল আমাকে। অল্প বয়েসী। এই তেইশ-চব্বিশ হবে। ওর মুখ দেখতে পাইনি। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা প্যাকেট পড়ে গেল। নাম-ঠিকানা লেখা। ভাবছি ওটা ফিরিয়ে দেব। নামটা হলো কি যেন…ও, ইয়ে, ডন হারভে।'

'ডন হারভে!' চেঁচিয়ে উঠল টেড। 'ঠিকই আছে। তাকে তোমাদের ভাল লাগেনি, লাগার কথাও নয়। তোমাদের আর দোষ দেব কি, আমরাও দেখতে পারি না! ভীষণ পাজি লোক!'

আট

'চেনো নাকি তাকে?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'ডন হ্যারভেই তো নাম?'

'মিডলটনের সবাই চেনে ওকে,' জবাব দিল রবি। 'এ গাঁয়ের সে কুলাংগার, বড়রা তাই বলে। দেখো বাড়ি গিয়ে, পাবে বলে মনে হয় না। বেশির ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে থাকে। কি করে আল্লাই জানে! ভাল কিছু করে বলে তো মনে হয় না। বড় ভাইয়ের সঙ্গে থাকে। ওই লোকটা ভাল। ডনের এ সব কাণ্ডকারখানায় সাংঘাতিক বিরক্ত।'

'ডনকে তাহলে কোথায় পাওয়া যাবে?' জানতে চাইল কিশোর।

'কে জানে!' রবি বলল। 'মোটর সাইকেল নিয়েই ঘোরে সারাক্ষণ। তা নাহলে হাই স্ট্রীটের গ্র্যান্ড কাফেতে বসে থাকে। থাকার কোন ঠিকঠিকানা নেই তার।'

'নামেই গ্র্যান্ড,' টেড বলল। 'আর কিছু নেই। আহামরি কিছু নয়। মিডলটনের সমস্ত শয়তান লোকগুলো গিয়ে বসে ওখানে, আড্ডা মারে। ডন প্রায়ই বলে, তার একটা কাজ দরকার। সেজন্যেই নাকি গ্র্যান্ড কাফেতে যায়, কাজ জোগাড়ের জন্যে। নানা ধরনের লোক আসে ওখানে, কে যে কখন কাজ দিয়ে ফেলবে বলা যায় না। কাজ অবশ্য একটা না একটা পেয়েই যায় সে। তবে ধরে রাখতে পারে না। অল্পদিনও টেকে না। কাজটা ভাল না বলে ছেড়ে দিয়ে চলে আসে। আব্বা বলে অন্য কথা। কাজের লোকই নাকি নয় ও।'

'চিনব কি করে তাকে? গ্র্যান্ড কাফেতে যদি পাই?' জিজ্ঞেস করল জিনা। 'মোটর সাইকেলের পোশাকে দেখেছি তাকে। হেলমেট পরা। চেহারা দেখিনি।'

'পাতলা, লম্বাটে মুখ, যেন একটা ইঁদুর। কথা বলে ক্যাঁচক্যাঁচ করে, দরজার কব্জায় তেল না থাকলে যে রকম শব্দ হয়।'

টেডের মুখে লোকটার চেহারার বর্ণনা শুনে না হেসে পারল না গোয়েন্দারা। তারপর দুই ভাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল। আবার বেরোল পথে।

'চলো, গ্র্যান্ড কাফেটা ঘুরেই আসি একবার,' কিশোর বলল। 'হয়তো পেয়েও যেতে পারি আমাদের চিড়িয়াকে।'

'যা শুনলাম,' মুসা বলল। 'আজব চিড়িয়াই মনে হলো। একের পর এক কাজ বদলায়। মোটর সাইকেল নিয়ে ঘোরে। বাকি সময় কাফেতে বসে থাকে। চুরিদারিগুলোতে সে জড়িত থাকলে মোটেও অবাক হব না।'

মিডলটন জায়গাটা বড় না। মাত্র দুটো কাফে আছে। তার মধ্যে একটা হলো গ্র্যান্ড কাফে। নোংরা, মলিন একটা বাড়ি। ভেতরে কান ঝালাপালা করে দিয়ে ভীষণ জোরে মিউজিক বাজছে। ডনের মোটর সাইকেলটা দেখা গেল কাফের বাইরে। থমকে গেল গোয়েন্দারা। কি করবে ঠিক করতে পারছে না।

'জানালা দিয়ে উঁকি দেয়া উচিত হবে না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'আমাদের ওপর ডনের চোখ পড়লে সব শেষ। আর এগোতে দেবে না। হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। কিচ্ছু খুঁজে বের করতে পারব না তখন।'

রাস্তার অন্য পাশে কয়েকটা গাড়ি দেখিয়ে মুসা বলল, 'ওগুলোর পাশে লুকালে কেমন হয়? ও কোথায় আছে, জানি। এক সময় না এক সময় বেরোবেই সে। সাথে কেউ থাকলে...'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রেখে হুঁশিয়ার করল রবিন। 'ওই, আসছে!'

কাফে থেকে বেরিয়ে আসছে লোকটা। দেখেই তাকে চিনতে পারল। এই সেই লোক, কোন সন্দেহ নেই। উঁচু বুট পায়ে। নকশা যখন নিতে এসেছিল তখন হেলমেটটা মাথায় ছিল, এখন খুলে হাতে নিয়েছে। টেড আর রবির দেয়া বর্ণনার সাথে মিলে যাচ্ছে তার চেহারা। ইঁদুরমুখো। সঙ্গে আরেকজন লোক রয়েছে। বেঁটে, গাট্টাগোট্টা, বয়েস চল্লিশ মত হবে। রাস্তায় নেমে এল দু'জনে।

দ্বিতীয় লোকটাকেও চিনল মুসা। ফিসফিসিয়ে বলল, 'এই সেই লোক, গোবেল বীচ স্টোরে কালো চশমা পরা ছিল। সাংবাদিক বলে পরিচয় দিয়েছিল নিজেকে।'

কিশোর, রবিন আর জিনাও চিনল তাকে।

'দু'জনে জোট বেঁধেছে,' কিশোর বলল 'একই সঙ্গে কাজ করে মনে হয়।'

'কি বলছে শুনতে পারলে হত,' আফসোস করে বলল রবিন।

'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়!' ফিসফিস করে বলল কিশোর। লোকগুলোকে বেরোতে দেখে গাড়ির আড়ালে এসে লুকিয়েছে সবাই ওরা। 'ওই দেখো, মোটর সাইকেলটার কাছে দাঁড়িয়েছে। ওখানে যতক্ষণ থাকবে, ওদের কথা শুনতে পাব আমরা।'

'কি ভাবে?' জিনার প্রশ্ন।

'এসো আমার সঙ্গে।'

মাথা নিচু করে রেখে এগোল কিশোর। গাড়ির জন্যে মোটর সাইকেলের কাছ থেকে ওকে দেখতে পাবে না লোকগুলো। চত্বরের একধারে রাস্তার কাছে চলে এল সে। 'রাস্তা পেরোতে হবে এখন খুব সাবধান! দেখে না ফেলে!'

কিশোরের কথামতই কাজ করল রবিন, জিনা আর মুসা। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে না। কি করতে চাইছে? প্রশ্ন করার সময় নেই। অনেক ঘুরে রাস্তা পেরোল ওরা।

কোন বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন লোকগুলো। কোন দিকেই তাকাচ্ছে না

'এবার ওই কোণায় যেতে হবে,' দেখাল কিশোর। 'তারপর ওই গলিটা ধরে চলে যাব কাফের কাছে। গলি আর হাই স্ট্রীটের মোড়ে রয়েছে কাফেটা তখনি দেখেছি সে-জন্যেই যেতে চাইছি ওখানে।'

কোণের কাছে চলে এল ওরা। বাড়িটার কোণ ঘুরলেই এখন ডন আর অন্য লোকটাকে দেখা যাবে। তবে দেখার প্রয়োজন নেই, ওদের কথা শুনতে পেলেই হয়। শোনা যাচ্ছে।

'ঠিক আছে বলছ?' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল বেঁটে লোকটা রেগে গেছে মনে

হয়। 'শুরুতেই সব গোলমাল করে না ফেললে...'

'আমার দোষ নয়, মারভিন!' তীক্ষ্ণ শোনাল ডনের গলা। ঠিকই বলেছে টেড, ইঁদুরের মত চিঁচিঁই করে।

'আস্তে! শুনে ফেলবে! এদিকে এসো।' বেঁটে লোকটা বলল।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ফেলল গোয়েন্দারা। নিরাশ হয়েছে। এত কষ্ট করে এখানে এসেও লাভ হলো না। সরে যাচ্ছে লোকগুলো।

'চলো, পিছু নিই,' মুসা বলল। 'কি বলে শুনতে হবে।'

ভাগ্য আরেকবার গোয়েন্দাদের পক্ষ নিল। এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল লোক দু'জন, ওদের কথা শুনতে পেল ওরা। তবে আগের জায়গা থেকে সরে যেতে হলো অবশ্যই। নির্জন এক টুকরো পতিত জায়গা। একপাশে বেড়া।

আরেক পাশে বাড়ি। কাজেই লুকাতে অসুবিধে হলো না ওদের। ডন সিগারেট ধরাল। তার সঙ্গী ধরাল পাইপ। আবার কথা বলতে শুরু করল।

বেড়ার আড়ালে ঘাপটি মেরে শুনতে লাগল গোয়েন্দারা। আগের জায়গা থেকে লোকগুলো সরে আসায় বরং ভালই হয়েছে। এখন ওদের কথা আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। '...এ সব বলেছি আমি, মারভিন,' ডন বলছে। 'সুবিধে করতে পারিনি। আর তাতে আমার দোষটা কোথায়? কি করে জানব জিনিসগুলো আসতে এত দেরি হবে? ওগুলো আসার আগেই আমার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল ওখানে।'

'বেশ, ধরলাম সেটা ব্যাড লাক। তোমার কাজ শেষ হওয়ার আর সময় পেল না...যে কাজটা পানির মত সহজে সেরে ফেলা যেত, তার জন্যে ঝুঁকি নিতে হলো, তালা ভেঙে ঢুকতে হলো–সবই বুঝলাম, তারপরও...'

'যা-ই করে থাকি, কাজটা তো হলো। এটাই আসল কথা। নকশাটা দরকার ছিল আপনার, পেয়েছেন। মালও পেয়ে যাব শীঘ্রি, যদি নকশার নির্দেশমত এগোতে পারি। তারপর আমাদের কাজ হবে ওগুলো দেশ থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়া। ভাল লাভ হবে।'

'হোরেসের ভাগ দিতে হবে, ভুলো না। জেল থেকে বেরোবেই। তখন তার পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে আমাদের।'

'ফন্দিটা ভালই করেছিল। নকশাটা ইসের মধ্যে ভরে...'

'ইসেটা' যে 'কিসে' তা আর শোনা গেল না। বাকি কথাগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল বাতাসে। কান খাড়া করে অনেক চেষ্টায় আরও কয়েকটা শব্দ শুনতে পেল গোয়েন্দারা। মারভিন বলছে, 'কাল রাত নটায়, পিংক হাউসে...'

হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। আর ওদের কথা শোনা গেল না। শুনতে হলে আবার পিছু নিতে হবে। আর ঝুঁকি নিল না গোয়েন্দারা।

অন্ধকারও হতে শুরু করেছে। গোবেল বীচে ফিরে যাওয়া উচিত। ঘরে আরাম করে বসে বিকেলের এই অভিযান নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

গোবেল ভিলায় ফিরে এল ওরা। ছেলেদের ঘরে এসে বসল সবাই।

আলোচনা শুরু করল কিশোর, 'তাহলে কি জানলাম আমরা? ডন হারভে চোরের দলের একজন। কথা শুনে মনে হলো অন্য লোকটা, অর্থাৎ মারভিন হলো তার বস্।'

'কিংবা আরেকটা লোকের কথা যে বলল, সে-ও হতে পারে,' জিনা মনে করিয়ে দিল। 'যার নাম হোরেস।'

'যে লোকটা জেলে রয়েছে,' রবিন বলল।

'সূত্র তো ভালই পেলাম,' বলল মুসা। 'এখন ওগুলো জোড়া দিয়ে খাপে খাপে মেলাতে পারলেই হয়। অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাব। মারভিন বেশ রেগে গেছে মনে হলো। কোন একটা ভুল নিশ্চয় করে ফেলেছিল ডন। সে বলল, তার কিছু করার ছিল না। কারণ মাল আসতে আসতে দেরি হয়ে গেছে। ততদিনে তার কাজের মেয়াদ শেষ। এখন প্রশ্ন হলো, কি কাজ? কোথায়? আর কি জিনিসের ডেলিভারি, যা আসতে দেরি হলো?'

ভাবছে কিশোর। নাক কুঁচকে রেখেছে সামান্য। 'মনে হয় বুঝতে পারছি,' বলল সে। '*ঝুঁকি নিতে হলো* বলল মারভিন। তারপর বলল তালা ভেঙে ঢোকার কথা। আমার বিশ্বাস, পলির ক্রিসমাস ট্রি, আর গোবেল বীচ স্টোরে চুরি করার কথা বলেছে ও।'

'আর জিনিস নিশ্চয় সেই খেলনা ভালুকগুলো,' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রবিন। 'ওগুলো আসতেই দেরি হয়েছে, জানি আমরা, ডিক বলেছিল। আর চুরিও হয়েছে শুধু ওগুলোই।'

'হ্যাঁ,' জিনা বলল। 'বেশ মিলে যাচ্ছে। কিশোর, ডন মনে হয় গোবেল বীচ স্টোরে একটা টেমপোরারি কাজ নিয়েছিল। বড়দিনের সময় কাজ বেশি, বাড়তি লোকের দরকার হয় ওদের। ওই সময়ই তাকে গোপন খবর পাঠানো হয়েছিল, যে কোন একটা খেলনা ভালুকের ভেতরে থাকবে নকশাটা। এল খেলনাগুলো। কিন্তু দেরি করে। তখন তার চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। খেলনাগুলোর ভেতরটা দেখার আর কোন উপায় না পেয়ে শেষে চুরিই করে বসল সে। সময় পেলে অবশ্য দেখেটেখে যে ভালুকটার ভেতরে রয়েছে, সেটাই খুলত। তারপর আবার সেলাই করে রাখলেই কেউ ধরতে পারত না।'

'ঠিক!' কথাগুলো যুক্তিসঙ্গত মনে হলো কিশোরের। 'আর এমনই কপাল ওদের, চুরি করে নিয়েও লাভ হলো না। রবিন যে একটা ভালুক কিনল, কাকতালীয় ভাবে তার মধ্যেই থেকে গেল নকশাটা। যা-ই হোক, চুরি রহস্যের সমাধান হয়েছে। এখন আমাদের জানতে হবে, নকশা দেখে কি জিনিস বের করতে চাইছে ওরা। কি হতে পারে, বলো তো?'

'বুঝতে পারছি না,' মাথা নাড়ল মুসা। 'তবে দামী কোন কিছু। বলল না, দেশ থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করলে ভাল টাকা পাবে। দামী জিনিসই।'

'তিন ভাগ করবে সেই টাকা,' জিনা বলল। 'একটা ভাগ দেবে জেলের লোকটাকে। হোরেস।'

'আমার মনে হয় ও-ই নেতা। যদিও এখন জেলে রয়েছে। প্ল্যানট্যান সব সে-ই করেছে, শুনে সে-রকমই মনে হলো। নকশাটা সে এঁকেছে। আর সেটা পাচারের ব্যবস্থা করে...'

'খেলনা ভালুকের ভেতরে ভরে!' বুঝে ফেলল রবিন।

'হ্যাঁ। একটা ব্যাপার অবশ্য এখনও পরিষ্কার হয়নি। জেলে ওরকম একটা

খেলনা কি ভাবে পেল হোরেস? সেটা আবার বাক্সে ভরে অন্য খেলনাগুলোর সঙ্গেই বা পাঠাল কিভাবে?'

'আমি জানি!' বলে উঠল মুসা। কপালে টোকা দিয়ে বলল, 'এটা আজ ভালই খেলছে মনে হয়!'

হাসল কিশোর। 'বলে ফেলো।'

'জেলে কাজ করতে হয় কয়েদীদের। অনেক রকম কাজ। শ্রমিকের কাজই বেশি। কাপড় সেলাই থেকে শুরু করে মেইল ব্যাগ বানানো পর্যন্ত সব করে। খেলনাও বানায়। শুনেছি, খেলনা বিক্রি করেও জেলখানার ভাল আয় হয়। জেলে হোরেসের কাজ খেলনা বানানো। কিংবা ইচ্ছে করেই কাজটা নিয়েছে সে, নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে। যাতে নকশা এঁকে সেটা একটা খেলনা ভালুকের ভেতর ভরে দিতে পারে সহজেই। কোন ভাবে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, কোন্ দোকানে জিনিসগুলো চালান যাবে। সেটা জেনে নেয়াটা কঠিন কাজ নয়। জেনে, খবর দিয়েছে তার বন্ধুদের, কোত্থেকে কিভাবে জোগাড় করতে হবে নকশাটা।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ!' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। কি ভাবে পাঠিয়েছে জানার জন্যে মনটা খুঁতখুঁত করছিল। যদিও সেটা এখন জেনে আর লাভ নেই, দরকারও নেই আমাদের। এখন যে কাজটা করতে হবে, তা হলো নকশার মানে বের করে জিনিসগুলো খুঁজে বের করা। লোকগুলোকে ঠেকানো। মারভিন আর ডন কাল রাতে পিংক হাউসে দেখা করবে বলেছে। হয়তো ওখানেই রয়েছে জিনিসগুলো। পিংক হাউসটা কোথায়, খুঁজে বের করতে হবে আগে।'

'কোথায় যে জায়গাটা, কিছুই বলতে পারব না,' জিনা বলল। 'নামই শুনিনি। এই এলাকায় না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে হলে ভাল হত, সুবিধে হত আমাদের জন্যে। সময়টা ভাল বেছেছে, তাই না? কাল নিউ ইয়ারস ইভ। রাত ন'টায় বাইরে বেশি লোক বেরোবে না। লোকে হয় বাড়িতে থাকবে, নয়তো পার্টিতে, নিউ ইয়ারের অপেক্ষায়।'

'আমরা বাদে!' ঘোষণা করে দিল কিশোর। 'রাতের খাওয়া হয়ে গেলে, কেরিআন্টিকে বলব, আমরা স্টোররুমে খেলতে যাচ্ছি। ঘুমাতে দেরি হবে।'

'না বললেও কিছু এসে যায় না,' জিনা বলল। 'আব্বা তো খেয়ে গিয়ে ঢুকবে স্টাডিতে। আম্মা টিভি দেখবে। আমরা সেই সুযোগে বেরিয়ে যাব। বলা যায় না, দাওয়াতও পেয়ে যেতে পারে, পার্টির। তাহলে তো কাজের কাজই হবে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ব আমরা...'

'পিংক হাউস শিকারে,' হেসে জিনার কথাটা শেষ করে দিল রবিন।

'তা তো বেরোব,' মুসা বলল। 'কিন্তু জানিই তো না ওটা কোথায়।'

'তা জানা যাবে,' বলল কিশোর। 'সময় আছে কালকের সারাটা দিনই পড়ে আছে। যেতে যেতে তো সেই রাত ন'টা।'

'কপাল আমাদের ভালই বলতে হবে,' জিনা বলল 'সব কিছুই কেবল পক্ষে যাচ্ছে। যেন আমাদের ইচ্ছেমতই ঘটছে সব আশা করি পিংক হাউসটাও পেয়ে যাব। কি বলিস, রাফি?'

'গর্‌র্‌র্!' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে জবাব দিল রাফি

নয়

পরদিন সকালে আবার মিডলটনে এল গোয়েন্দারা। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সাইকেল চালানোটা মোটেও আরামদায়ক হলো না। গাঁয়ে পৌঁছে খেয়াল হলো, তদন্তটা কি করে চালাবে, আলোচনা করে ঠিক করে আসেনি। খোঁজ করতে গেলে যদি কোনভাবে টের পেয়ে যায় ডন? তাহলে এত দিনকার সব পরিশ্রম শেষ।

তবে বুদ্ধি একটা বের করে ফেলল কিশোর। 'চলো, ওই কাফেটায় ঢুকি।' গ্র্যান্ড কাফে বাদে আরেকটা যেটা আছে সেটার কথা বলল সে। ওটার নাম 'ব্ল্যাক ক্যাট', দেখতে পাচ্ছে। 'ঠাণ্ডা লাগছে। গরম গরম কোকা কিনে খেতে চাইলে কেউ সন্দেহ করবে না। তখন কায়দা করে জেনে নেয়ার চেষ্টা করব, পিংক হাউসটা কোথায়।'

কাফেতে এসে ঢুকল গোয়েন্দারা। একটা টেবিল বেছে বসে পড়ল। সকালের এই সময়টায় খরিদ্দারের ভিড় নেই। সুন্দর চুলওয়ালা একটা ছেলে ওয়েইটারের কাজ করছে। হাসি হাসি মুখ। তার নাম হ্যারি। ব্ল্যাক ক্যাটের মালিক ছেলেটার বাবা।

অর্ডার নিতে এগিয়ে এল হ্যারি। আদর করে রাফির মাথা চাপড়ে দিয়ে বলল, 'বাহ্, বেশ সুন্দর কুকুর তো।'

খুশি হলো রাফি। সেই সাথে জিনা। 'হ্যাঁ,' বলল সে। 'আর খুব সাহস! বুদ্ধিও আছে। ঘরে বসে থাকার বান্দাই সে নয়। ওই যে কিছু কিছু কুকুর থাকে না, খালি ড্রইং রূমে বসে থাকে।'

'তা যে নয়, সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' হেসে বলল ছেলেটা। কথায় কথায় হাসে। 'ওর চেহারাই বলে, গলায় লাল ফিতে বেঁধে কোলে বসে থাকতে রাজি নয়।'

সুযোগ পেয়ে গেল কিশোর। 'পিংক' শব্দটা বলার এইই উপযুক্ত সময়, রঙের কথা যখন উঠলই। 'না, সহ্যই করতে পারে না অলস হয়ে বসে থাকা,' বলল সে। 'তবে ফিতে পছন্দ করে রাফি। একবার পিংক একটা রিবন বেঁধে দিয়েছিলাম গলায়। সেটা পরে সৈকতে তার সে-কি নাচানাচি। রবিন, তোমার মনে আছে? পিংক রিবন। পিংক, বুঝলে তো? ওই পিংক হাউসের মত।'

আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছে কিশোর। লাগবেই, আশা করেনি। তবে লাগল।

ভুরু কুঁচকে হ্যারি বলল, 'পিংক হাউসের নামও জানো!' অবাক হয়েছে। 'কি করে জানলে? এই এলাকায় থাকো না তোমরা, বুঝতে পারছি। আগে কখনও দেখিনি।'

সত্যি কথা খানিকটা বলে দেয়া উচিত মনে করল মুসা। 'দেখবে কোত্থেকে?' হাসল সে। 'এদিকে আমরা এলে তো। প্রথম এসেছি কাল। তখনই শুনেছি, একটা লোক বলছে পিংক হাউসের কথা। নামটা অদ্ভুত। সেজন্যেই কৌতূহল হচ্ছে

আমাদের। ওই রঙের বাড়ি নিশ্চয় খুব একটা নেই। ওটার সম্পর্কে জানার খুব ইচ্ছে আমাদের।'

'বেশ বড় একটা বাড়ি,' হ্যারি জানাল। 'পুরানো। লাল রঙের। সে-জন্যেই ওরকম নাম হয়েছে। তবে বাড়িটার অনেক বদনাম। ওটার মালিক হোরেস ট্রিমেইনির গ্রেপ্তারের পর থেকেই।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গোয়েন্দাদের মুখচোখ পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল ওরা। দ্রুত হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি। বুঝতে পারছে, তদন্তে অনেক এগিয়ে গেছে।

খাবারের অর্ডার দিল কিশোর।

ধূমায়িত কোকার মগ নিয়ে এল হ্যারি। আর বড় একটা কেকের অর্ধেকটা। সেগুলো টেবিলে নামিয়ে রেখে সাজিয়ে দিল।

আগের আলোচনাটা আবার চালিয়ে গেল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'হোরেস ট্রিমেইনিকে গ্রেপ্তার করছে কেন?'

'সে এক মজার গল্প। শোনোনি? সত্যি? কেন, চোরাই ছবিগুলোর কথা শোনোনি?'

'পেইন্টিং?'

'হ্যাঁ, পেইন্টিং।'

মাথা নাড়ল কিশোর। মুসা আর জিনাও নাড়ল। রবিন চুপ করে আছে। অবাক হয়েছে অন্য তিনজনের মতই।

'ও। শোনো তাহলে,' বলতে লাগল হ্যারি। 'বছরখানেক আগে লন্ডনের এক আর্ট গ্যালারি থেকে চুরি যায় ছবিগুলো। খুঁজতে খুঁজতে পুলিশ এসে ধরে হোরেসকে। চার বছরের জেল হয়ে যায়। তাকে দোষী প্রমাণ করতে পেরেছে বটে পুলিশ, তবে ছবিগুলো বের করতে পারেনি। কিছুতেই কথা বের করা যায়নি হোরেসের মুখ থেকে। তারপর থেকে ওই বাড়িটাতে আর কেউ বাস করে না।'

'বাড়িটা কোথায়?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

হ্যারি জানাল, বাড়িটা মিডলটন আর গোবেল বীচের মাঝে একটা সাধারণ রাস্তার ধারে। এটাই জানতে চেয়েছিল গোয়েন্দারা। কোকা শেষ করে উঠল ওরা। হ্যারিকে গুডবাই জানিয়ে বেরিয়ে এল কাফে থেকে।

'দুপুরের খাওয়ার অনেক দেরি,' কিশোর বলল। 'সময় আছে হাতে। ইচ্ছে করলে এখুনি ঘুরে দেখে যাওয়া যায়। এখন পেয়ে গেলে বিকেলে আর আসতে হবে না। মিডলটনে যত কম লোকে আমাদেরকে দেখে ততই ভাল। ডন কিংবা মারভিনের সামনে পড়তে চাই না কিছুতেই।

চলতে চলতে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, এই হোরেস লোকটা ছবিগুলো কি তার বাড়িতেই লুকিয়ে রেখেছে? কি মনে হয় তোমার? নিশ্চয় গ্রেপ্তার যে হবে সেটা বুঝতে পেরেছিল। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলেছে। এগুলোর কথাই বলছিল ডন আর মারভিন।'

মুসাও রবিনের সঙ্গে একমত। কিশোর জবাব দেয়ার আগেই বলে উঠল, 'আমারও তাই মনে হয়। পুলিশ নিশ্চয় খোঁজা বাকি রাখেনি। আর সেটা ভাল

করেই জানত হোরেস। কাজেই এমন জায়গায় লুকিয়েছে, যেখান থেকে খুঁজে বের করা কঠিন। কোথায় লুকিয়েছে সেটা বলে যেতে পারেনি সঙ্গীদের। তবে জেলে ঢুকে যোগাযোগ করেছে কোনভাবে। তারপর খেলনার ভেতরে নকশা ভরে সেটা পাচারের ব্যবস্থা করেছে।'

'আর জেল থেকে বেরিয়ে,' জিনা যোগ করল। 'অবশ্যই তার ভাগটা চাইবে। ছবি বিক্রির টাকার। টাকা নিশ্চয় অনেক পাবে। বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে।'

'সেটা আর হতে দিচ্ছি না আমরা,' কিশোর বলল।

যেন তার কথার সমর্থনেই বলে উঠল রাফি, 'ঘাউ!'

হেসে উঠল মুসা। 'শুনলে তো রাফির কথা। ও বলতে চাইছে, হোরেস মিয়া, ওই টাকা জিন্দেগিতেও তুমি পাবে না। আর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে পোলাও কোরমা খাওয়াও চলবে না। তোমাকে আবার জেলেই ঢুকতে হবে, শুকনো রুটি খাওয়ার জন্যে।'

'অতটা জোর দিও না,' জিনা বলল। 'বলা যায় না কি হয়। যে লোকের পেট থেকে পুলিশ কথা আদায় করতে পারেনি সে নিশ্চয় সাধারণ লোক নয়। তাকে এত ছোট করে দেখা উচিত না। আরেকটা কথা হয়তো জানো, জেলে কোন কয়েদী যদি ভাল ভাবে থাকে, ভাল আচরণ করে, তাকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মুক্তি দেয়া হয়। বলা যায় না, হোরেসকেও তেমনি ভাবে ছেড়ে দেয়া হতে পারে।'

'দিক না। আবার ঢোকাবে।'

'যদি চোরাই মাল সহ ধরতে পারে।'

'পারবে...'

মুসা আর জিনার তর্কাতর্কিতে বাধা দিল কিশোর, 'ওই যে পিংক হাউস!'

থেমে গেল পাঁচজনেই, রাফি পর্যন্ত। মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে লাল বাড়িটার দিকে। সত্যিই লাল! দুই-আড়াইশো বছরের পুরানো। অর্ধেক কাঠ, অর্ধেক ইঁট-সুরকি দিয়ে তৈরি। লাল রঙ করা হয়েছে। জানালার কাঠের শাটারগুলোও লাল। খড়-পাতা দিয়ে বানানো চালা। সামনের দরজায় উঠতে হয় সিঁড়ি বেয়ে। নির্জন, নিঃসঙ্গ। আশপাশে আর কোন বাড়িঘর নেই। বিশাল বাগান রয়েছে চারপাশ ঘিরে। তবে সেটাকে এখন আর বাগান বলা যাবে না। অযত্ন অবহেলায় জঙ্গল হয়ে গেছে।

'চলো, ঢুকে দেখি,' প্রস্তাব দিল মুসা। 'ধারে কাছে কেউ আছে বলে মনে হয় না। ভেতরে কি আছে দেখতে চাইলে এটাই সুযোগ। এখন দেখে রাখলে রাতে এলে সুবিধে হবে।'

কথাটা মন্দ বলেনি মুসা। কিশোরের পছন্দ হলো। গেটে ঠেলা দিল সে। কব্জায় এমন ভাবে জং পড়েছে, খুলতে জোর লাগল। কিঁচকিঁচ করে আর্তনাদ করে উঠল। তবে খুলল।

খুশি হয়ে উঠল কিশোর। 'তালা নেই। বাঁচলাম।'

পথের পাশের খাদে সাইকেলগুলো লুকাল ওরা। তারপর সারি বেঁধে গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। খোয়া বিছানো পথ ধরে এগোল বাড়ির দিকে। আগে আগে হাঁটছে রাফি। নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকছে। সন্দেহজনক কিছুর গন্ধ পেলেই সঙ্গে

সঙ্গে জানিয়ে দেবে।

বাগানে ঢোকার গেটটার মত বাড়ির দরজা খোলা নয়। এখানে তালা দেয়া।

'হলো না,' নিরাশ হয়ে বলল মুসা। নিচতলার সমস্ত জানালা-দরজা ঠেলেঠুলে দেখল কোনটা খোলা আছে কিনা। মাথা নাড়ল, 'নাহ্, আটকে রেখে গেছে! ঢোকা আর হলো না!'

'এক হিসেবে ভালই হলো,' জিনা বলল। 'ঢুকতেও পারব না, ধরাও পড়ব না, তাতে কেউ বলতেও পারবে না বেআইনী ভাবে ঢুকেছি।'

'ওই আঙুর ফল টকের মত আর কি,' ফোড়ন কাটল রবিন।

কিশোর কিছু বলছে না। নীরবে তাকিয়ে রয়েছে একেবারে মাটির কাছাকাছি দুটো ভেনটিলেটরের গ্রিলের দিকে। লম্বা, সরু জানালার মত ফোকর, কাঁচটাচ নেই। এমন ভাবে তৈরি হয়েছে যাতে বাতাসের সাথে সাথে কিছু আলোও দিতে পারে মাটির তলার ঘরে।

'আমি শিওর, ছবিগুলো থাকলে সেলারেই আছে,' বলল সে। 'ইস্, যদি কোনভাবে ঢুকতে পারতাম! নকশাটার সাহায্যে বের করতে পারতাম ছবিগুলো।'

অনেক চেষ্টা করেও ঢোকা সম্ভব হলো না। আর কিছু করার নেই। বাড়ির পথ ধরল ওরা।

তারপর সময় যেন আর কাটে না। সাংঘাতিক দীর্ঘ লাগছে। যেন সন্ধ্যা আর হবেই না সেদিন। আর যদি হয়ও, কেরিআন্টি কিংবা পারকার আংকেলের চোখ এড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে না পারলে, এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম, সব বিফল।

কয়েক বাড়ি থেকে দাওয়াত এসেছে, নিউ ইয়ার ইভের পার্টিতে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু রাজি হলেন না জিনার আব্বা আম্মা। দু'জন আত্মীয় বেড়াতে আসছেন সন্ধ্যায়। জিনার দূর সম্পর্কের চাচা-চাচী। তাঁদেরকে ফেলে দাওয়াতে যাওয়া যায় না।

সন্ধ্যা হলো। মেহমানরা এলেন। রাতের খাওয়া শেষ হলো। তার পরেও অনেক সময় বাকি। বড়রা সিটিং রুমে তাস খেলতে বসলেন।

'ভালই হলো,' কিশোর বলল। 'তাসে একবার ডুবে গেলে আর কোনদিকে খেয়াল থাকবে না। আর টেলিভিশন তো রয়েছেই। মাঝরাতের আগে আর উঠবে না কেউ। বাতাসের মত স্বাধীন আমরা। যেখানে খুশি চলে যেতে পারি,' আনন্দে শিস দিতে শুরু করল সে।

'এত খুশি হয়ো না,' রবিন অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। 'যদি কোন কারণে উঠে আসেন আন্টি? হাজারটা কারণ থাকতে পারে ওঠার। আমরা ঘুমিয়েছি কিনা সেটাই যদি দেখতে আসেন?'

'তাহলে আর কি, লক্ষটা কৈফিয়ত দিতে হবে। তবে এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঝুঁকি নিতেই হবে। এতখানি এগোনোর পর শুধু কৈফিয়তের ভয়ে তো আর ঘরে আটকে থাকতে পারি না।'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। ক্যারিয়ারে অনেক বড় একটা ঝুড়ি বাঁধল জিনা, রাফিকে বয়ে নেয়ার জন্যে। কাদার মধ্যে দৌড়ালে অনেক কষ্ট করতে হবে বেচারাকে।

ঝুড়িতে তোলা হলো রাফিকে। এ ভাবে চলার অভ্যাস আছে তার। কাজেই গোলমাল করল না, যে ভাবে রাখা হলো, চুপ করে গুটিসুটি হয়ে রইল ঝুড়ির মধ্যে।

রওনা হলো গোয়েন্দারা। যত দ্রুত সম্ভব প্যাডাল করতে লাগল, সময় মত ওখানে পৌছানোর জন্যে। আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই কিশোরের। ভয় তেমন করছে না। তবে পিংক হাউসে পৌছে কি দেখবে, আন্দাজও করতে পারছে না।

যে কাজে চলেছে, তাতে সফল হবে কিনা, এ ব্যাপারে সবারই সন্দেহ আছে। লুকিয়ে শোনা কয়েকটা কথার ওঁপর নির্ভর করে চলে এসেছে ওরা। লোকগুলো আদৌ পিংক হাউসে আসবে কিনা, তাই বা কে জানে? আগের দিন কথা বলার পর অনেক সময় পেরিয়েছে, ইতিমধ্যে অনেক সময় পেয়েছে ওরা মত বদলানোর।

'আসবে কিনা কে জানে?' ভাবনাটা প্রকাশই করে ফেলল রবিন।

জিনারও একই প্রশ্ন, তবে সেটা বলল না। আরেকটা ব্যাপারে সন্দেহ আছে তার। নকশাটা সত্যিই ছবিগুলোর কাছে নিয়ে যাবে তো?

মাঝে মাঝেই পকেটে চাপড় দিচ্ছে কিশোর। নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে, নকশাটা আছে কিনা। তার ভয়, কোন ভাবে খোয়া না যায়। পকেট থেকে পড়েও যেতে পারে। হারানোর ভয়ে কুকুরের ঘর থেকে বের করেছে ওটা বেরোনোর ঠিক আগের মুহূর্তে। নকল নকশা এঁকে দেয়ার বুদ্ধিটা করেছিল বলে খুশি এখন সে। ঠিক কাজটাই করেছে।

পিংক হাউস থেকে একটু দূরে সাইকেল রেখে হেঁটে চলল ওরা। খুব সাবধান রইল। কোন রকম শব্দ করল না।

গেটের কাছে পৌছেই থমকে দাঁড়াল কিশোর। আগে আগে হাঁটছিল সে। তাহলে তার অনুমানই ঠিক! গেট খোলা। অথচ দুপুরে নিজের হাতে লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল পাল্লাটা। লোকগুলো যে এসেছে, তার আরও প্রমাণ আছে। ম্লান আলো দেখা যাচ্ছে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে। একটা ভেনটিলেটরের ভেতর থেকে আসছে।

'দেখলে তো!' ফিসফিস করে বলল কিশোর, খুশি খুশি গলায়। 'আমার কথাই ঠিক!'

দশ

অন্ধকারে গা ঢেকে রয়েছে গোয়েন্দারা।

ভাল করে তাকালেই শুধু চোখে পড়বে পাঁচটা ছায়ামূর্তি–চারটে মানুষের, আর একটা কুকুরের।

নিঃশব্দে ভেনটিলেটরের কাছে এসে থামল ওরা। ফাঁক দিয়ে নিচে তাকাল। গ্রিলের মাঝে যথেষ্ট ফাঁক। মুখ ঢুকিয়ে দেখতে তেমন অসুবিধে হয় না। সেলার, অর্থাৎ মাটির নিচের ঘরের বেশ অনেকখানিই চোখে পড়ে। ডনও আছে, তার সঙ্গী মারভিনও আছে। সেলারের মেঝেটা কাঁচা। পশ্চিমের কোণে মাটি খুঁড়ছে ডন, আর নকশা দেখে দেখে নির্দেশ দিচ্ছে মারভিন। নকল নকশা, যেটা এঁকে দিয়েছে

কিশোর। তৃতীয় আরও একজন রয়েছে সেখানে, হাতে একটা বড় হ্যারিকেন। হোরেস ট্রিমেইনি জেলে যাওয়ার পর নিশ্চয় বাড়ির বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে, অনুমান করল কিশোর।

গলা বাড়িয়ে দিল মুসা।

'দেখো দেখো!' রবিন বলে উঠল। 'সেই মহিলা। যে ছেলের জন্যে ভালুকটা নিতে চেয়েছিল আমার কাছ থেকে।'

তাই তো!

ভালমত খেয়াল করে দেখতেই বাকি তিনজনও চিনতে পারল মহিলাকে।

একটা শাবল নিয়ে কাজ করে চলেছে ডন। মেঝে থেকে উঠে আসছে তাল তাল মাটি।

'ওখানেই তো থাকার কথা! ওই খানেই!' মারভিন বলল। নকশার ওপর থেকে চোখই সরাচ্ছে না। 'ডন, চালিয়ে যাও।'

কিছুক্ষণ পর মুখ মোছার জন্যে থামল ডন। দরদর করে ঘাম ঝরছে মুখ বেয়ে।

'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন?' রেগে গেল ডন। 'কথাই তো বলে চলেছেন খালি। এক-আধ বার খুঁড়লে হয়টা কি? টাকা তো আর কম নেবেন না! ইস্, মাটি তো না, যেন সিমেন্ট!'

মনে হলো রেগে যাবে মারভিন। কিন্তু রাগল না। মহিলার দিকে ফিরে বলল, 'দেখি, আলোটা আরেকটু এদিকে সরাও তো, ইসাবেল।'

'একটাতে হবে না,' বলে হ্যারিকেনটা মাটিতে রেখে দিল ইসাবেল। আরেকটা হ্যারিকেন বের করে ধরাল। ততক্ষণে শাবল নিয়ে মাটি কোপাতে শুরু করেছে মারভিন। কিছুক্ষণ কাজ করে ফিরিয়ে দিল আবার ডনকে।

পালা করে দু'জনে মিলে মাটি কুপিয়ে চলল। সেলারের পুরো পশ্চিম কোণটা যেন খুঁড়ে তুলে ফেলবে।

ওপরে, ভেনটিলেটরের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে গোয়েন্দারা। এতই মগ্ন হয়ে আছে, ঠাণ্ডার কথাও ভুলে গেল। কখন যে ঠাণ্ডা বাতাস ছাড়তে শুরু করেছে টের পেল না। কিছুই না পেয়ে বিরক্ত হয়ে ডন যখন শাবলটা ছুঁড়ে ফেলল, হাসি চাপতে কষ্ট হলো ওদের।

'কোন চিহ্নই তো নেই!' বলল সে। 'আমি আর পারছি না! হোরেস নাকি ট্রাঙ্কটা লুকানোর পর চিহ্ন দিয়ে রেখেছে। কই?'

'আরও খুঁড়তে হবে,' মারভিন বলল। 'নকশায় লেখা রয়েছে এক ফুট। হাতের লেখা তো। সেভেনকেও ওয়ানের মত লাগে অনেক সময় লেখার দোষে।'

'তারমানে সাত ফুট খুঁড়তে হবে!' ঘাবড়ে গেল ডন। 'এত নিচে রাখতে গেল কেন? পাগলামি, স্রেফ পাগলামি!'

'যা-ই হোক, খুঁড়তে তো হবে,' ইসাবেল বলল। 'তাড়াহুড়ো নেই আমাদের। আস্তে আস্তে খোঁড়ো।'

'তা তো বলবেই!' ফুঁসে উঠল ডন। 'তোমাকে তো আর পরিশ্রম করতে হচ্ছে না!'

কথাটা এড়িয়ে গেল ইসাবেল। বলল, 'দুটো শাবল আছে। একজন একজন করে না খুঁড়ে দু'জনে মিলে একবারেই খোঁড়ো। সহজও হবে, তাড়াতাড়িও।'

'বুদ্ধি-পরামর্শ ওরকম অনেকেই দিতে পারে। যে করে সে বোঝে ঠেলা! দু'জনে যে খুঁড়ব, যদি কারও মাথায় লেগে যায়? একজন একজন করেই করতে হবে।'

সোজা হলো কিশোর। সঙ্গীদের ইশারা করল। যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে আবার ভেনটিলেটরের কাছ থেকে পিছাতে শুরু করল ওরা।

'এখানে থাকলে বরফ হয়ে যাব,' কিশোর বলল। 'যা ঠাণ্ডা পড়ছে! নকল নকশা দিয়ে ছবিগুলো ওরা খুঁজে পাবে না। চলো, কোথাও গিয়ে বসে থাকি। ওরা বেরোক। চলে গেলে তারপর ঢুকব আমরা। ছবিগুলো বের করার চেষ্টা করব।'

'ঠিক আছে,' মুসা বলল। 'কিন্তু বসবটা কোথায়? বাইরে থাকলে সত্যিই মরে যাব!'

'চোরের গাড়িতে বসব,' নির্দ্বিধায় বলে দিল কিশোর। 'আর তো কোন জায়গা দেখছি না। বাগানের গেটের কাছে গাছের নিচে গাড়িটা দেখেছি। দরজায় তালা না থাকলেই বাঁচি...'

তালা লাগানো নেই। প্রয়োজন বোধ করেনি চোরেরা। ওরা কি আর ভাবতে পেরেছে এই রাতের বেলা এসে কয়েকটা ছেলেমেয়ে ওগুলোতে ঠাঁই নেবে ঠাণ্ডার কবল থেকে বাঁচার জন্যে?

গাড়িতে উঠে বসল সবাই, রাফি সহ। ঠাণ্ডা থেকে রেহাই মিলল। চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে পেরে খুশি লাগছে ওদের।

'ঘুমাতে চাও?' আরাম করে সীটে হেলান দিয়ে বলল জিনা। 'ঘুমিয়ে নিতে পারো। আমি পাহারায় থাকি।'

রবিনের আপত্তি নেই। ঢুলতে শুরু করল। কিশোর আর মুসাও ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু মনে হলো, চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গেই ওদেরকে জাগিয়ে দিল জিনা। কিশোরের কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'এই, জলদি ওঠো! ওরা আসছে!'

চোখের পলকে গাড়ি থেকে বেরিয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। ডন তার দুই সঙ্গীকে আসতে দেখল। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে তিনজনেরই। গরম গরম কথা বলছে।

'হোরেস আমাদেরকে ফাঁকি দিয়েছে!' ডন বলল।

'না, তা হতে পারে না,' মানতে পারল না মারভিন। 'কেন ফাঁকি দিতে যাবে? কাল রাতে আবার আসব। দরকার হলে পুরো সেলারটাই খুঁড়ে ফেলব।'

'ইস্, কি শীতরে বাবা!' ইসাবেল বলল।

গাড়িতে উঠে চলে গেল লোকগুলো।

'যাক, গেল,' কিশোর বলল। 'খেয়াল করেছ, শাবল-টাবলগুলো আনেনি। খালি হাতে বেরিয়ে এসেছে। তারমানে ওগুলো রয়ে গেছে সেলারে। আমাদের কাজ সহজ করে দিয়ে গেল।'

'সহজ?' জিনা প্রশ্ন করল, 'ঢুকতে পারলে সহজ। ঢোকাটাই তো আসল সমস্যা।'

‘পথ একটা ঠিকই বের করে ফেলব,’ হাল ছাড়তে রাজি নয় মুসা।

কিন্তু সেই একই ব্যাপার, দিনের মতই। দরজা জানালা সব বন্ধ। ঢোকার কোন পথ নেই। ভেনটিলেটর দিয়ে ঢোকা যেত, যদি শক্ত গ্রিল না থাকত। আর মাঝে যে ফাঁক রয়েছে, তা দিয়ে ঢোকা অসম্ভব।

‘দূর!’ হতাশ হয়ে গেল মুসা। ‘হবে না! ফিরে যেতে হবে দেখছি!’

ঠিক এই সময় একটা জিনিসের ওপর চোখ পড়ল রবিনের। চাঁদের আলোয় চকচক করছে। খোয়া বিছানো পথের ওপর পড়ে রয়েছে। নিচু হয়ে তুলে নিল জিনিসটা। একটা চাবি!

‘আরি!’ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ‘চাবি! মনে হয় সামনের দরজার!’

‘এটা এখানে এল কিভাবে?’ জিনার প্রশ্ন।

‘বড়ই কাকতালীয় ব্যাপার! চোরগুলো এনেছিল হয়তো,’ কিশোর বলল। ‘পড়ে গেছে কোনভাবে। যাক, ভালই হলো। ঢোকাটা হয়ে গেল আমাদের।’

চাবিটা নিয়ে প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল মুসা। তালার ফোকরে লাগিয়ে মোচড় দিতেই খুলে গেল। পিংক হাউসে ঢুকতে আর অসুবিধে হলো না ওদের।

‘ঝগড়া করার শাস্তি,’ রবিন বলল। ‘ঝগড়াঝাঁটি না করলে, আর মাথা ঠাণ্ডা রাখলে চাবিটা যে পড়েছে টের পেয়ে যেত।’

‘ভাল হয়েছে,’ কিশোর বলল। ‘এসো, সেলারে ঢুকি।’

নিচে নেমে প্রথমেই হ্যারিকেন দুটো জ্বালানো হলো। শাবল তুলে নিল মুসা। কিশোর বের করল নকশাটা। আসল নকশা। মিনিট দুই পরেই ঘরের পূর্ব দিকের কোণায় খুঁড়তে আরম্ভ করল ওরা। মাটি ওখানটায় ঝরঝরে, শক্ত, জমাট হয়ে নেই। পালা করে খুঁড়তে লাগল কিশোর আর মুসা। মাঝে মাঝে জিনাও ওদেরকে সাহায্য করল। তবে তার গায়ে ছেলেদের চেয়ে জোর কম, তাই একটানা বেশিক্ষণ খুঁড়তে পারে না, হাঁপিয়ে যায়।

এক সময় বিড়বিড় করে বলল কিশোর, ‘মাত্র এক ফুট। মুসা, চালিয়ে যাও। হয়ে এল বলে।’

অবশেষে ঠং করে কিসে লাগল মুসার শাবল। উৎসাহ পেয়ে আরও তাড়াতাড়ি খুঁড়তে লাগল সে। বেরিয়ে পড়ল একটা টিনের ট্রাঙ্ক।

এরপরে ডালা তোলার পালা। বুকের কাঁপুনি বেড়ে গেছে ওদের। সবাই ঝুঁকে এল ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে।

কয়েকটা রঙিন ক্যানভাস রোল পাকিয়ে বেঁধে রেখে দেয়া হয়েছে। একটা তুলে সাবধানে মেলে ধরল কিশোর।

ছেলেদের মত শিস দিয়ে উঠল জিনা। ‘চিনি ওটা! ইস্কুলের লাইব্রেরিতে একটা রেফারেন্স বইতে দেখেছি। ওটার নাম “উয়োম্যান উইথ ওয়াটার লিলি”। সাদা-কালো ছবিও দেখেছি এটার, পত্রিকায়। চুরি হওয়ার খবর বেরিয়েছিল যখন, তখন ছেপেছিল।’

‘খাইছে!’ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ‘এগুলোই তাহলে চোরাই পেইন্টিং। এখন শুধু গোবেল ভিলায় নিয়ে যাওয়া। তারপর পুলিশের হাতে তুলে দেবেন পারকার আংকেল।’

‘ট্রাঙ্ক, ট্রাঙ্কটা ভীষণ ভারী,’ কিশোর বলল। ‘বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। সবচেয়ে ভাল হয়, বাগানে কোথাও লুকিয়ে রেখে গেলে। তারপর থানায় গিয়ে খবর দিতে পারব।’

‘সেটাই ভাল হবে,’ হেসে বলল জিনা। ‘এখন এসে ডন আর মারভিন দেখলে কি যে করত…’

‘কি আর করবে?’ বলে উঠল একটা কণ্ঠ। ‘তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দেবে। কারণ আমাদের কাজটা তোমরাই সেরে দিয়েছ। চাবিটার জন্যে ফিরে এসেছিলাম। পকেটে হাত দিয়ে দেখি, নেই। সেলারে আলো দেখে নামলাম। খুব ব্যস্ত ছিলে তো তোমরা, আমরা যে এসেছি, শোনোনি।’

কথা বলছে মারভিন। তার পেছনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডন। স্তব্ধ হয়ে গেছে গোয়েন্দারা। যখন ভাবছে, সফল হয়েছে, তখনই এল চরম ব্যর্থতা।

ঝট করে কথাটা মনে পড়ল জিনার। চোরগুলো যে এল, রাফি হুঁশিয়ার করল না কেন? বুকের রক্ত ছলকে উঠল তার। দ্রুত চোখ বোলাল সেলারে। রাফি নেই!

‘আমার কুকুর!’ ককিয়ে উঠল সে। ‘তাকে কি করেছেন আপনারা?’

হেসে উঠল মারভিন। ‘ওটা ঠিকই শুনতে পেয়েছে, আমরা যে এসেছি। কামড়ানোর চেষ্টাও করেছে। পারেনি। পিটিয়েছি।’

কেঁদে ফেলবে যেন জিনা। ‘মেরে ফেলেছেন! আমার রাফিকে মেরে ফেলেছেন!’ লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল ডনের মুখে খামচি মারার জন্যে। খপ করে তার হাত চেপে ধরল লোকটা। মুসা আর কিশোর জিনাকে সাহায্য করতে এগোল। কিন্তু এক কথাতেই ওদের থামিয়ে দিল মারভিন, ‘খবরদার! এক পা এগোলে মেয়েটার পেটে ছুরি মেরে দিতে বলব ডনকে!’

তারপর দ্রুত ঘটতে থাকল ঘটনা। কিছু দড়ি পড়ে রয়েছে সেলারে। তুলে এনে ডন আর মারভিন মিলে বেঁধে ফেলল গোয়েন্দাদেরকে।

‘যাক, হলো,’ হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল মারভিন, ‘গোয়েন্দাগিরির শখ খানিকটা মিটবে। চালাকিটা ভালই করেছিলে, আমাদের নকল নকশাটা দিয়ে। তবে শেষ দিকে সন্দেহ হতে আরম্ভ করেছিল আমার। যাই হোক, সব ভালয় ভালয়ই শেষ হলো। তোমাদেরকে হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাতে অসুবিধে নেই। হাহ্ হাহ্ হাহ্! তোমাদেরকে যখন পাবে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনরা, তখন সত্যি নতুন বছর এসে যাবে, আর আমরা অনেক দূরে চলে যাব। হয়তো আরও কিছুদিন থাকতাম এখানে, তোমরা যেতে বাধ্য করলে। যাব, কি আর করা। আসল জিনিসটা তো পেয়ে গেলাম। ডন, এসো। হ্যারিকেনগুলো নিয়ে নাও।’

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল সেলারের দরজা। বেরিয়ে গেছে চোরেরা। সাথে করে নিয়ে গেছে দামী ছবিগুলো।

এগারো

প্রচণ্ড রেগে গেছে কিশোর। ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে রাফির জন্যে। লোকগুলো তাকে এ ভাবে বোকা বানিয়ে গেল, এটা সহ্য করতে পারছে না। গালমন্দ করছে নিজেকে মনে মনে। 'বেরোতে হবে!' চিৎকার করে উঠল সে। 'বেরোতেই হবে, যে ভাবে হোক!'

'মুখ আটকে রেখে যায়নি আমাদের,' জিনা বলল। 'তার মানে দরকার মনে করেনি। যদি আমরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাইও, আমাদের চিৎকার কারও কানে যাবে না। রাস্তা থেকে অনেক দূরে রয়েছি। আর এত রাতে আসবেও না কেউ। নিউ ইয়ারের পার্টি নিয়ে সবাই ব্যস্ত।'

'হ্যারিকেনও নিয়ে গেছে!' রবিন বলল ভীত কণ্ঠে। 'কিছু দেখারও উপায় নেই। চাঁদের আলো যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাতে যদি কিছু করা যায়!'

'দেয়ালে ঘষে দড়ি যদি ছিঁড়তে পারি!' মুসা বলল। 'দেখি সেই চেষ্টাই করে। এ ভাবে বাঁধা থাকতে একটুও ভাল্লাগছে না আমার!'

কিন্তু যত ভাবেই ঘষুক, কিছুই করতে পারল না সে।

হঠাৎ কান খাড়া করে ফেলল জিনা। একটা গোঙানি শুনেছে মনে হলো। সেলারে নামার সিঁড়ি থেকে এসেছে শব্দটা।

'রাফি!' চেঁচিয়ে উঠল সে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'মরেনি! আল্লাহ, রাফি মরেনি! বেঁচে আছে! আমার রাফি বেঁচে আছে!'

তারপর শোনা গেল আরেকটা শব্দ। মরচে পড়া কব্জার ক্যাঁচকোঁচ। খুলে যাচ্ছে সেলারের দরজা।

'লাগেনি!' এবার চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'এত জোরে টান দিয়েছিল পাল্লাটা, লাগেইনি! আটকায়নি! ফাঁক হয়ে ছিল!'

'রাফি! রাফি!' চেঁচাতে লাগল জিনা।

দরজা ঠেলে ফাঁক করে ঢুকে পড়ল রাফি। তিন লাফে কাছে চলে এল। জিনার গাল চেটে দিল। নাক ঘষতে লাগল মুখে।

'আরে ছাড় ছাড়!' জিনা বলল। 'ওসব পরেও করতে পারবি। আগে খোল তো। দড়িটা খোল পারলে।'

রাফির বুদ্ধি আছে, ঠিক, কিন্তু হাত নেই। অত সহজে খুলতে সে পারে না। তবু চেষ্টার ত্রুটি করল না। প্রথমে কাপড় কামড়ে ধরে টেনে হিঁচড়ে জিনাকে বের করার চেষ্টা করল। পারল না। পারার কথাও নয়। এত ভারী একটা শরীর নেয় কি করে। ওসব বাদ দিয়ে দড়ি খুলতে পারে কিনা, সেই চেষ্টা করতে বলল তাকে জিনা। শেষে হাতের দড়ি কামড়াতে শুরু করল রাফি। এই কাজটাও সহজ নয়। মাঝে মাঝেই হাল ছেড়ে দেয়। আবার বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে চিবাতে রাজি করাতে হয়। এমনি ভাবে চলল। শেষে জিনা যখন হতাশ হয়ে পড়ল, ভাবল আর হবে না,

তখনই কেটে গেল দড়ি।

উল্লাসে চিৎকার করে উঠল সে। 'খুলে গেছে! খুলে গেছে! ইস্, অবশই হয়ে গেছে! নড়াতেও পারছি না!' জোরে জোরে বাঁধনের জায়গাগুলো ডলতে লাগল সে। 'রাফি! লক্ষ্মী ছেলে! কাজের কাজই করেছিস!'

হাতের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে এল। পায়ের বাঁধন খোলার জন্যে দেরি করল না সে। গড়িয়ে চলে এল অন্যদের কাছে। কিশোর মনে করিয়ে দিল ছুরিটার কথা। দড়ি কেটে ফেললে খোলার চেয়ে সহজ হবে। ওর পকেটেই রয়েছে উপহার পাওয়া বহু ফলার ছুরিটা।

ছুরি বের করে তিন গোয়েন্দার দড়ি কেটে ওদের মুক্ত করতে বেশি সময় লাগল না জিনার।

তাগাদা দিল কিশোর। 'জলদি চলো। চোরগুলোকে ধরে ওদের কাছ থেকে ছবিগুলো আদায় করে নিতে হবে।'

সেলার থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সদর দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে গেছে চোরেরা। তবে ঢুকতে অসুবিধে হলেও বেরোতে অসুবিধে নেই। জানালার ছিটকানি খুলে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা।

'থানায় যাব?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'মিডলটনের থানা চিনি না,' জিনা বলল। 'গোবেল বীচ বেশি দূরে না। ওই থানায়ই যেতে পারি। ওখানকার পুলিশও আমাদের চেনে। মিডলটন থেকে অর্ধেক দূরে তো চলেই এসেছি, আর অর্ধেক গেলেই হলো।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর। 'তাতে সময়ও বাঁচবে। মিডলটনে গিয়ে থানা খুঁজে বের করতেও তো সময় লাগবে। চলো।'

তবে বলা যত সহজ করা ততটা হলো না। ভীষণ ঠাণ্ডা রাত। ঘন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। ফলে আলোও নেই। সাইকেল চালাতেও অসুবিধে। চলছে ওরা, চলছেই, তার পরেও পথ ফুরায় না। আস্তে আস্তে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সবাই। রবিন বলেই ফেলল, 'অবাক কাণ্ড! এতক্ষণে তো গোবেল বীচে ঢুকে পড়ার কথা!'

'পথ হারাইনি তো?' দুশ্চিন্তাটা প্রকাশ করে ফেলল মুসা।

'দাঁড়াও তো,' কিশোর বলল। 'একটা সাইনবোর্ড মনে হচ্ছে।'

সাইকেল থেকে নামল সবাই। সাইনবোর্ডই। তবে লেখা পড়া গেল না।

'চৌরাস্তায় ভুল করেছি,' চিন্তিত হয়ে বলল জিনা। 'আরেক পথে চলে এসেছি ভুল করে। ফিরে গিয়ে খুঁজে বের করা ছাড়া উপায় নেই।'

'ইস্, একটা আলোটালো যদি পেতাম!' বলেও সারতে পারল না রবিন, সামনে দেখা গেল হেডলাইট। দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল আলো দুটো। কাছে এসে ব্রেক কষল, টায়ারের আর্তনাদ তুলে থেমে গেল গাড়ি।

পুলিশের পেট্রোল কার। ভেতরে দুজন অফিসার। একজন ইন্সপেক্টর। আরেকজন সার্জেন্ট। টহলে বেরিয়েছে। লোকে পার্টিতে ব্যস্ত। অপরাধগুলো এ সময়ই বেশি হয় রাস্তায়, কারণ নির্জন থাকে পথঘাট। কড়া নজর রেখেছে দুই পুলিশ অফিসার। এত রাতে চোর-ডাকাত আশা করছে তারা, চারটে কিশোর-কিশোরী

আর একটা কুকুরকে অবশ্যই নয়। ওদেরকে খুঁজতে যে পুলিশ আসেনি, নিশ্চিত কিশোর। কারণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ওরা বেশিক্ষণ হয়নি। এত তাড়াতাড়ি খোঁজ পড়ার কথা নয়।

পথ হারানোতে বিশেষ চিন্তিত ছিল না কিশোর। খুঁজে বের করতে সময় হয়তো লাগত, কিন্তু অসম্ভব ছিল না। তবু পুলিশ দেখে হাঁপ ছাড়ল।

'ভালই হলো,' ভাবল সে। 'গোবেল বীচে ফেরার পথ বাতলে দিতে পারবে পুলিশ।'

জিজ্ঞেস করার সময় পেল না সে। তার আগেই বেরিয়ে এল দুই পুলিশ অফিসার। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল একজন, 'এই, এত রাতে কি করছ এখানে?'

ইন্সপেক্টরের কণ্ঠস্বর পছন্দ হলো না রাফির। গরগর শুরু করল সে।

'সরাও ওটাকে! চুপ করাও!' ধমক দিয়ে বললেন পুলিশ অফিসার। 'চেহারাটা তো বিটকেলে!'

প্রতিবাদ জানাল জিনা। তার রাফি এত খারাপ হতেই পারে না। কিন্তু মানতে রাজি নয় ইন্সপেক্টর। মেজাজ ভাল নেই তার। রেগে আছে। এই রাতে ডিউটি দিতে ভাল লাগছে না। সবাই বসে বসে বাড়িতে স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে নিউ ইয়ারের আনন্দ করবে, আর তাকে ডিউটি দিতে হবে, এটা মেনে নিতে পারছে না কিছুতেই।

'দেখো, ভদ্রভাবে কথা বলো!' আবার ধমক দিল সে। 'আদব-কায়দা শেখোনি নাকি?' ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোরের দিকে। 'আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু দাওনি। এত রাতে এখানে কি করছ?'

'গোবেল বীচে যাচ্ছি,' জবাবটা দিল জিনা।

'বানিয়ে বলার আর জায়গা পাওনি! গোবেল বীচ কি উল্টোদিকে নাকি?'

'পথ ভুল করেছি। সেটা যখন বুঝলাম, আপনারাও চলে এলেন।'

'তাই? কোত্থেকে এসেছ?'

'গোবেল বীচ,' জানাল রবিন।

'দেখো, ফালতু কথা বলবে না আমার সঙ্গে! গোবেল বীচ থেকে গোবেল বীচে যায় কি ভাবে? আর এই রাতের বেলা, এত ঠাণ্ডায়, নিউ ইয়ারের পার্টি ফেলে কোন ছেলেমেয়ে বেরোয়? ব্যাপারটা সুবিধের লাগছে না আমার।'

'গোবেল বীচ থেকে গোবেল বীচে যাওয়া যায় না,' ব্যাখ্যা করে বোঝাল কিশোর। 'কিন্তু গোবেল বীচ থেকে এসে তারপর তো আবার ফেরত যাওয়া যায়। মিডলটনে গিয়েছিলাম আমরা। ফিরে চলেছি গোবেল বীচে।'

'তার পরেও সুবিধের লাগছে না,' কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি নন ইন্সপেক্টর। 'নিশ্চয় বাড়ি থেকে পালিয়েছ তোমরা।'

'যদি ভবঘুরে কিংবা জিপসি না হয়ে থাকে,' সার্জেন্ট বলল। 'বিদেশীই লাগছে। জিপসি হলে অবাক হব না। কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখেছেন, স্যার? ছেঁড়া, ময়লা। হাতে মুখে এত মাটি লাগল কোত্থেকে!'

সেলারে মাটিতে গড়াগড়ি করে এলে এর চেয়ে ভাল অবস্থা আশাও করা যায়

না।

'দেখুন,' মুসা বলল। 'আপনারা ভুল করছেন।'

'সাইকেলগুলো কিন্তু একেবারে নতুন!' সন্দিহান হয়ে উঠেছে ইন্সপেক্টর। 'চুরিটুরি করে আনেনি তো?'

'দেখুন, বাজে কথা বলবেন না!' রেগে গেল জিনা। 'দেখে কি চোর মনে হয় আমাদের? গোবেল বীচে কোথায় যাচ্ছি, জানেন? থানায়। একটা খবর দিতে।'

'বেশ, বেশ, বেশ!' ব্যঙ্গ করার ভঙ্গিতে বলল সার্জেন্ট। 'তা জানতে পারি কি, খবরটা কী?'

অফিসারদের এহেন আচরণে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে কিশোরের। মাথা সোজা করে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল সে, 'খবরটা হলো, এক বছর আগে হোরেস ট্রিমেইনি যে ছবিগুলো চুরি করেছিল, সেগুলো খুঁজে পেয়েছি আমরা। মাল সহ চোরগুলোকে আটক করতে হলে এটাই সুযোগ।'

'তাই নাকি?' টেনে টেনে বলল সার্জেন্ট। তারপর হো হো করে হেসে উঠল। 'গালগল্প তো বেশ ভালই বলতে পারো। বই লেখার চেষ্টা করো না কেন? ভাল পারবে। এ সব কাহিনী পুলিশকে বিশ্বাস করাতে পারবে ভেবেছ?'

'করা না করা সেটা পুলিশের ইচ্ছে!'

'কিন্তু সত্যি বলছি আমরা!' প্রায় চিৎকার করে উঠল রবিন।

'বেশি ঠাণ্ডা,' ইন্সপেক্টর বলল। 'এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলাই মুশকিল। সাইকেলগুলো রেখে গাড়িতে এসে ওঠো। ওগুলো পরে তুলে নিয়ে যেতে পারব। পেনড্‌ল্‌ সেইন্ট জনে নিয়ে যাব তোমাদের। সেখানে তোমাদের আইডেনটিটি চেক করব। তোমাদের কথা কতটা সত্যি থানায় বসেই খোঁজ নিতে পারব। নেয়া সহজও হবে। সময় অবশ্য লাগবে। তবে নিয়মের বাইরে তো আর যেতে পারি না।'

মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'কিন্তু তাইলে যে বেশি দেরি হয়ে যাবে। অনেক দূরে চলে যাবে চোরেরা। আর তখন ধরা যাবে না ওদের। ছবিগুলোও যাবে।'

'আমাদেরকে এ ভাবে আটকানোর কোন অধিকার আপনার নেই,' কিশোরও রেগে গেল। 'আমরা কোন অন্যায় করিনি। বরং পুলিশকে সাহায্যই করতে চাইছি।'

'শোনো শোনো, কথা শোনো,' হাসতে লাগল ইন্সপেক্টর। 'কি ভাবো নিজেকে? শার্লক হোমস?'

'না, তা ভাবি না! আমার নাম কিশোর পাশা। বেড়াতে এসেছি গোবেল বীচের বিখ্যাত বিজ্ঞানী...'

কঠোর কণ্ঠে নির্দেশ দিল সার্জেন্ট, 'যাও, গাড়িতে ওঠো!'

প্রতিবাদ জানাল ছেলেমেয়েরা। আরও তর্ক করল। কোন কথাই শুনল না পুলিশ। কিছুতেই বোঝানো গেল না ওদের।

'অনেক বকবকানি হয়েছে,' ইন্সপেক্টর বলল। 'আর কিচ্ছু শুনতে চাই না আমি। ভাল চাইলে গাড়িতে ওঠো।'

মুখ কালো করে গিয়ে গাড়িতে উঠল গোয়েন্দারা। তবে চুপ করে বসে থাকল

না কিশোর। গাড়ি যখন চলছে, পকেট থেকে তার রুমালটা বের করে, কলম দিয়ে তাতে একটা চিঠি লিখল সে, অন্ধকারে কাপড়ের মধ্যে যতটা পারল। সেটা বাঁধল রাফির কলারে। সামনের সীটে বসে এ সবের কিছুই জানল না সার্জেন্ট কিংবা ইন্সপেক্টর।

পেনড্ল্ সেইন্ট জন থানার সামনে গাড়ি থামল। পেছনের দরজা খুলে অন্যদেরকে নামতে বলল কিশোর। রাফির কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'বাড়ি চলে যাবি! সোজা বাড়ি! জিনাদের বাড়ি!' বলেই ঠেলে বাইরে বের করে দিল কুকুরটাকে। পেছনে আলতো চাপড় দিয়ে আবার বলল, 'যা! বাড়ি!'

এই কয়েকটা কথাই রাফির জন্যে যথেষ্ট। একবার ফিরে তাকাল কিশোরের মুখের দিকে। বোঝার চেষ্টা করল, সত্যিই যেতে বলছে কিনা। তারপর লেজ নাড়তে নাড়তে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। এত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা, দুই পুলিশ অফিসার থানায় ঢোকার আগে লক্ষই করল না যে কুকুরটা নেই।

'আরে,' সার্জেন্ট বললেন। 'কুকুরটা গেল কোথায়?'

হাত নেড়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'যেখানে খুশি যাক। ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে এসো।'

বারো

পেনড্ল্ সেইন্ট জন থানায় মাত্র দু'জন পুলিশ পাহারায় রয়েছে, একজন কনস্টেবল, আরেকজন সার্জেন্ট। ছেলে-মেয়েদেরকে তাদের হাতে সোপর্দ করল ইন্সপেক্টর। 'মনে হয় বাড়ি থেকে পালিয়েছে,' বলল সে। 'রাস্তায় সাইকেল চালাচ্ছিল। ওরা বলেছে গোবেল বীচ যাচ্ছে, কিন্তু সেটা উল্টো দিক। আরও কিছু গল্প বলল, বিশ্বাস করতে পারলাম না।'

মুখ কালো করে জিনা বলল, 'বার বার একই কথা! কত বার বলব, বাড়ি থেকে পালাইনি! আর দল বেঁধে পালাতে যাবই বা কেন?'

'তোমাদের বাবা-মায়ের সাথে আগে কথা বলি, জানা যাবে। ততক্ষণ এখানেই থাকতে হবে তোমাদের। গোলমাল করবে না। রিপোর্ট লিখতে বসব এখন।'

চারজন লোক বসে চারটে ফর্ম পূরণ করতে লাগল। চুপ করে বেঞ্চে বসে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল ছেলেমেয়েরা।

'রাফি কোথায়?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি!' জবাব দিল কিশোর। 'পথে গলা থেকে রুমালটা খুলে পড়ে না গেলেই হয়। মেসেজ লিখে দিয়েছি পারকার আংকেলের কাছে,' চুলে হাত বোলাল সে। 'অনেক দেরি হয়ে গেল!'

'হ্যাঁ, মাঝরাত,' ঘড়ি দেখল মুসা। 'আংকেল কি ভাববেন কে জানে! তবে মেসেজ পাঠিয়ে ঠিক কাজই করেছ। আর কিছু করার ছিল না। এ রকম জরুরী

একটা ব্যাপার…'

কাছে এসে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল পুলিশ। গোবেল ভিলায় ফোন করার পরামর্শটা জিনাই দিল। কিন্তু করা হলে দেখা গেল, লাইন ডেড। কি করে যে হলো, কিছুই বোঝা গেল না। অনেক সময় হয় এ রকম। সবচেয়ে কাজের জিনিসটা বিকল হয়ে যায় প্রয়োজনের সময়ে। নিউ ইয়ারের ছুটি শেষ না হলে আর মেরামত হবে না।

উত্তেজনা অসহ্য হয়ে উঠছে ওদের কাছে। প্রতিটি মিনিট যাচ্ছে, আর অস্বস্তি বাড়ছে ওদের। কারণ যতই সময় যাচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছে চোরেরা। কমে যাচ্ছে ধরা পড়ার সম্ভাবনা।

দূরে গির্জায় ঘণ্টা বাজিয়ে সময় ঘোষণা করা হলো। এই সময় বাইরে একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হলো। তারপর শোনা গেল দৃঢ় গমগমে কণ্ঠ।

'আব্বা এসে গেছে!' বলে উঠল জিনা।

ঘরে ঢুকলেন পারকার আংকেল। সাথে রাফি। নিজের পরিচয় দিলেন পুলিশের কাছে। তারপর ফিরলেন ছেলে-মেয়েদের দিকে।

মুখ লাল হয়ে গেছে ইন্সপেক্টরের, লজ্জায়, যখন বুঝল সত্যি কথাই বলেছে ছেলেমেয়েগুলো।

কড়া চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আংকেল, 'ব্যাপারটা কি, অ্যাঁ? স্টোররুম থেকে বেরোলে কখন? আমরা ভাবছি তোমরা খেলছ, আর এদিকে…রাফি ঠিকমত না গেলে তো…কিশোর, ব্যাপারটা কি, বলো তো?'

বলার সুযোগ পেয়েছে, আর কি ছাড়ে সে। পরে আংকেল বাড়ি নিয়ে গিয়ে বকাবকি করুন আর যাই করুন, তখন চুপ করে থাকা যাবে না হয়। বলল, 'আংকেল, আরেকটা রহস্য সমাধানের চেষ্টা করছিলাম আমরা। দোকানের খেলনা চুরি আর পলিদের নীল ভালুক চুরির রহস্য…'

শুরু থেকে গল্পটা বলে যেতে লাগল কিশোর। মাঝে মাঝে কথা জোগান দিল রবিন, জিনা আর মুসা। শুনে তো থ হয়ে গেল পুলিশেরা।

'অসম্ভব!' এক সময় আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল ইন্সপেক্টর। 'সব বানিয়ে বলছে ওরা!'

'আমার তা মনে হয় না,' গম্ভীর মুখে বললেন পারকার আংকেল। 'ওরা মিথ্যুক নয়। মাঝেসাঝে এ রকম রহস্যে জড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছু রহস্যের সমাধানও করেছে। ওদের কথা বিশ্বাস করা উচিত। যা বলছে করা উচিত। অবিশ্বাস করে চুপ করে থাকতে পারেন অবশ্য, পরে পস্তাবেন।'

এই শেষ কথাটা ম্যাজিকের মত কাজ করল। হঠাৎ যেন সাড়া পড়ে গেল পুলিশদের মাঝে। ফোন তুলে নিল একজন সার্জেন্ট। রেডিওতে পেট্রোল কারগুলোকে হুঁশিয়ার করতে ছুটল ইন্সপেক্টর আর আরেকজন সার্জেন্ট। মিনিট কয়েক পরেই ফিরে এল ইন্সপেক্টর।

'সাহায্য আসছে,' জানাল সে। 'ফোর্স পাঠাতে বলেছি। বসে থাকলে চলবে না। বেরোতে হবে আমাদের।' পারকার আংকেল আর ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে বলল, 'ডন হারভের বাড়ি চেনো কেউ? তাকে ধরতে পারলে বাকিগুলোকে ধরার

ব্যবস্থা হতে পারে। কোথায় পাওয়া যাবে অন্যদেরকে হয়তো বলতে পারবে সে।'

'বেরিয়ে গেলেই মুশকিল,' গম্ভীর হয়ে আছে সার্জেন্ট। ছেলেমেয়েদের কথা অবিশ্বাস করে সময় নষ্ট করেছে বলে এখনই অনুশোচনা আরম্ভ হয়েছে।

'সেটা ভেবে বসে থাকলে তো আর চলবে না। চেষ্টা করতে হবে।' আবার ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'চেনো?'

'না, বাড়িটা চিনি না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে মিডলটনে থাকে, জানি। ওখানকার কাউকে জিজ্ঞেস করলেই চিনিয়ে দেবে। আমরা আসব আপনাদের সঙ্গে?'

মানা করে দিল ইন্সপেক্টর।

তবে তাকে বোঝাতে পারল কিশোর, ওদেরকে সঙ্গে নিলে অনেক সুবিধে হবে। কারণ চোরগুলোকে ওরা চেনে, দেখেছে। চিনিয়ে দিতে পারবে।

'আপনারা আপনাদের গাড়িতে যান,' পারকার আংকেল বললেন। 'আমি ওদেরকে নিয়ে আসছি আমার গাড়িতে করে।'

হেডকোয়ার্টারে আরেকটা মেসেজ পাঠাল ইন্সপেক্টর। মিডলটনে যাচ্ছে সে-কথা জানাল। অনুরোধ করল ফোর্স যেন তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয় পেনড্ল্ সেইন্ট জনে।

রওনা হয়ে গেল দলটা। আগে আগে পুলিশের গাড়ি। পেছনে পারকার আংকেলের। তাঁর সঙ্গে রয়েছে কিশোররা চারজন আর রাফি।

ব্ল্যাক ক্যাট কাফেতেও চলছে নিউ ইয়ারের পার্টি। বাইরে থামল দুটো গাড়ি। পুলিশের আগেই নেমে পড়ল কিশোর, ছুটে গেল সামনের গাড়িটার কাছে। ইন্সপেক্টরকে বলল, 'মালিকের ছেলে হ্যারিকে চিনি আমরা। যদি বলেন, আমি একাই গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসতে পারি ডনের বাড়িটা কোথায়। তাতে কেউ কিছু ভাববেও না, কারও নজরে পড়ার সম্ভাবনাও কম।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো ইন্সপেক্টর। 'বুদ্ধিটা ভাল। ডনের পেছনে যে পুলিশ লেগেছে, এ কথা লোকে এখন না জানলেই ভাল। তাহলে সতর্ক করে দেয়া হবে তাকে।'

মুসা বলল, 'কিশোর, আমার সঙ্গে হ্যারির খাতির বেশি। আমি যাই?'

'বেশ, যাও।'

কাফেতে ঢুকে পড়ল মুসা। অনেক লোক। হ্যারিকে দেখা গেল ব্যস্ত হয়ে এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে ছোটাছুটি করছে। অনেক কষ্টে তাকে থামিয়ে কথা বলতে পারল মুসা। 'হ্যারি, চিনতে পারছ? আমি, মুসা। একটা কথা জানতে এলাম। আচ্ছা, ডন হারভের বাড়িটা চেনো?'

'ডন হারভে? তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? সে তো লোক ভাল নয়!'

'জানি। তবু তার সঙ্গে দেখা করা খুব দরকার।'

অবাক হলেও সময় নেই বলে আর কোন প্রশ্ন করল না হ্যারি। বলল, 'হাই স্ট্রীটের গ্র্যান্ড কাফে চেনো? আচ্ছা। ওখানে গিয়ে বাঁয়ের প্রথম গলিটায় ঢুকবে। চলে যাবে শেষ মাথায়। একেবারে শেষ বাড়িটাই। ওটা তার ভাইয়ের বাড়ি। ওখানেই থাকে ডন।'

‘অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, হ্যারি!’

বেরিয়ে এসে পুলিশকে ঠিকানা জানাল মুসা। আবার চলল দুটো গাড়ি। বাড়িটায় পৌঁছে দেখা গেল, একটা জানালায়ও আলো নেই। দরজায় থাবা দিল সার্জেন্ট। একটা জানালায় আলো জ্বলল। খুলে গেল দরজা।

খুলে দিয়েছে লম্বা, স্বাস্থ্যবান এক যুবক। অন্ধকারে পুলিশের পোশাক ঠিকমত দেখা যায় না। চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, ‘কি চাই? কে আপনারা?’

‘পুলিশ। ডন হারভে এখানে থাকে?’ এগোল ইন্সপেক্টর।

চমকে গেল লোকটা। ‘আবার তাহলে বাধিয়েছে! হ্যাঁ, এখানেই থাকে...’

‘ঘরে আছে?’

‘নেই।’

‘কখন গেল?’

‘এই তো, ঘণ্টা দুই আগে এসে জিনিসপত্র ব্যাগে গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম। বলল, বাইরে কোথায় নাকি একটা চাকরি পেয়েছে। ও এ রকম মাঝে মাঝেই আসে যায়। অবাক হইনি। তবে মনে হলো, এবার বেশ কিছুদিনের জন্যেই যাচ্ছে। জলপথেই যাবে মনে হলো। ওর কথায় বুঝলাম।’

‘জিজ্ঞেস করেননি কোথায় যাচ্ছে?’

‘না। এখন আর করি না। করলে সত্য জবাব দেয় না, খামোকা কি লাভ। তবে বেশ খুশি খুশি মনে হলো আজ। কি করেছে?’

‘এখন বলা যাবে না। তবে সত্যি কথা বললেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। বিরক্ত করলাম। গুড নাইট।’

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

পারকার আংকেলের সঙ্গে দ্রুত আলোচনা করে নিল ইন্সপেক্টর আর সার্জেন্ট।

গোবেল বীচ বড় বন্দর নয়। দেশের ভেতরে বেশিদূর যাওয়ার মত ইন্টারনাল ফেরি যোগাযোগ নেই। সে-কথাই বলল ইনসপেক্টর, ‘যেতে হলে ফিশিং বোটে করে যেতে হবে। কিংবা মোটর লঞ্চ। বলেই তো দিয়েছে, দেশের বাইরে চলে যাবে। ছেলেমেয়েরা শুনেছে সে-কথা। নিয়ে গিয়ে ছবিগুলো বিক্রি করে টাকা ভাগাভাগি করে নেবে।’

‘হয়তো চলেই গেছে এতক্ষণে,’ নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে সার্জেন্টের।

‘না, তা বোধহয় যেতে পারেনি,’ কিশোর বলল। ‘এতটা তাড়াহুড়ো তো দেখলাম না। ওরা নিশ্চয় ভাবছে আমরা এখনও সেলারেই আটকে রয়েছি। কাজেই ততটা সতর্ক হবে না।’

‘আরও একটা ব্যাপার।’ এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল সে, ‘আমাদের জন্যে ওদের প্ল্যান বদলাতে হয়েছে। আজ রাতে যাওয়ার কথা ছিল না, আমরা বাদ সাধলাম বলেই যেতে হচ্ছে। ধরা যাক, বোট আছে ওদের। তবে তাতে দূরে পাড়ি দেয়ার মত রসদ নেই। সে-সব জোগাড় করে রওনা হতে সময় লাগবে। ট্যাংকে তেল ভরারও ব্যাপার আছে। আজ ছুটির দিন। সব কিছু বন্ধ। তেল জোগাড় করতেও অসুবিধে হবে ওদের, সময় লাগবে।’

অবাক হয়ে কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ইন্সপেক্টর। ‘শার্লক

হোমসই তুমি। তখন ওভাবে তোমাকে টিটকারি দেয়াটা উচিত হয়নি। মাথায় ঘিলু আছে তোমার, সত্যি!'

তেরো

আবার এসে গাড়িতে উঠল সবাই। পুলিশেরা পুলিশের গাড়িতে, ছেলেমেয়েরা পারকার আংকেলের গাড়িতে। দ্রুত ছুটল গোবেল বীচের উদ্দেশে। পিংক হাউসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেটা দেখিয়ে জিনা বলল তার আব্বাকে, 'চোরাই ছবিগুলো ওখানেই পেয়েছি। রাফি না থাকলে আর বেরোতে হত না আজকে আমাদের। এখনও ওখানেই আটকে থাকতাম।'

গোবেল বীচে পৌঁছল ওরা। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। কোমল আলোয় ভাসিয়ে দিল পুরো বন্দর এলাকা। নানা রকম বোট রয়েছে জেটিতে। মোটর বোট, ফিশিং বোট, লঞ্চ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ভাসছে পানিতে। শান্ত পরিবেশ। সব কিছু চুপচাপ, শুধু ঢেউয়ের মৃদু ছলাৎছল ছাড়া। মাঝেসাঝে একআধটা বোট গায়ে গায়ে ঘষা লেগে ক্যাচকোঁচ করে উঠছে।

'কোনখান থেকে শুরু করব?' সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করল।

জেটিতে দাঁড়িয়ে দু'জন পুলিশ অফিসার, পারকার আংকেল আর ছেলেমেয়েরা ঘুরে ঘুরে তাকাতে লাগল। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না।

'তীর ধরে হেঁটে যাই,' ইন্সপেক্টর বলল। 'কিছু চোখে পড়তে পারে।'

'আমরাও আসি,' বললেন পারকার আঙ্কেল। ছেলেমেয়েদেরকে বললেন, 'শোনো, তোমরা গিয়ে গাড়িতে বসে থাকো।'

'আব্বা!' আবদার ধরল জিনা। 'আমরাও আসি না! কি হবে?'

'না, জিনা, যা বলছি শোনো। তোমাদের আসা লাগবে না। বসে থাকো। আমরা আসছি।'

পেনড্ল্ সেইন্ট জন থানায় রেডিওতে মেসেজ পাঠাল ইন্সপেক্টর। পুলিশ ফোর্স এসেছে কিনা জানতে চাইল। আসেনি শুনে বলল, এলে যেন তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয় গোবেল বীচ বন্দরে। তারপর হাঁটতে শুরু করল।

অন্ধকার ছায়ায় হারিয়ে গেল তিনটে ছায়ামূর্তি।

গাড়ির ভেতরে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল গোয়েন্দারা। শেষে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল জিনা, 'আব্বাটা যে কেন আমাদের নিল না!'

'তাতে কি?' কিশোর বলল। 'আমরা তো আর কথা দিয়ে ফেলিনি যে গাড়িতেই বসে থাকব। বেরিয়ে গেলেই পারি। চলো, আমরাও খোঁজাখুঁজি করি, অন্য ভাবে।'

'না না!' রবিন গুরুজনের কথা অমান্য করতে রাজি নয়। 'আজ রাতে এমনিতেই অনেক অন্যায় করে ফেলেছি, না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে। আর করতে চাই না।'

হঠাৎ এই সময় ঘাউ ঘাউ করে উঠল রাফি। সামনের পা জানালার ওপর তুলে দিয়ে নাক বের করে দিল। তার ঘাড়ে হাত দিল কিশোর। রোম দাঁড়িয়ে গেছে কুকুরটার। ব্যাপার কি!

'এই, চুপ করো তোমরা!' সঙ্গীদের হুঁশিয়ার করল সে। 'রাফি নিশ্চয় কিছু টের পেয়েছে!'

হালকা মেঘের ভেতরে ঢুকে গেছে আবার চাঁদ। জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতা অনেক কমে গেছে তাতে। সেই আলোয় দেখা গেল একটা আবছা মত ছায়ামূর্তি এগিয়ে চলেছে, হাতে দুটো পেট্রোলের ক্যান।

'ডনের মতই লাগছে!' মুসা বলল ফিসফিসিয়ে। পারকার আংকেল আর পুলিশ অফিসারেরা যে দিকে গেছে, তার উল্টো দিকে যাচ্ছে লোকটা।

'কিছু একটা করা দরকার আমাদের!' কিশোর বলল।

আবার মনে করিয়ে দিল রবিন, 'কিন্তু আংকেল তো এখানেই থাকতে বললেন!'

'তা বলেছেন। কিন্তু আমরা তো তাঁর অবাধ্য হচ্ছি না। ধরা যাক, রাফি কিছুতেই গাড়িতে থাকতে রাজি হলো না। তাকে বের করে দিতে বাধ্য হলাম আমরা। ছাড়া পেয়েই একটা লোকের পেছনে ছুটল সে। আমাদেরকেও যেতে হলো, তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে।'

'মিথ্যে বলবে?'

'এখন কাজ উদ্ধার করা দরকার। সত্যি-মিথ্যে নিয়ে ভাবছি না।'

দরজা খুলে দিয়ে রাফিকে নির্দেশ দিল সে। এক মুহূর্তও দেরি করল না কুকুরটা। তীরবেগে দৌড় দিল লোকটার পেছনে। সেলারের লোকগুলোর গন্ধ ভোলেনি সে। ওদেরই একজন তাকে পিটিয়েছিল। জিনাদের বেঁধে রেখেছিল। প্রতিশোধ নেবে সে!

গাড়ি থেকে নেমে রাফির পেছনে ছুটল কিশোর।

এতই দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা, কিছুই করার সুযোগ পেল না অন্য তিনজনে। বোকা হয়ে গেল যেন ওরা।

দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল রাফি। কিশোরকে দেখা যাচ্ছে, অস্পষ্ট। দৌড়াচ্ছে। তবে শিগগিরই তাকেও আর দেখা গেল না।

'দেখো, মস্ত ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে কিশোর,' জিনা বলল। 'এটা বসে বসে দেখতে পারি না আমরা। চুপ করে থাকা উচিত হবে না।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ওরাও।

'কি করতে চাও?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'যাব।'

'আমিও যাব। রবিন, তুমি বসে থাকো। আমরা না ফিরলে আংকেলকে বলবে।'

বসে থাকার ইচ্ছে নেই রবিনের। ওদের সঙ্গে যেতে পারলেই বেশি খুশি হয়। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো গাড়িটা পাহারা দিতেই হবে, বিশেষ করে আংকেল যখন বলে গেছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চুপ করে গাড়িতে বসে রইল সে।

অনেক ভারী লাগছে ক্যানগুলো। হাত ধরে এসেছে। জিরিয়ে নেয়ার জন্যে ও দুটো নামিয়ে রাখল ডন।

'এখনও বহুদূর! মরার বোটটা আরেকটু কাছে হলে কি হত!' বিড়বিড় করে গাল দিল সে। 'আর ওই ব্যাটা মারভিন, নিজে কিচ্ছু করবে না! খালি আমাকে হুকুম দেয়! বসে বসে থাকে!'

বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে। তার ওপর বোঝা বইতে গিয়ে যেন অবশ হয়ে গেছে আঙুলগুলো। মুখের কাছে এনে ফুঁ দিয়ে গরম করতে লাগল সে। জিরাতে পারল না বেশিক্ষণ। পিঠে এসে লাগল প্রচণ্ড আঘাত। সামলাতে না পেরে উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে।

উঠে দাঁড়ানোর আগেই ডান কাঁধে কামড় লাগল। চেঁচাতে শুরু করল ডন।

'ছাড়বি না, রাফি, ধরে রাখ!' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'আমি আসছি!'

মুহূর্ত পরেই পৌঁছে গেল সে। কামড় ছাড়ানোর জন্যে ধস্তাধস্তি করছে ডন। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। তার বিপদের কথা জানিয়ে দিতে চায় যেন জেটির সবাইকে।

গড়াগড়ি করছে কুকুর আর মানুষ। কিশোর কি করবে ঠিক করতে পারছে না। এই সময় সেখানে পৌঁছে গেল মুসা আর জিনা।

'এসেছ!' ওদেরকে দেখে খুশি হলো কিশোর। 'ধরো ব্যাটাকে! আমি একলা পারতাম না। রাফি, ছেড়ে দে!'

কামড় ছেড়ে সরে এল রাফি। উঠে বসল ডন। করুণ অবস্থা হয়েছে তার। আতঙ্কিত করে দিয়েছে তাকে অ্যালসেশিয়ানের বাচ্চা। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে কুকুরটার দিকে। তাকে যখন চেপে ধরল জিনা, মুসা আর কিশোর, বাধা দিল না সে।

'চলো, গাড়ির কাছে নিয়ে যাই,' কিশোর বলল। 'কিছু করতে চাইলে রাফি তো আছেই। এবার অ্যায়সা কামড় দিতে বলব...,' কথা শেষ করল না সে, ইঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিল। 'পুলিশও আছে। ধরে প্যাঁদানি দিলেই সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসবে পেটের কথা।'

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে জিনা। 'অনেক বেশি শব্দ করে ফেলেছে। মারভিন আর ইসাবেল এখন বেরিয়ে না এলেই বাঁচি।'

'ঠিকই বলেছ!' একমত হলো কিশোর। 'জলদি করা দরকার!' হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সে।

'কিন্তু পারকার আংকেলরা কোথায় আছেন, কে জানে! অন্ধকারে তাঁদেরকে খুঁজে বের করব কি ভাবে?'

তবে যতই সমস্যা আসুক, একটা না একটা সমাধান করেই ফেলবে কিশোর। উপায়ের অভাব নেই তার বুদ্ধির ভাণ্ডারে। বলল, 'চলো তো আগে গাড়ির কাছে যাই।'

নিরাপদেই গাড়ির কাছে পৌঁছল ওরা। মারভিন বা ইসাবেল কোন বিপদ ঘটাল না। গাড়ির কাছে এসেই হর্ন টিপে ধরল কিশোর। তিনবার লম্বা, তিনবার খাটো,

আবার লম্বা, আবার খাটো, এ ভাবে বাজাতে লাগল। এক ধরনের মেসেজ এটা। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার একই ভাবে বাজাল।

'বাহ্, সত্যি, কিশোর, তোমার তুলনা নেই!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মুসা। 'তিনটে লম্বা, তিনটে খাটো...এ তো এস ও এস। পুলিশ অফিসারেরা শুনলেই বুঝে যাবে কিছ একটা গড়বড় হয়েছে।'

উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে গোয়েন্দারা। দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না কিছুতেই। হয়তো কানে যাবে পুলিশের, ছুটেও আসবে হয়তো, কিন্তু সময় মত আসবে তো? মারভিন আর আইরিনকে ধরতে পারবে? ওরা ঘুণাক্ষরেও যদি বুঝতে পারে, ডন ধরা পড়েছে, আসবে না আর। সোজা পালানোর চেষ্টা করবে। ডনের জন্যে নিজেদেরকে বিপদে ফেলতে রাজি হবে না কিছুতেই।

আরেকটা উপায় বের করা দরকার।

বুদ্ধিটা বের করল এবার জিনা।

চোদ্দ

'ডন, শোনো,' জিনা বলল, 'একটা কাজ করলে বেঁচে যেতে পারো। অন্তত শাস্তি কম করাতে পারো। আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে। বলে দাও, তোমার সঙ্গীরা কোথায় আছে, ছবিগুলো কোথায় আছে। পুলিশের কাছে তোমার পক্ষে সুপারিশ করব আমরা। আমার বিশ্বাস, সরকারী উকিলও তাই করবেন।'

'আর না বললে,' কিশোর বলল, 'আবার কুত্তা লেলিয়ে দেব। রাফিকে যে পিটিয়েছেন সেই জেদ এখনও যায়নি...'

এমনিতে যত বাহাদুরিই দেখাক, ডন খুব ভীতু। কুকুরের কামড় খাওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইল না। তা ছাড়া ধরা যখন পড়েই গেছে, বললে যদি কিছু সুবিধে হয়, সেটা নেয়াই উচিত। আর দ্বিধা করল না সে। বলল, 'মারভিনের বৌ ইসাবেল। মোটর বোটে রয়েছে দু'জনে। আমার জন্যে বসে আছে। জেটির শেষ মাথায় ছোট একটা খাঁড়িতে আছে বোটটা। আমি যখন বেরোচ্ছি, তখন ক্যানভাসে মোড়াচ্ছিল ছবিগুলো। ফুয়েল ট্যাংক একেবারে খালি। তাই আমাকে পাঠিয়েছে তেল নিয়ে যেতে।'

'গুড!' খুশি হলো কিশোর। 'তারমানে আটকা পড়েছে ওরা!'

'মোটর বোট!' অবাক লাগল মুসার। 'তারমানে বেশি দূরে যেতেন না আপনারা?'

'না। কাছেই একটা বড় বন্দর আছে। সেখানে যাবে ঠিক করেছিল মারভিন। ওখানকার অনেককে চেনে সে। বড় একটা বোটের মালিক আছে, যে তার বন্ধু। তার বোটে করে দূরে কোথাও চলে যেতাম...'

'ওই যে, আংকেল এসে গেছেন!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল রবিন।

পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে ছুটে আসছেন তিনি। 'কি, হচ্ছেটা কি?' কাছে এসে

জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'ও, তাহলে আমার কথা শোনোনি! গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিলে!' ডনের ওপর চোখ পড়তে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই লোক কে?'

'ওর নাম ডন হারভে, আব্বা,' জিনা জানাল। 'রাফি ধরেছে।'

একটা মুহূর্ত দেরি করল না দুই পুলিশ অফিসার। লোকটাকে প্রশ্ন শুরু করল। করে গেল একনাগাড়ে। জবাব দিতে দিতে হাঁপিয়ে গেল ডন। ছেলেমেয়েদের যা বলেছিল, সেই একই কথা বলতে হলো আরেকবার। জানাল, কোথায় মোটরবোট নিয়ে অপেক্ষা করছে মারভিন আর তার স্ত্রী। এই উত্তেজনার মুহূর্তে ছেলেমেয়েদেরকে বকতে ভুলে গেলেন পারকার আংকেল। ওদের সঙ্গে আসার কথা বারণ করতেও মনে রইল না। কাজেই ওরাও চলল পুলিশের সাথে।

এই সময় পৌঁছে গেল বাড়তি ফোর্স। বড় কালো একটা গাড়ি এসে থামল। নামল ছয়জন পুলিশম্যান। তারাও চলল সঙ্গে।

নীরবে চলল দলটা। কিছুদূর এগোনোর পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল ডন। হাত তুলে দেখাল একদিকে। 'ওই যে, ওখানে।...ওই তো, বোটটা, সাদা।'

ম্লান জ্যোৎস্না। তার ওপর বোটটা সাদা হওয়ায় ভালমতই দেখা যাচ্ছে ওটা। সাগরের পানির রঙ এখন কালচে।

ঠিক এই সময় চালু হয়ে গেল বোটের ইঞ্জিন। বেড়ে গেল গর্জন। খোলা সাগরের দিকে রওনা হয়ে গেল বোট। নিশ্চয় পুলিশকে দেখে ফেলেছে মারভিন আর ইসাবেল। পালাতে চাইছে। ডন ধরা পড়েছে কিনা জানার কথা নয় ওদের। ওর জন্যে নিশ্চয় একটুও ভাবেনি, তাহলে এ ভাবে রওনা দিত না। আরও একটা ব্যাপার, জানে, ট্যাংকে তেল খুব কম। সাগরে গিয়ে যে কোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে ইঞ্জিন। সেই পরোয়াও করেনি। তবে তাদের এই আচরণে অবাক হয়নি কেউ ও রকম চোরের কাছে এর চেয়ে বেশি আর কি আশা করা যায়?

'কোস্টগার্ডকে সতর্ক করে দেয়া দরকার!' বলল সার্জেন্ট।

'কিন্তু তাতে সময় লাগবে,' ইন্সপেক্টর বলল। 'ওরা কিছু করার আগেই পালিয়ে যাবে চোরগুলো। কি একখান জোড়া, আহা! স্বামীও চোর, বৌটাও চোর! মিলেছে!'

আরেকটা বুদ্ধি এসে গেল কিশোরের মাথায়। এ রকম জরুরী অবস্থায় একের পর এক আইডিয়া খেলে যায় তার মাথায়। 'ওই যে দেখুন, আরেকটা বোট! তেরপল নেই। ওটাতে উঠে যেতে পারব। ইঞ্জিনটা কোনমতে স্টার্ট নেয়াতে পারলেই পিছু নিতে পারব ব্যাটাদের!'

কথাটা পছন্দ হলো ইন্সপেক্টরের। দেরি করল না। গিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল বোটে। তার পর পরই উঠল সার্জেন্ট আর পারকার আংকেল। গোয়েন্দারাও দাঁড়িয়ে রইল না, কিংবা কারও অনুমতির অপেক্ষায় রইল না। সোজা গিয়ে উঠে পড়ল।

তীরে দাঁড়ানো পুলিশম্যানদের ডেকে বলল সার্জেন্ট, 'তোমরা যাও! কোস্টগার্ড স্টেশনে গিয়ে জানাও ওদের। জলদি!'

ইগনিশন কী নেই। চাবি ছাড়াই ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার কায়দা জানে সার্জেন্ট। হুইল ধরল ইন্সপেক্টর। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগছে মুখে। কান খাড়া করে ফেলল রাফি। ঢেউয়ের ছিটে এসে লাগছে, যেখানটায় লাগছে লবণ লেগে গিয়ে নোনতা হয়ে যাচ্ছে। চড়চড় করে চামড়া। কেয়ারও করল না গোয়েন্দারা। তাকিয়ে রয়েছে

সাদা বোটটার দিকে। একটাই ভাবনা, কিছুতেই চোরগুলোকে পালাতে দেয়া চলবে না।

কিন্তু দুটো বোটের মাঝের দূরত্ব বাড়ছেই। ধরা কি যাবে না? পালিয়ে যাবে মারভিন আর ইসাবেল?

ভাবনাটাই গায়ে জ্বালা ধরায়। 'ইস্‌সি, রাফিরে!' মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে কিশোরের। 'এত কষ্ট খামোকাই করলাম রে!'

'ভাবছ কেন?' মনে করিয়ে দিল রবিন, 'ভুলে গেছ, ওদের পেট্রোল কম?'

'তাই তো!' বলে উঠল মুসা। 'এ কথাটা তো মনে ছিল না!'

'এই দেখো, দেখো!' চিৎকার করে বলল জিনা।

দেখার জন্যে চোখ বড় বড় করে ফেলল গোয়েন্দারা! সত্যিই তো! সাদা জিনিসটা বড় হচ্ছে!

'ধরা যাবে! ধরা যাবে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'বলেছিলাম না, ধরা যাবে...'

'গেছে!' কিশোর বলল, 'ব্যাটাদের পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে! আর নড়তে পারবে না!'

ঘটেছেও তা-ই। মোটর বোটের ট্যাংকে তেল শেষ। কিছুই করার নেই আর মারভিন এবং ইসাবেলের। চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থেকে পুলিশের হাতে ধরা দেয়া ছাড়া। আরেক কাজ করতে পারে। সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে পালানোর চেষ্টা করতে পারে। তবে এই ঠাণ্ডার মধ্যে সেটা হবে আত্মহত্যার সামিল। মরার চেয়ে জেলে গিয়ে বেঁচে থাকাও ভাল, কাজেই সেটা করতে গেল না ওরা।

'গুলি না চালিয়ে বসে!' ছেলেমেয়েদের জন্যে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন পারকার আংকেল। ওদেরকে ছোট কেবিনটায় ঢুকে পড়তে বললেন তিনি। গোলাগুলি চললে ভেতরে কিছুটা অন্তত নিরাপদ।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আদেশ পালন করল ওরা।

সাদা বোটের কাছাকাছি চলে এল পুলিশের বোট। মুখে হাত জড়ো করে চেঁচিয়ে বলল ইন্সপেক্টর, 'অ্যাই, সারেন্ডার করো! তোমাদেরকে গ্রেপ্তার করা হলো। কোন গোলমাল করবে না! হাত তুলে উঠে এসো!'

গুলি হওয়ার আশঙ্কায় রইল ইন্সপেক্টর আর সার্জেন্ট। তৈরি হয়ে আছে দু'জনেই। তবে তেমন কিছু ঘটল না। বোট দুটো গায়ে গায়ে লাগতেই নীরবে পুলিশের বোটে উঠে এল মারভিন। তারপর ইসাবেল। সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া পরিয়ে দিল সার্জেন্ট।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন পারকার আংকেল।

কেবিন থেকে সবই দেখল গোয়েন্দারা। হুড়াহুড়ি করে আবার ডেকে বেরিয়ে এল। হাসি ফুটেছে মুখে। ধরা পড়েছে চোরগুলো, আর পালাতে পারবে না।

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করল মারভিনকে, 'ছবিগুলো কোথায়?'

নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিল মারভিন, 'ছবি! কিসের ছবি?' যেন কিছুই জানে না। 'কি বলছেন বুঝতে পারছি না! আমরা তো সাগরে হাওয়া খেতে বেরিয়েছি। নিউ ইয়ারস...'

'ধানাই-পানাই রাখো!' ধমক দিয়ে বলল ইন্সপেক্টর। 'ভেবেছ কিছু দেখিনি?

পানিতে তখন ওটা কি ছুঁড়ে ফেললে?'

'ও, ওটা? একটা পোঁটলা। পুরানো কাপড়ের। বাতিল জিনিস। বোঝা না বাড়িয়ে ফেলে দিলাম।'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিল দুই পুলিশ অফিসার। তবে কি এত দামী জিনিসগুলো পানিতে ফেলে নষ্টই করে ফেলল মারভিন। তার পুরানো কাপড়ের গল্প এক বর্ণ বিশ্বাস করেনি তারা। ফেলে দেয়ার আরেকটা খারাপ দিক হবে, ওদেরকে আর আটকাতে পারবে না। কারণ কোন অপরাধ প্রমাণ করা যাবে না। বোট নিয়ে রাতের বেলা খোলা সাগরে হাওয়া খেতে বেরোনো কোন অপরাধ নয়।

যেন সেটা বুঝেই জোর দিয়ে বলল মারভিন, 'ইচ্ছে হলে বোটে খুঁজে দেখতে পারেন।'

খুঁজে দেখা হলো। জানে পাবে না, তবু না পেয়ে হতাশই হলো দুই অফিসার। ছবিগুলো বোটে নেই।

রাগে, ক্ষোভে পারলে কেঁদে ফেলে কিশোর। এত কষ্ট করে এসে শেষে এ ভাবে বিফল হবে! কিছুতেই মেনে নিতে পারল না সে। বলল, 'আমরা একবার খুঁজে দেখি!'

'খুব বেশি আত্মবিশ্বাস, তাই না?' ইন্সপেক্টর বলল ওদেরকে। তবে রাজি হলো, 'বেশ, দেখো।'

মারভিনের বোটে উঠে গেল গোয়েন্দারা। আতিপাতি করে খুঁজেও কিছু পেল না। কোন চিহ্নই নেই ছবিগুলোর।

ভাবছে কিশোর। এ হতে পারে না! কিছুতেই না! জীবন থাকতে এত দামী জিনিস হাতছাড়া করতে পারবে না মারভিনের মত চোর! তাহলে? নিশ্চয় বোটেই লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। কোথায়?

নিরাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে একটা সীটের ওপর বসে পড়ল মুসা। প্ল্যাস্টিকে মোড়া গদি। ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'এই মুসা, সরো তো!'

'কী?'

'সরো!'

উঠে দাঁড়াল মুসা।

প্রায় হুমড়ি খেয়ে এসে সীটের ওপর পড়ল কিশোর। হাত বোলাল প্ল্যাস্টিকের কভারে। যে রকম মসৃণ আর সমান হওয়ার কথা তেমন নয়। কিছু যেন রয়েছে ভেতরে।

ঝুঁকে নিচে দিয়ে তাকাল সে। অ, এই ব্যাপার! কভারটা চিরে ফেলা হয়েছে। তারপর সেলাই করে দিয়েছে। আঙুল ঢুকিয়ে হ্যাঁচকা টানে সেলাইয়ের জায়গাটা ছিঁড়ে খুলে ফেলল সে। হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে।

হ্যাঁ, আছে! বেশ কায়দা করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ছবিগুলো! সহজে বোঝার উপায় নেই যে ওখানে রেখেছে।

ছবিগুলো নিয়ে হাসিমুখে কেবিন থেকে বেরোল কিশোর। পেছনে তার দলবল।

হাঁ হয়ে গেল দুই পুলিশ অফিসার। ছেলেমেয়েগুলোর তারিফ করল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। হাত মেলাল ওদের সঙ্গে। দুর্ব্যবহার করে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করল।

'হুঁ,' সবশেষে বলল, 'বুঝেছি। জিনিস ঠিকই ফেলেছে পানিতে। সাধারণ ক্যানভাস গুটিয়ে নিয়ে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ফেলে বোঝাতে চেয়েছে ছবিগুলোই ফেলেছে, ধোঁকা দেয়ার জন্যে। পড়েও গিয়েছিলাম ধোঁকাতে।' কিশোরের কাঁধে হাত রাখল সে। 'আমাদের ইয়াং শার্লক হোমস না থাকলে পার পেয়ে গেছিল চোরগুলো আরেকটু হলেই।'

খুব ধুমধাম করে নিউ ইয়ারস ডে পালন করা হলো সেবার গোবেল বীচ গাঁয়ে। আবার দাওয়াত এল পলিদের বাড়ি থেকে। পার্টির আয়োজন পলিই করেছে। ক্রিসমাস ডে-র পার্টিতে যারা যারা উপস্থিত ছিল, তাদের সবাইকে দাওয়াত করেছে সে। আসল উদ্দেশ্য, গোয়েন্দাদের মুখ থেকে চোর ধরার রোমাঞ্চকর গল্প শোনা। খবরটা সকাল বেলায়ই মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে গোবেল বীচ আর আশপাশের গাঁয়ে।

দুপুর বারোটায় রেডিওর স্থানীয় খবরেও প্রচার করা হলো সংবাদটা। জানানো হলো, হোরেস ট্রিমেইনির দল ধরা পড়েছে, ছবিগুলোও উদ্ধার করা হয়েছে। কিশোরদের নাম বলা হলো। এমনকি রাফিও বাদ পড়ল না।

'বাহ্, চমৎকার!' হেসে বলল পলির বাবা ডক্টর মরিস। 'পেপারেও বেরোবে সংবাদটা। ছবি সহ। কেমন লাগছে তোমাদের?'

'ভালই,' জবাব দিল জিনা। 'তবে তারচেয়ে ভাল লাগছে চোরগুলোকে ধরতে পেরে, আর ছবিগুলো উদ্ধার করতে পেরে।'

'আর দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চারও করতে পারলাম,' মুসা বলল। 'সেটাও মস্ত বড় পাওয়া।'

'ঠিক,' একমত হলো কিশোর। 'মাঝে মাঝে এ রকম অ্যাডভেঞ্চার ভালই লাগে। ছুটি শেষ হতে হতে আরেকটা যদি পেয়ে যেতাম!'

'যেতেও পারি,' হেসে বলল রবিন। 'ঠিক আছে নাকি কিছু! আমরা তো যেখানেই যাই, রহস্য নিজে নিজে এসে হাজির হয়!'

'কোইনসিডেন্স,' পলি বলল। 'কাকতালীয় ঘটনা।'

মাথা নেড়ে কিশোর বলল, 'আমি সেটা মনে করি না। আর রহস্য নিজে নিজে এসে হাজির হয়, এ কথাটাও ঠিক না। ঘটনা তার স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে। কারও চোখে ধরা পড়ে, কারও পড়ে না। গোয়েন্দার চোখে পড়ে যায়। আর এই জন্যেই মনে হয়, গোয়েন্দারা যখন যেখানে থাকে, ঘটনাগুলো ঘটে।'

'ইনটেলিজেন্ট বয়!' কিশোরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন ডক্টর মরিস। 'আমিও তোমার সঙ্গে একমত।'

***

ভলিউম ৫০

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস আঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে।
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি,
নাম তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙ্গালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার ।
তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০